রাই জাগো, রাই জাগো

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

উৎসর্গ

ডাঃ বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

কৈফিয়ত

উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সময় লেখকের কাছে পাঠকবৃন্দের অনেক চিঠি আসে। আমিও বিভিন্ন উপন্যাস প্রকাশের সময়ে অনেক রকমের চিঠি পেয়েছি। নানা কৌতূহল, চরিত্র বা ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন—এই সবই বেশী। সর্বাধিক পত্র পেয়েছি 'পাঞ্চজন্য' আর 'আদি আছে অন্ত নেই' প্রকাশের সময়ে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্মিত হচ্ছি 'রাই জাগো রাই জাগো' উপন্যাস প্রকাশের সময়ে এই পরিমাণ চিঠি ও প্রশ্ন বর্ষিত হওয়ায়। উপন্যাসের আয়তন ছোট। তাকে নিয়ে প্রশ্নের এত সব ঝড় উঠবে ভাবি নি। আমার গৌরব—স্বয়ং সাহিত্যসম্রাজ্ঞী আশাপূর্ণা দেবী ধারাবাহিক প্রকাশের সময়ে বহু প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বই শেষ হতে শুধু পাঠক নয়—লেখকরাও অনেকে বলেছেন, আর একটু বলা উচিত ছিল। আপনি দ্বিতীয় খণ্ড অবিলম্বে শুরু করুন। এমন কি আশাপূর্ণা দেবীও অতৃপ্তি প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন, কানীন পুত্রটির কি হল তা জানাই নি বলে। শ্রীমান্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য লিখেছেন অবিলম্বে দ্বিতীয় খণ্ড ধরুন। পাহাড়ে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হল কিনা —সেটা স্পষ্ট লিখি নি—এই অভিযোগই বেশি।

আমার নিবেদন এই, এত যে বিশদভাবে বলার প্রয়োজন আছে তা ভাবি নি। বাঙালী পাঠক বুদ্ধিমান, শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য তাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা ওটুকু ভেবে নেবেন—এই ছিল আমার আশা ; আর আশাপূর্ণা দেবীর কাছে নিবেদন, বিশাখা যেখানে সর্বত্যাগিনী হয়ে কঠোর সন্ন্যাসের দ্বারা তার স্বপ্ন বা সাধনা সার্থক করতে চেয়েছে—সেখানে কি পিছু ফিরে চাওয়া উচিত, না সম্ভব! আমি অন্তত বুঝতে পারি নি যে এ প্রশ্ন উঠতে পারে!

রাই জাগো
রাই জাগো

১
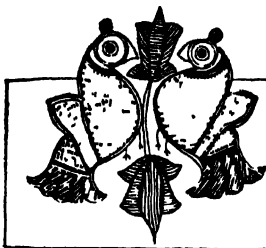
আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথ—অতি সামান্য পথই—রাত্রের দিকে বেশ ভয়াবহ ছিল।

আমরা বলছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী কালের কথা, ১৯১৯ সালের গোড়ার দিক সেটা। তবে, তাই বা বলি কেন, আমি প্রথম বৃন্দাবনে যাই ১৯২৩ সালে, তখনও দৈবচক্রে মথুরা পৌছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিছল, ফলে আমরা পাঁচটি প্রাণী দুটো টাঙ্গা ক'রে রওনা হলেও মাঝপথে বেশ যাকে বলে বুক-ঢিপঢিপ-করা, তাই করছিল।

অবশ্য আমি বাদ। তখন আমার কীই বা বয়স। গা-ছমছম যে একটু করে নি তা নয়, তবু কিছুটা উপভোগও করেছিলুম। তখনও পর্যন্ত শহরেই থেকেছি—কলকাতা আর কাশী, মুক্ত প্রকৃতি বলতে এই আমার প্রথম দেখা। দুদিকে মানব-বসতি-চিহ্নহীন অন্ধকার ধু ধু প্রান্তর, বাবলা আর ঠেঁটির জঙ্গল মধ্যে মধ্যে—মনে হ'ল ঘাসও গজায় না এখানে—শুধু কখনও কখনও দু-চারটে খেজুরগাছ বা কদাচিৎ দু-একটা তালগাছের মতো মনে হচ্ছে, গাছপালা বলতে এই। প্রথম শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গেছে, তার একটা আভাস মাত্র আছে পশ্চিম আকাশে, অল্প শীতের হাওয়া—বেশ লাগছিল।

পরে জেনেছিলাম যে মানববসতি-হীন প্রান্তর বা জঙ্গল সেটা নয়—তবে আরও খারাপ। যে মানুষগুলি থাকে তারা হিংস্র পশুর থেকেও সাংঘাতিক, কাউকে একা আড়ালে পেলে দু-পাঁচ টেবুয়ার জন্যেও খুন করতে ইতস্তত করে না। আমাকে একবার হাতরাস থেকে 'রতি কি নাগলা' স্টেশনের পথে রাত্রে যেতে হয়েছিল। লাইন ধরে যাচ্ছি, এক গেটম্যান যেতে নিষেধ করেছিল, আমার কাছে টিকিট ছাড়া দু-তিন টাকা মাত্র আছে বলতে হেসে জবাব দিয়েছিল, 'বাবুজী, আগে আপনাকে খুন ক'রে তবে তো দেখবে আপনার কাছে টাকা আছে কি খুচরো পয়সা আছে! একবার একজনকে মেরে এক পয়সাও তার কাছে পায় নি। সেই ভরসায় সে যাচ্ছিল, তবু তার জান গেল!'

গেটম্যানের সে হুঁশিয়ারী মনে ছিল বলেই—১৯৩৭ সালেও একবার যখন মাকে নিয়ে বৃন্দাবন আসি—সঙ্গে আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুও ছিলেন—ট্রেন লেট হওয়ার ফলে সন্ধ্যার পর ঐ পথে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম, তখন সমস্ত পথ ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলুম বলতে গেলে।

তবে আমরা যেদিনের কথা বলছি, সেদিন এই পথ আর ভয়ঙ্কর মনে হয় নি কারও।

না, বড় লাইনের ট্রেন লেট হয়েছে বলে নয়—ইচ্ছা করেই সন্ধ্যার পর যাত্রার আয়োজন হয়েছে। আলোর জলুস না হলে রেশেলা জমে না।

বিরাট মিছিল—যাচ্ছে মথুরা থেকে বৃন্দাবন।

শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের প্রধান সেবাইৎ বা গোস্বামী স্বরূপ তাঁর নববধূকে নিয়ে আসছেন বৃন্দাবনে, শান্তিপুর থেকে।

কালরাত্রি তাঁরা কাটিয়ে নিয়েছেন শান্তিপুরেই। কারণ বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকা ও অন্যান্য কৃত্য সারতেই দিন অপরাহ্ণে পৌঁছে গেছে। তারপর যাত্রা করার উপায় ছিল না। মানে ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তখন, অত তাড়া করার প্রয়োজনও ছিল না।

পরের দিনই যাত্রা করা হয়েছে। তখন ট্রেন ছিল অনেক মন্থর, সুতরাং আরও একদিন ট্রেনে কাটিয়ে মানে দু'রাত্রি পরে আজই দ্বিপ্রহরে 'বরাত' বা বরযাত্রীর দল এখানে পৌঁচেছে। ওখানের চৌবেজী অর্থাৎ এঁদের পাণ্ডা সমাদরে ও সাগ্রহে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্নান, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বারকাধীশের প্রসাদের ব্যবস্থা করা ছিল—সকলেই পরিতুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবন থেকে সধবা আত্মীয়া ও দাসীর দল এসে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল—বর এবং বিশেষ ক'রে নববধূকে সাজাবে বলে। তারপর, উদ্যোগ আয়োজন শেষ করতে, মিছিলের অগ্রে কে পশ্চাতে কে কোথায় কার পরে থাকবে তার ব্যবস্থা করতে—যদিও সে ব্যবস্থা শুরু হয়েছে বিকেল চারটে থেকেই—প্রচণ্ড চেঁচামেচি অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ বক্তব্য অপরকে শোনাতে ব্যস্ত—প্রত্যেকেই অপরকে তিরস্কার করতে চায় অযথা বিলম্ব ও অকর্মণ্যতার জন্য—যাত্রা শুরু হয়েছে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবারও এক ঘণ্টা পার করে দিয়ে।

চারটে হাতী—দুটো এঁদেরই, শহরের সঙ্কীর্ণ গলিপথে থাকার স্থান নেই বলে শহরের উপান্তে গোপীবল্লভের বাগানবাড়িতেই থাকে তারা—আর দুটো ভাড়া করা হয়েছে। তাদের উপযুক্ত সজ্জা ও আলিম্পন রেখারও ত্রুটি ঘটে নি। বারোটি

সুসজ্জিত ঘোড়া ; পাইক বরকন্দাজ—তাদেরও সেদিন মহার্ঘ্য বেশভূষা ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যে বিশেষভাবে সজ্জিত টাঙ্গা—তাদের ঘোড়ারও জরির কাজ করা ভেলভেটের পৃষ্ঠসজ্জা।

এই সমারোহের ঠিক মধ্যস্থলে কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিরাট চতুর্দোলে বর ও বধূ।

বিরাট মিছিলের আগে ও পিছনে, দুই পাশে ম্যাসিটিলিনের আলো—আলোর বহুমুখী ঝাড়—একটার সঙ্গে আর একটা লাগানো প্রায়। আগে যাকে বাঁধা রোশনাই বলত, সেই রকম। বিজলীহীন কলকাতায় ধনীদের বিবাহে এটাকে স্ট্যাটাস-সিম্বল ধরা হ'ত। তবে সে রোশনাই শুধু বরযাত্রীদের সঙ্গে থাকত না, মেয়ের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি পর্যন্ত বা বর থেকে কনের বাড়ি—সারা পথ জুড়ে।

তবে এখানে—আকবর বাদশা যাকে ফকিরাবাদ নাম দিয়েছিলেন—শস্যহীন, প্রায় বৃক্ষহীন অঞ্চলে এ ঘটনা অভিনব বৈকি! কচিৎ কখনও ঘটত। ফলে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে লোক ছুটে এসেছে এই দৃশ্য দেখতে। এও এক রকমের 'তামাশা'। এদের কাছে এসব রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য, স্বপ্নের বা প্রবাদের বস্তু। অন্য তামাশা—নাচগান কি যাত্রা গানের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর, উত্তেজক।

সবটা জুড়েই এই সব দর্শকদের কাছে সীমাহীন কৌতূহলের ব্যাপার, তবু মধ্য-কার ঐ চতুর্দোলাটি সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশী। এইখানে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি বেশী—ভাল করে দেখার জন্যে। পাইকদের রূঢ় আঘাতও তাদের দমাতে পারছে না।

ঠিক চতুর্দোলাও নয় কিন্তু, তাতে দেখা যেত না ভাল ক'রে। সে সম্বন্ধে উদ্যো-ক্তারা সবাই সচেতন—'ওয়াকিবহাল'।

আসলে এটা বিরাট চওড়া সিংহাসন—পিছন দিক দুই পাশ ও উপর-দিক মহার্ঘ্যবস্ত্রে আচ্ছাদিত। বারোটি বাহক বহন করছে। আটজন ক'রে সব সময় বইছে—কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার স্থান নেবার জন্য আরও চারজন সঙ্গে যাচ্ছে—যাকে কাঁধ বদলানো বলে।

এই তিনদিক ঘেরা প্রশস্ত সিংহাসনেই বসে আছেন বর ও বধূ। ফুলের মালা জরি আর কাঁচের বলে উজ্জ্বল ঝলমলে সে আসন রাজা-রাণীরই উপযুক্ত।

এ দৃশ্য আরও মনোরম এই জন্যে যে—বর ও বধূ দুইই এমন অসামান্য সুন্দর—এমন আশ্চর্য মিলন সর্বদেশে সর্বকালেই দুর্লভ। সর্বজাতির মধ্যেও। বর সুন্দর—দেখা গেল কনে কুৎসিত বা অতি সাধারণ। সুন্দরী মেয়ের ভাগ্যেও সুন্দর বা সুপুরুষ বর জোটে কদাচিৎ। বর্তমান কালের তথাকথিত ভালবাসার বিবাহেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না।

এখানে সেই প্রায় অবিশ্বাস্য যোগাযোগই ঘটেছে।

চারিদিকের মাণিক্যমুক্তা খচিত সেটিং-এর মধ্যে বর বধূকে দুটি বহুমূল্য হীরক-খণ্ড বলে বোধ হচ্ছিল।

তৃপ্ত হচ্ছে, মুখর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে প্রশংসায়—রবাহূত গ্রাম্য সাধারণ লোকেরা।

তারা তৃপ্ত—অভাবিত অদৃষ্ট-পূর্ব এই দৃশ্যে। তাদের কল্পনায়, লোকমুখে শোনা রূপকথার রাজকন্যা ও রাজপুত্রকে দেখে।

তৃপ্ত এই সব সঙ্গীরা, বাহকরা, ভৃত্য বা সেবকের দলও।

কারণ স্বরূপ গোস্বামী এদের সকলের অতি প্রিয়। ভালবাসে, ভক্তিও করে।

স্বরূপদের এত বয়সে বিয়ে হয় না। হয় নি কারও।

স্বরূপ গোস্বামীর বাবা প্রাণকিশোর গোস্বামীর বিবাহ হয়েছিল এগারো বছর বয়সে।

স্বরূপের বিবাহের কথা উঠেছিল আর একটু বেশী বয়সে—ষোল বছরে। কিন্তু তা হ'তে পারে নি। কারণ সহসাই নিমোনিয়া রোগে প্রাণকিশোর মারা গেলেন। তখন এ রোগের কোন ওষুধ ছিল না—গরম মসনের-পুলটিশ ও আকন্দর তুলো দিয়ে বেঁধে রাখা—সাধারণত এই চেষ্টাই করা হ'ত। সুতরাং যে ভাল হ'ত তার ভাগ্যের জোর বলতে হবে।

কালাশৌচ থাকতে বিবাহ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদিও শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, কেবলমাত্র বিবাহের ক্ষেত্রে কালাশৌচ সংক্ষিপ্ত করা যায়—এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সপিণ্ডকরণ সেরে।

কিন্তু এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও স্বরূপ গোসাঁই বিয়ে করতে রাজী হলেন না। তিনিই এখন কর্তা, তাঁকে আদেশ করবে কে?

করতে পারতেন অবশ্য একজন—ওঁর মা। রাশভারী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী মহিলা। বস্তুত তিনিই এতখানি সম্পত্তি রক্ষা এবং এত বড় মন্দিরের সেবা পূজা পার্বণ সমস্তই পরিচালনা করেন। তাঁর মুখের ওপর কথা কইতে কেউই সাহস করত না।

কিন্তু স্বরূপ মাকে বোঝালেন, 'আমরা গুরুবংশ মা, এত শিষ্য যজমান আছে, মন্দিরেও বহু লোক আসেন উপদেশ নির্দেশ নিতে—আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে। মূর্খ হয়ে থাকলে বার বার এদের কাছে অপদস্থ হ'তে হবে। বাবা বাল্যকালে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু তাঁর শিক্ষার কোন ত্রুটি ঘটে নি, আমার সপ্ততীর্থ পিতামহ যত্ন ক'রে সব শিখিয়েছিলেন। আমাকে বাবা ইংরেজী স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, ওটা জানা এখনকার দিনে দরকার বলে। তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্তত ইস্কুলের পাসটা দিয়ে নিলে শাস্ত্র ব্যাকরণ তিনিই পড়াবেন। তা তো হ'ল না। আমি আগে অন্তত বৈষ্ণব

শাস্ত্রটা কিছু পড়ে নিই—তার পর বিবাহের কথা চিন্তা করব। তুমি এতে অমত করো না।'

মা শ্যামসোহাগিনী কথাটা বুঝে আর অমত করেন নি। ধীর স্থির ধর্মপরায়ণ এই বড় ছেলেটিই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে গর্বের। সে যদি তার পিতামহের মতো পণ্ডিত হতে পারে—তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি থাকতে পারে তাঁর কাছে!

স্বরূপ বা প্রাণস্বরূপ—পিতা নাম রেখেছিলেন স্বরূপ দামোদর, মহাপ্রভুর ভক্ত প্রধানের নামানুসারে—কিন্তু পিতামহ পুত্রের নামের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণস্বরূপ করলেন, তাঁর কথার ওপর আর কে কথা বলবে?—নবদ্বীপে না গিয়ে কাশীতেই গেলেন। উদ্দেশ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে কিছু সংস্কৃত পাঠও নেবেন। আর কাশীতে যত বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিত আছেন বা আসেন—তত নবদ্বীপে পাওয়া যাবে না।

কাশীতে উনি পেলেনও বহু বিখ্যাত পণ্ডিতকে। রাধামাধব গোস্বামী, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতিকে। সংস্কৃতে ন্যায়, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতিও কিছু কিছু চর্চা করলেন। ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, রামভূষণ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হারাণ শাস্ত্রী, প্রভাস কাব্যতীর্থ প্রভৃতির কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল।

মনোযোগ যথেষ্ট ছিল, আগ্রহ ততোধিক। দৈনিক প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পরিশ্রমে তিনি পাঁচ ছ বছরের মধ্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে যখন ফিরলেন—তখন তাঁর দেবদুর্লভ কান্তিতে আরও বিনয় ও মাধুর্য যোগ হয়েছে—এই বিপুল পরিশ্রমের চিহ্ন-মাত্রও তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখে পড়ে নি।

এইবার বিবাহের ব্যবস্থা। আর বিলম্ব করা উচিত নয় কোনমতেই।

এ বংশে দীর্ঘকালের মধ্যে অষ্টমী গৌরী ছাড়া কোন বধূ আসে নি। শ্যাম-সোহাগিনী এসেছিলেন সাত বছরের মেয়ে। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, কাল যে বদলেছে, সেই সঙ্গে পাত্রও, এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। চব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে সাত বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে না। এ তিনি ভাল করেই ভেবে দেখেছেন।

আত্মীয়রা অবশ্য প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন ঋতু-অভিজ্ঞা কন্যা ঘরে আনার প্রস্তাবে, কিন্তু শ্যামসোহাগিনীই কর্ত্রী, ছেলে কাশী থেকে ফিরে এসেও কর্তৃত্ব হাতে নেন নি, বার্ষিক দেড় লাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি, দেবসেবার নানা দায়িত্ব—এতটা তিনি এখনই বহন করতে প্রস্তুত নন। আর প্রয়োজনই বা কি? মার এসব বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অসাধারণ, শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের এই বিপুল সংসারের সমস্ত খুঁটি-নাটি নিয়মরীতি তাঁর নখদর্পণে—তার মধ্যে স্বরূপ এখনই নাক গলাতে যাবেন কেন?

সুতরাং শ্যামসোহাগিনীর এই সব যুক্তি ও বিবেচনাহীন আপত্তিতে কান দেবার

কথা তিনি চিন্তাও করেন নি।

ওঁদের বংশের উপযুক্ত পাত্রী অবশ্য সুলভ নয়। তিনি নানা পরিচিত ব্যক্তির কাছে চিঠি লিখলেন পাত্রীর খোঁজে। খোঁজও অনেক এলো। ছবি দেখলেন, কেউ কেউ এসে কন্যা দেখিয়েও গেল। শেষ পর্যন্ত শান্তিপুরের এক সদ্‌বংশের মেয়ে পছন্দ করলেন তিনি। সঘর, জানাশুনো পরিবার—আত্মীয়তার সূত্রও আছে একটু। ষোল বছর বয়স, স্কুলে পড়ে নি বেশীদিন, তবে বাড়িতে লেখাপড়া যথেষ্ট করেছে; সুশ্রী—সুন্দরী বলাই উচিত—সুলক্ষণা মেয়ে, আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

তা ছাড়াও—যদিচ মেয়ের বাবা ওকালতি করেন—তবে তাঁরাও গুরুবংশ। গৃহে কুলদেবতা আছেন, নিত্য সেবা ভোগ হয়। মাছ যদি বা খান—বাড়িতে আজ পর্যন্ত মাংস ঢোকে নি। সব দিক দিয়েই তাঁদের উপযুক্ত পরিবার।

মেয়েটির নাম যমুনা—শ্যামসোহাগিনীই নূতন নামকরণ করলেন, বিশাখা। বললেন, 'বেয়াই মশাই—আগেই সম্পর্কটা ধরে সম্বোধন করছি বলে ধৃষ্টতা ভাববেন না, যখন পাকা কথা হয়ে গেছে তখন সম্পর্কও পাকা বলে ধরে নিচ্ছি—মহাপ্রভু বলে গেছেন, রাধিকার প্রেমের চেয়েও গোপীদের প্রেম শ্রেষ্ঠতর, তাদের প্রেম স্বার্থলেশশূন্য—তাই বিশাখা নাম দিলাম। ললিতা আমার মেয়ের নাম—নইলে ললিতাই দিতাম।'

সেই বিবাহ নির্বিঘ্নে যথাবিহিত রীতিতে সম্পন্ন হয়েছে, সেই শ্রীরাধা গোপী-বল্লভের বড় গোসাঁই তাঁর নবোঢ়া বধূকে নিয়ে গৃহে ফিরছেন আজ—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে।

এই যোগ্য এবং দুর্লভ যুগল মিলনের দৃশ্যে সকলেই তৃপ্ত, প্রসন্ন। অন্তরঙ্গজন উৎফুল্ল।

তৃপ্ত স্বরূপ নিজেও। বুক ভরে গেছে তাঁর সেই শুভদৃষ্টির ক্ষণটি থেকেই। শুধু সুন্দর বলে নয়—এমন একটি স্নিগ্ধতা এমন একটি অপরূপ শান্ত কোমল লজ্জানম্র মাধুর্য সে মুখে যে, যে কোন তরুণ পুরুষেরই বুক ভরে যেতে বাধ্য। মনে হ'ল ঠিক এমনিই তিনি চেয়েছিলেন—জীবনের সঙ্গিনী হবার মতো তো বটেই, যথার্থ সহ-ধর্মিণী হবার মতোও। তাঁদের পুণ্যের সংসার, দেবতার সংসারে উপযুক্ত সেবিকা—হয়ত কালে সাধিকা হয়েও উঠবে।

সেই ক্ষণের পর থেকে নানা সুযোগে নানা অজুহাতেই—চেয়ে দেখেছেন। কুশণ্ডিকার সময়ে তো নিজের বুকের কাছেই ছিল, যুগ্ম অঞ্জলিতে আহুতি দেবার সময়—প্রতিবারেই মুগ্ধ হয়েছেন, আশ্বস্ত ও আশান্বিত হয়েছেন।

আজ এখনও অপাঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

সে মুখ—মুখ-কমল তেমনিই আছে, তবে এখন যেটা মনে হচ্ছে, কিছু ম্লান, বরং বিষণ্ণ বলাই উচিত। সাধারণত পিতৃগৃহ ত্যাগ করার সময় এমন হয়—কিন্তু এখনও!

আজ সকাল থেকেই একটা সংশয় মনে দেখা দিচ্ছে—তবে কি স্বামী পছন্দ হয় নি ওর? ওর কি আরও কিছু উচ্চাশা ছিল?

কিন্তু তাই বা হবে কেন?

কুশণ্ডিকা সপ্তপদী গমন ইত্যাদির শেষে পুরোহিত যখন বললেন, 'স্বামীকে প্রণাম করো মা—ইনিই ইহলোকে তোমার ইষ্ট, তোমার দেবতা'—তখন একেবারে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে অমন ভাবে দু'হাতে তাঁর পা দুটো চেপে ধরবে কেন, অমন সবলে?—যেন আশ্রয় প্রার্থনার মতো, অবলম্বনের আশার মতো?

না, না, উনিই ভুল বুঝছেন।

আসলে মা-বাবাকে ছেড়ে আসার জন্য, এতদিনের বাসভূমি, আত্মীয়স্বজন পরিচিত পরিবেশ—সম্ভবত চিরদিনের মতোই—ছেড়ে আসার বেদনা এটা। এই তো স্বাভাবিক। এখন অবশ্য কোন কোন মেয়েকে দেখেছেন—কাশীতে প্রয়াগে মথুরায়—প্রথমটা কান্নাকাটি করলেও, পরে গাড়িতে আসতে আসতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে—তবে তারা সকলেই বয়স্থা। এর মতো ষোড়শী নয়। তাঁর মা তো নাকি সাত দিন ধরে কান্নাকাটি করেছিলেন।

তিনি চারিদিক তাকিয়ে দেখে—সকলের অন্যমনস্কতার এক অবসরে—বিশাখার কোমল কম্পিত স্বেদার্ত দক্ষিণ হাতটি নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সস্নেহে একটু চাপ দিলেন।

জানাতে চাইলেন, 'ভয় নেই, আমি আছি তোমার, তোমার সব দুঃখ সব বিষাদ ভালবাসা দিয়ে ধুয়ে মুছে বিলুপ্ত ক'রে দেব। আমার বুকে তোমার শ্রেষ্ঠতর আশ্রয় খুঁজে পাবে তুমি।'

২
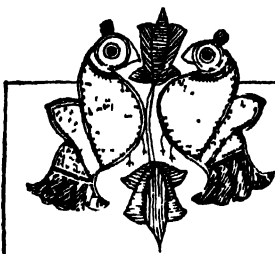
বহুরাত্রি হয়েছিল বর-বধূর স্বগৃহে পৌঁছতে।

তার পরও—বিগ্রহদর্শন 'ধুলোপায়ে' (এদের জন্যেই ঠাকুরের তখনও শয়ন দেওয়া হয় নি), বরণ, অন্যান্য স্ত্রী-আচার ইত্যাদিতে বহু বিলম্ব ঘটেছে। প্রসাদ গ্রহণ—সে তো নামমাত্র, অত রাত্রে এত উত্তেজনা ও ক্লান্তির পর আহারে কারই বা রুচি থাকে—তবু এক পংক্তিতে বা 'পঙ্গতে' বসলে একা ওঠা যায় না। সকলের খাওয়া শেষ হলে রাধাগোপীবল্লভের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠতে হয়। সুতরাং শুতে গেছেন প্রায় রাত দুটো নাগাদ।

বিশাখা শুয়েছিল শাশুড়ীর সঙ্গে একই পালঙ্কে।

তবে অত ক্লান্তি সত্বেও বহুক্ষণ ঘুম আসে নি।

নতুন পরিবেশ, নতুন সব মানুষ—সঙ্গে একটি দাসী এসেছে, তবে সে তো অবশ্যই অন্যত্র শোবে—ঘুম না আসার এই তো যথেষ্ট কারণ।

তা ছাড়াও, হয়ত স্বামীর চিন্তা, কামনা-আশার অধীরতাও উত্তেজিত রেখেছে মস্তিষ্ককে।

স্বামী শুধু সুপুরুষ এবং প্রিয়দর্শনই নন,—তিনি যে ভদ্র, বিবেচক, স্নেহপরায়ণ মধুর স্বভাবের মানুষ, সে পরিচয়ও ইতিমধ্যে পাবার বহু সুযোগ ঘটেছে। সেই জন্যেই কামনা, সেই জন্যেই আশার স্বপ্ন। সে কামনার ধন, স্বপ্নের মানুষকে নিভৃতে পাওয়ার অধীরতাও হয়ত ছিল।

কারণ যাই হোক—ক্লান্তির যথেষ্ট কারণ থাকা সত্বেও যমুনার ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়েছে। দেউড়ির পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজাও শুনেছিল। তার পর হয়ত তন্দ্রা এসে থাকবে, কিন্তু ঠিক চারটের সময়ই শ্যামসোহাগিনী তার গায়ে হাত দিয়ে সস্নেহে ডেকেছেন, 'বৌমা, আজ যে একটু বেশী ভোরেই উঠতে হবে মা। আজ যে তোমার দীক্ষা!'

'দীক্ষা!'

বধূ কি চমকে উঠল?

শ্যামসোহাগিনীর হাত তখনও পর্যন্ত বিশাখার গায়েই ছিল, চমকে ওঠাটা অনুভব করতে অসুবিধা হয় নি। তবে তিনি তাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেন নি। ষোল বছরের মেয়ে, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে মানুষ—ফুলশয্যার দিন দীক্ষা নেবার প্রস্তাবে তো চমকে ওঠারই কথা।

তিনি তেমনি সস্নেহে বিশাখার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'হ্যাঁ মা, আজ যে তোমার পাকস্পর্শ। তুমি নিজের হাতে আমাদের এ সংসারের মালিক শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের প্রসাদ আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনদের পরিবেশন করবে, এই তো নিয়ম। তবে দীক্ষা না হলে তো সে অধিকার জন্মাবে না মা।'

আর কিছু বলল না বিশাখা। যেন একটা নিঃশ্বাস দমন ক'রে নিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল শাশুড়ীকে। তারপর লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মা—মানে শান্তিপুরের মা—বলে দিয়েছেন প্রতিদিন সকালে উঠে আপনাকে আর—আর—'

'স্বামীকেও প্রণাম করতে। ঠিকই বলেছেন তোমার মা, সৎশিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু সেও স্নান করতে গেছে, সে-ই মঙ্গল আরতি ক'রে ঠাকুরের ঘুম ভাঙাবে। তুমিও স্নান সেরে নাও, মন্দিরে গিয়ে একেবারে গুরু গোবিন্দ দর্শন করবে। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে, ইষ্ট, মন্ত্রদাতা গুরু আর জন্মদাত্রী জননী ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই। খোকা যখন বাইরে এসে দাঁড়াবে সেই সময় সেইখানে প্রণাম ক'রো।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'স্নানের ঘরে যমুনার জল আনা আছে, বিভিন্ন ঘাট থেকে সংগ্রহ করা জল—ধীর সমীরের ঘাট, কেশী ঘাট, যমুনাপুলিনের ঘাট—এই সব, তার সঙ্গে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ডর জলও একটু ক'রে মেশানো আছে। তুমি সকালের কাজ সেরে একেবারে স্নান ক'রে এসো। আমিও স্নান সেরে নিই। আমিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। এত ভোরে দর্শনার্থী কেউ আসবে না। নিভৃতেই দীক্ষা দিতে হয় তো—আমিই তোমাকে দীক্ষা দেব মা।·· চমকে উঠো না, আমাকে আমার গুরু শ্বশুরমশাই-ই এ অধিকার দিয়েছেন—তিনি জীবিত থাকতেই বহু লোককে দীক্ষা দিয়েছি, তাঁর আদেশ মতো। স্বরূপ—মানে বর্তমান গোসাঁই, তোমার স্বামীও আমার কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছেন।'

স্নান সেরে চওড়া লালপাড় সাদা বেনারসী শাড়ি পরে যখন বিশাখা মন্দিরে এসে দাঁড়াল, শ্যামসোহাগিনীও কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ওর হাত দুটি ধরে 'এসো মা, এসো' বলে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

যে দাসী ওর স্নান-তিলকসেবা, চন্দন-পত্রলেখা রচনা প্রভৃতি করিয়ে নতুন

বেনারসী শাড়ি পরাল (স্নান ক'রে তখনই নববস্ত্র ধারণ করতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়—সে জন্য অন্য কাপড় পরেই বেরিয়েছে স্নানের ঘর থেকে ওরা)—সে-ই প্রথম বলেছে, 'বাঃ, আমাদের বড় গোসাঁই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীমা ঘরে এনেছেন!' তখনও—লজ্জায় মাথা নত করলেও—এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে যেমন সুখ ও আনন্দের রক্তিমা ও মৃদু হাসি ফোটা উচিত তা বোধ হয় ফোটে নি। এখনও উপস্থিত নিকট-আত্মীয়া ও প্রায়-পরিবারভুক্ত উচ্চস্তরের সেবিকাদের মধ্যে আলোচনায়—'সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুন' কেউ বা 'গোসাঁই এ জ্যান্ত রাধারাণীকে কোথায় পেল?' এ সব প্রশংসা-বাক্য কানে এলেও—মাথা নত ক'রে থাকা ছাড়া আর কোন ভাবান্তর চোখে পড়ল না। নতুন জায়গায় নতুন দায়িত্বের মধ্যে—বিশেষ এ বাড়ির বড়বৌ হওয়া মানেই বিশাল দায়িত্বের ভার এসে পড়া—এসে পড়ে নতুন বৌ বিহ্বল বা ভীত হয়ে পড়েছে—এই কথাই ভাবল সবাই।…

মন্দিরে ঢুকে নিজেই গলায় আঁচল দিয়ে বিগ্রহকে বাঁয়ে রেখে প্রণাম করতে আরও খুশী হলেন শ্যামসোহাগিনী, বললেন, 'তোমার বাপের বাড়িতেও বিগ্রহ আছেন, না? নইলে এ শিক্ষা পেতে না!'

বিশাখার বাপের বাড়িতে আছেন নারায়ণ—দধিবামন শালগ্রাম শিলা, আর আছে একটি অষ্ট ধাতুর গোপাল মূর্তি। তবে সেখানে এত নিয়মের কঠোরতা নেই। প্রতিদিন প্রণাম করাও হ'ত না। আসলে গতকাল রাত্রে যখন ধুলোপায়ে এসে যুগলে প্রণাম করা হয়েছিল—স্বরূপই ঐ ভাবে বাঁয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসতে বিশাখাও সেই ভাবে বসে প্রণাম করেছে—সে ব্যাপারটা শ্যামসোহাগিনী অত লক্ষ্য করেন নি, সে সময়কার প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যে—তবে বিশাখা লক্ষ্য করেছিল। এখন অপ্রয়োজন বোধেই তা বলল না, সে সুযোগও মিলল না।

এমনিই—এখানে এসে এখনও সহজভাবে কথা বলার কোন অবসর পায় নি, সে অন্তরঙ্গতা বা আত্মীয়তার তো প্রশ্নই ওঠে না।

মন্দিরের সামনে একটু চত্বর মতো, আরতির সময় কাঁসর ঘড়ি বাজাবার জন্য, সেবাইৎ বা মা-গোসাঁইরাও সেখানে বসে পূজা আহ্নিক করেন। তার নিচে—বেশ কয়েক ধাপ--বোধ হয় ছ-সাতটা হবে—মাঝারি নাটমন্দির। তারপরে অনেকখানি স্থান নিয়ে বিস্তৃত চতুষ্কোণ অঙ্গন—এঁরা বলেন শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের আঙিনা।

শ্যামসোহাগিনী ছোট চত্বরে কাউকে উঠতে দেন নি তখনও, নিজের মেয়ে, ছোট ছেলেকেও না। সব দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—পদে পদেই সে প্রমাণ পাচ্ছে বিশাখা। স্বামীকে প্রণাম করার পর্ব আছে, তার পর দীক্ষা—তখনও অপর কারও নিকটে আসা চলবে না। মঙ্গল আরতির পর যে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হয়—

তারপর স্নান বেশ ইত্যাদির সময় মাত্র পর্দ'টা টেনে দেওয়া হয়, কেবল ভোগ' লাগার সময়ই দরজার কপাট বন্ধ করেন পূজক।

বিগ্রহ প্রণামের পর শাশুড়ীর নির্দেশমতো বাইরের চত্বরে এসে স্বামীকে প্রণাম করতে হ'ল। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর দীক্ষা গ্রহণ নিষেধ, সে আইন-বাঁচানো অনুমতিও দিলেন স্বামী– কোন প্রশ্ন করার আগেই—তার পর মন্দিরে ঢুকে হাত ধুয়ে পুনশ্চ মন্দিরে বাখা সপ্ততীর্থের জল মাথায় দিয়ে দীক্ষা গ্রহণের আসনে বসতে হ'ল।

আজও এই প্রণাম করার সময়েও—স্বরূপ লক্ষ্য করলেন, সাধারণ ভূমিষ্ঠ প্রণাম নয়—পায়ের ওপব মাথা রেখেই প্রণাম করল বিশাখা। আর, সে মাথাটা বেশ জোরে চেপে ধরার মতোই মনে হ'ল, শুধু মাথা ঠেকানো নয। পায়েব ধুলো নেবার সময়ও যেন সেই পায়ে ধরার ভাব।

কুশণ্ডিকার দিনও স্বরূপের যা মনে হয়েছিল, আজও তাই মনে হ'ল—হয়ত অকারণেই, ওঁর মনের ভ্রান্তি—শুধু নিয়মরক্ষার প্রণাম এটা নয, এর মধ্যে দিয়ে যেন আশ্রয় আর আশ্বাস প্রার্থনা কবছে স্বামীর কাছ থেকে।

এটা কি ভয় ? অপরিচিত পরিবেশে অনাত্মীয়দের মধ্যে এসে পড়ার জন্য ? এ অকূল সমুদ্রে স্বামী ছাড়া কারও কাছেই এই আশ্বাস চাওয়া যায় না বলে ?—কেন না সে-ই তো তখন থেকে ওর সত্যকার অবলম্বন, সারা জীবনের মতো।···

কে জানে—সাধারণ নিয়মের এই সামান্য ব্যতিক্রম বা আতিশয্য—শ্যামসোহাগিনী লক্ষ্য করলেন কিনা।

মন্দিরাধিপতির ভোগ লাগার কথা সাড়ে এগারোটায়। এখানে আত্মবৎ সেবা, ভোগ লাগার পর প্রায় এক ঘণ্টা কপাট বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ভগবানকে আহার করার পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

অর্পিত ভোগ সরার সময় সাড়ে বারোটা। তারপর শয়ন-আরতি, শয়ন দেওয়া—এসব সেরে পঙ্গত বসতে একটারও বেশী হয়ে যায়।*

এটা সাধারণ দিনের কথা। আজ বিরাট পর্ব—ভোগের পরিমাণ ও ভোজ্যের সংখ্যা বিপুল ও অগণিত। সুতরাং ভোগ লাগতেই সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তাও বহু ব্রজবাসী পাচক ব্রাহ্মণদের আপ্রাণ চেষ্টাতেই এত অল্প সময়ে এত কাণ্ড সম্ভব হয়েছে। ফলে পঙ্গত বসতেই দুটো বাজল।

---

* একত্র প্রসাদ গ্রহণ করা বা সাধুদের পংক্তি-ভোজনকে পঙ্গত বলা হয়।

তাও এটা প্রথম পঙ্গত—নিকট আত্মীয় ও কুটুম্ব, প্রধান প্রধান মন্দিরের মোহান্ত বা গোসাঁই (কামদাররা এ পঙ্গতে বসার অধিকারী নন)—এঁরাই বসতে পারলেন। তার পরের স্তর বসল তিনটেয়, পাচক সেবক পরিজন দাসদাসী—এরা বসল চারটেয়।

শ্যামসোহাগিনী এই সমস্ত পঙ্গতেই নিয়মরক্ষার মতো সামান্য কিছু ক'রে সঘৃত-অন্নপ্রসাদ ও ক্ষীর (পায়স) পরিবেশন করালেন। অবশ্যই অপরে পাত্র ধরে ছিল, এবং শাশুড়াও সমস্তক্ষণ ওর সঙ্গে ছিলেন, প্রায় বেষ্টন ক'রে ধরে নিয়ে। পরিশ্রমে-পরিবেশনে অনভ্যস্ত কিশোর বয়সী মেয়ে—ক্লান্ত হয়ে না টলে পড়ে যায় এই ছিল তাঁর ভয়। দু-একবার যে সে সম্ভাবনা দেখা দেয় নি—তাও না।

এসব যখন চুকল শ্যামসোহাগিনী একেবারে ওকে নিজের শয়নগৃহে নিয়ে গিয়ে সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরিয়ে এক রকম জোর ক'রেই শুইয়ে দিলেন।

আহারের প্রয়োজন ছিল না। প্রথম পঙ্গতে বধূর যা করণীয় তা সারা হতেই ওকে নিভৃতে একটু প্রসাদ খাইয়ে দিয়েছিলেন। অল্পই অবশ্য—ভরা পেটে এতগুলি লোককে পরিবেশন করতে আরও বেশী কষ্ট হবে এই ভেবেই। তা ছাড়া, পঙ্গতে বসলেই কি এর বেশী খেতে পারত।

শুইয়ে দিয়ে সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার খুবই কষ্ট হ'ল মা—তা আমি বুঝি, কিন্তু কি করব, এখানের এই নিয়ম। এ তো সাধারণ ভোজ নয়, ভগবানের প্রসাদ পাওয়া, সেবক-সেবিকাদের পর্যন্ত নববধূ সমান নিয়মে প্রথম কিছু পরিবেশন করবেন। কাউকেই ছোট ক'রে দেখার রীতি নেই। আসলে আমরা সবাই তো প্রভুর দাসদাসী।'

তারপর দরজা বন্ধ ক'রে যাবার সময় বলে গেলেন, 'তুমি একটু নিরিবিলি বিশ্রাম ক'রে নাও বৌমা, আমি সবাইকে বলে দিয়েছি সন্ধ্যার আগে কেউ না এ ঘরে ঢোকে। রাত্রেও তো একটা বড় রকমের পর্ব আছে। সে সব আচার-অনুষ্ঠান মেয়েলি প্রথা—ভগবানের শয়ন না হলে শুরু করতে নেই।'

ক্লান্তি সীমাহীন, পা ভেঙে আসছে। হাত নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। এ পরিশ্রম ওর পক্ষে অমানুষিক। তবু, অবসন্ন হয়ে পড়লেও, চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস মাত্র নামল না।

উত্তেজনা। উত্তেজনার কারণ তো প্রচুর। নব পরিবেশ, নব আবেষ্টনী। নূতন জীবনের বিস্ময় যত দুশ্চিন্তা তার চেয়ে বেশী।

এখানেই থাকতে হবে চিরকালের মতো। এখানকার বড় গোসাঁই-এর স্ত্রীকে নাকি পিত্রালয়ে যেতে নেই। সেকালের রাজরানীদের মতো। মা-বাবা এলে

দেখা হতে পারে, যদি এখানে থাকেন আদরযত্ন অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না। তাঁরা যদি এখানে থাকতে না চান—তাঁদের বাসাতে গিয়েও দেখা ক'রে আসতে পারে বধূ—এইটুকু মাত্র, এর বেশী নয়। এটুকুও নাকি সম্প্রতি হয়েছে। এই স্বাধীনতা।

এছাড়াও—উত্তেজনা উদ্বেগের আর একটা বড় কারণ ঘটেছে আজ সকালে।

দীক্ষা শেষ হবার পর গুরুপ্রণাম (মন্ত্র পড়ে, সাষ্টাঙ্গেও) শেষ ক'রে উঠে দাঁড়াতে শ্যামসোহাগিনী আবেগগম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন, 'মা, আজ থেকে এই তোমার ইষ্ট, এ-ই আসল প্রাণ-স্বরূপ। এঁতে আর তোমার স্বামীতে অভিন্ন জেনেই সেবা করবে। আমাদের আত্মবৎ সেবা। তুমি বড় গোসাঁইয়ের সহধর্মিণী হলে, একদিন তুমিও দীক্ষা দেবে অনেককে, বহু শিষ্যশিষ্যার মা হবে, তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতা নিষ্ফলতার জন্যে তুমিই দায়ী থাকবে। আমাদের ইষ্ট আমাদের মালিক শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের বিরাট এই সংসারের তুমিই হবে কর্ত্রী। এত বড় ঠাটবাট তোমাকেই বুঝে নিতে হবে।'

সে কথার বাক্যে ও কণ্ঠস্বরে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল বিশাখার। শিউরে উঠেছিল যেন।

তবু বহু কষ্টে বলেছিল অবশ্য, 'আপনিই দেখিয়ে দেবেন মা, আমাকে তৈরী ক'রে নেবেন।'

শ্যামসোহাগিনী সাদরে ওকে বুকে টেনে কপালে একটি চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'বেশ বলেছ মা, মানুষের ঘরের মেয়ের মতোই বলেছ। তোমার বাবা মা সত্যি-সত্যিই সংশিক্ষা দিয়েছেন। এই বয়সে এতটা সহবৎ আমি আশা করি নি।... জয় রাধে!'

শ্যামসোহাগিনী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিশাখা নিশ্চিন্ত হতে পারছে কই?

তার এই বয়সে এ সব দায়িত্বের বিপুলতা, এর মর্ম বোঝাই তো কঠিন। যেন কোন এক অজানা আতঙ্কে মনে মনে শিউরে উঠেছে সে বারবারই।

সে কি পারবে এতখানি ভার বইতে, যেমন শাশুড়ী পারছেন!

হয়ত তাঁর বয়সে, প্রচুর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে এটা হতে পারে—এই যোগ্যতা। কিন্তু সে শক্তি কি আছে ওর মধ্যে—যেমন ওর শাশুড়ীর মধ্যে দেখেছে!

এখন, এক যেন ঘূর্ণাবর্তের পর নির্জন অবসরেও মনে হচ্ছে সে কটি শব্দ মেঘ-মন্দ্রস্বরে নিনাদিত হচ্ছে।

আবারও গায়ে কাঁটা দেয়—সর্বেন্দ্রিয় শিথিল করা একটা বিহ্বলতা বোধ করে বিশাখা।

কেমন একটা ভয়, অজানা আতঙ্ক ঐ কথাগুলোর মধ্যে।

কিছু পরে সে ভয়ের ভাব কমে এলে তার দুই চোখ প্লাবিত ক'রে অশ্রুর ধারা নামে।

এ কি আনন্দের অশ্রু ? এ কি অচিন্তিত সৌভাগ্যের ?

কি—তা বোধ হয় সেও বোঝে না।

বড ঘর, বিরাট খাট।

আলমারি, আলনা—সবই বড মাপের।

সেকালের ভারি ভারি আসবাব। খাট তো মেহগনির। আগে কেউ ড্রেসিং টেবিলের কথা ভাবত না। মাটিতে বসে কাঠের ঢাকনা দেওয়া আয়নার সামনের কাঠটা উল্টে আয়না ঈষৎ হেলিয়ে রেখে তাতেই মুখ দেখে প্রসাধন করত। তবে এখানের আয়োজনে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর আছে। প্রসাধনের জন্য সোনালি কাজ করা ফ্রেমে দাঁড়া-আয়না—প্রমাণমানুষ সমান খাসল বেলজিয়ামের কাঁচ। তার দর্পণত্ব, অর্থাৎ মুখশ্রী ঠিকমতো প্রতিপ্রক্ষিত করার শক্তি হয়তো ঠিক আগেকার মতো নেই—তবু কাজ চলে।

বিশাখার বাবা ফার্নিচার দিতে চেয়েছিলেন, বিশেষ ক'রে খাট বিছানা—এঁরা নিতে চান নি। নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা বিস্তর, খরচও কম নয়। পৌছলেও কোনোটা গোটা পৌছবে কিনা সন্দেহ।

হয়ত এই পুরনো মোটা দেওয়ালে পাথরের ছাদওলা ঘরে সে সব আসবাব বেমানানই হ'ত।

তবে সে সব কিছুই এখন দেখা যাচ্ছে না।

মনে হচ্ছে এই বিরাট খাট, আলমারি, আলনা—ওপাশের কোণে রাখা দুটি নতুন তোরঙ্গ (বর কনের সঙ্গে আসা) মায় আয়নার ফ্রেম - সবই ফুল দিয়ে তৈরী। ফুলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে পাথরের মেঝেও—পুরু কার্পেটের মতো। নূতন শয্যাও—সন্তর্পণে, দাগ না লাগে এমন ফুলের পাপড়িতে ঢাকা। খাট পুরনো, শ্যাম-সোহাগিনীদের ফুলশয্যাও এই খাটে হয়েছিল, কিন্তু সে শয্যা রাখেন নি তিনি, গদি তোশক বালিশ সব নতুন করে করিয়েছেন।

ঘরে ঢুকে মুগ্ধ নয় শুধু, বিশাখা ক্ষণিকের জন্য যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিছল।

এ কোথায় এল সে ? কোন স্বপ্ন- বা মায়ালোকে ?

ননদ ললিতা শোনাল, যে বৃদ্ধ প্রতি বছর কদিন ওদের ঝুলন সাজায়, যে কিশোর বয়সে ওদের বাবা-মার ফুলশয্যার খাট সাজিয়েছে—তারই হাতের সজ্জা,

অবশ্য এখন একা পারে না, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসে। ওর হাতের 'ফুলকামরা' দেখতে বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন ভেঙে পড়ে।*

ললিতাই একমাত্র ননদ, বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না। সেও রাধা দামোদরের গোসাঁইবাড়ির বড়বৌ। নিতান্ত পাড়ার মধ্যে বলেই এখানে আসার ছুটি পায় মধ্যে মধ্যে।

ফুলশয্যার অনুষ্ঠান-কৃত্যর সময় শ্যামসোহাগিনী উপস্থিত থাকবেন না, সে তো জানা কথাই—তবু একবার এসে বাইরে থেকে বলে গেলেন, 'এই মেয়েগুলো, তোরা অনর্থক দেরি করিস না। বৌমার ওপর দিয়ে বিস্তর ধকল গেছে আজ।'

প্রায় শ্রুতিগম্য ভাবেই ললিতা বলল, 'অ'হা রে, যেন ওঁর বৌমা আমরা চলে গেলেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।'

মোটামুটি অল্পেই কাজ সারা হয়। কারণ যে সব সধবা বা এয়ো এসব করবে, তাদের শরীরও আর বইছে না। তার ওপর এদিকেও রাত একটা বাজে এখন। রাত্রের ভোগের প্রসাদও খাবার লোক যথেষ্ট ছিল। অবশ্য দুপুর বা বিকেলের মতো অত নয়—দুবার মাঝারি পঙ্গতেই শেষ হয়েছে। ঠাকুরের শয়ন হবার আগে পঙ্গত বসাব নিয়ম নেই।

বিশাখাকে এখন সন্ধ্যার নূতন বেনারসী ছাড়িয়ে ওর বাবার দেওয়া সাদা জমির চওড়া লালপেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি পরানো হয়েছে, স্বরূপকেও ভোগ আরতির সময়ের তসরের ধুতি চাদর ছেড়ে জরিপাড় ধুতি চাদর পরতে হয়েছে। বোধ হয় রেশমী কাপড়ে দৈহিক অন্তরঙ্গতা বা ঘনিষ্ঠতার ব্যাঘাত ঘটে, দুটি দেহে এক হয়ে যেতে পারে না—এই কারণেই এ রীতি ছিল সেকালে।

তবু সেই অতি সাধারণ সাজেই মোটা গুঞ্জামালায় ফুলের আভরণে দেবকন্যার মতোই দেখাচ্ছে বিশাখ'কে।

কে একজন আত্মীয়া পিছন থেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি করব কি, আমারই তো চার দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে!'

'ইচ্ছেটা সামলাও খুড়ীমা', ললিতা বলল, 'নইলে বড় গোসাঁই-এর শাপে ভস্ম হয়ে যাবে। তোমারই যদি ঐ অবস্থা হয় বড়দার কি হচ্ছে বুঝছ তো! বলি

---

* বৈশাখ মাসে ঝারার সময় সন্ধ্যারতির পর বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে সুগন্ধি ফুলের ঘর বাড়ি, পালকি, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি রচনা করা হয়। এক এক সময় গভীর রাত হয়ে যায় সাজাতে বা দর্শন খুলতে। বিশেষ ক'রে রাধাবল্লভ বা বঙ্কুবিহারী মন্দিরে।—আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন এই ভাবে চলত, হালের কথা বলতে পারব না।

তোমারও তো একদিন এ পব্ব গেছে!'

'আ গেল যা! এই বলছিস খুড়ি আর ইয়ার্কি করছিস বর তুলে!'

'আজ সব চলে। সেই জন্যই তো মায়েরা থাকে না!'

এমনি হাসি-তামাশার মধ্যেই নিয়মকর্মগুলো সারা হয়। সেও তো হাসি-তামাশারই ব্যাপার। তবে বিশাখার অভিজ্ঞতা থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। ক্ষীর-মুড়কি খাওয়া ও খাওয়ানো নিয়ম—সেও আজ গোপীবল্লভকে নিবেদন করা হয়েছে নৈশভোগের সঙ্গে। কে একজন বললেন, 'তাহলে কি আজ আবার রাধারাণীও ফুলশয্যা করবেন নাকি? গোপীবল্লভ খাইয়ে দেবেন ওঁকে?' মহিলাদেরই আর একজন উত্তর দিলেন, 'ওঁদের তো নিত্য ফুলশয্যা ভাই, নিকুঞ্জ বনে তবে নিত্য ফুলের বিছানা পাতা হয় কি জন্যে? তবে হ্যাঁ, উচিত ছিল সেইখানে একটু ক্ষীর-মুড়কি রেখে আসা। বাংলাদেশ থেকে আনা মুড়কি—জমত ভাল।'

এখানে এ সবই ওর কাছে নতুন লাগছে। অবাক হয়ে যাচ্ছে সব কিছুতেই। শান্তিপুর ছাড়া, কলকাতা নবদ্বীপ কালনার দু একটা বিয়েবাড়িতেও গেছে। এমন পুষ্পশয্যা কোথাও দেখে নি সে।...

রীতি-নিয়মের পালা চুকিয়ে যাবার সময় ললিতা স্বরূপের সামনে হাত নেড়ে বলে গেল, 'আমি আর ফুলের গয়নাগুলো খুললুম না ভাই বড়দা। তোমাকেই ও কাজটা দিয়ে গেলুম। তবু এই ছুতোয় আলাপটা শুরু করতে পারবে!'

এই বলে বেশ শব্দ ক'রেই কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। অবাঞ্ছিতদের উপস্থিতিতে ছেদ পড়ল যেন এইটে বোঝাবার জন্যেই।

আড়ি পাতার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। প্রধান পাণ্ডা যার হবার কথা—ললিতা, তাকে এই রাত্রেই ফিরতে হবে। কাল সকালে সেখানেও কি সব বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, ভোরেই তা শুরু হবে। শ্বশুরবাড়ির ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি অপেক্ষা করছে।

তা ছাড়াও, শ্যামসোহাগিনীর নিষেধ আছে, 'ওদের যা দেহের অবস্থা আজ—ওসব অসভ্যতা কেউ যেন না করে।'

সেটা স্বরূপ নিজের কানেই শুনেছেন। এর ওপর আড়ি পাতার সাহস হবে—কার ধড়ে এমন দশটা মাথা!

সুতরাং উঠে দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সে বড় লজ্জারও—অভব্য ইঙ্গিত।

ঘরের মাঝখানে খাট, মৃদু কথা কেউ শুনতেও প .ব না।

স্বরূপ বিশাখার হাত দুটি ধরে সেই পুষ্পালঙ্কার-শোভিত অবস্থাতেই কিছুক্ষণ

নিষ্পলক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলেন। ভাল ক'রে দেখা হয় নি এ কদিন এক বারও, সুযোগ ঘটে নি বলতে গেলে, এই প্রথম দেখা।

দেখে আশ মেটার কথাও নয়। বিশাখা মাথা হেঁট ক'রে ছিল—একবার একটু তুলে দেবার চেষ্টা করলেন স্বরূপ, উঠলও কিছুটা, তবে স্বাভাবিক নিয়মেই চোখ দুটি বুজে রইল।

হাত ঘামছে স্বামীর হাতের মধ্যে—যেমন বিয়ের সময়, কুশণ্ডিকার সময় ঘেমেছিল। কাঁপছেও তেমনি থর থর ক'রে। আশা ও আশঙ্কায়।

অজানার আশঙ্কা?

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রাণস্বরূপ বললেন, 'সত্যিই আমি ভাগ্যবান। গোপীবল্লভ রাধারাণী আমার আশা শুধু নয়, কল্পনাও পূর্ণ করেছেন। বরং বেশী দিয়েছেন।'

তার পর নিজের মালাটা খুলে খাটের বাজুতে রেখে, চাদরটাও খুলে আলনায় মেলে দিলেন। ঘামে ভিজে গেছে, এত লোকের ভীড়ে আর উত্তেজনায়—গরম হবারই কথা। যদিচ একটি মেয়ে বরাবর পিছন থেকে বড় পাখায় বাতাস করেছে।

এর পর ফুলের গহনাগুলো খোলার কথা।

স্বরূপ একেবারেই আনাড়ি এ বিষয়ে। দূর থেকে দেখেছেন গহনা পরা অবস্থায়, অনেকের বিয়েতেই। কিন্তু কোথায় আটকানো হয়—কী করে খোলে তা কোনদিন দেখার কারণ ঘটে নি। মুকুটটা খোলা সহজ, তবু তারে চুল বেধে কবরী একটু অবিন্যস্ত হয়ে গেল, বোধ হয় দু-একগাছি সেই রেশমের মতো চুল তারের সঙ্গে উঠেও এল, ওর ঈষৎ মাথা নাড়াতেই বুঝতে পারলেন। যন্ত্রণায় ভ্রূও কুঁচকে উঠল। স্বরূপ 'ইস্' বলে ক্ষমা প্রার্থনার একটা ভঙ্গী করেন।

কিন্তু বালা তাগা নিয়ে আরও ফ্যাসাদ। বেশী টানাটানি করতে সাহস হয় না —বিশাখার গা ছড়ে যাবার ভয়ে।

'খুকিটা আমাকে আচ্ছা বিপদে ফেলে গেল তো! কাল আসুক না, মজা দেখাচ্ছি।...তুমি, তুমি একটু সাহায্য করতে পারবে?'

এই প্রথম বিশাখার মুখে একটু হাসির আভাস ফোটে, অর্ধআনত অবস্থাতেও বোঝা যায়।

সে নীরবেই হাতের বালা দুটো খুলে ফেলে, কেবল তাগা বা বাজু যাই হোক—বাহুবন্ধনী নিজে হাতে খুলতে একটু অসুবিধে হয়। ওদিকে না চেয়েও বুঝতে পারে স্বরূপ একদৃষ্টে চেয়ে আছেন—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তার কোথায় আটকানো আছে।

স্বরূপ সহজেই খুলে ফেলেন এবার।

মালাটা ওর খুলে নেওয়া উচিত হবে কিনা এবার—স্বরূপ ভাবেন, বিশাখারও বোধ হয় সেই প্রশ্ন—বেশী নির্লজ্জতা প্রকাশ পাবে না তো ?

স্বরূপই সমাধান করেন সে সমস্যার। আস্তে আস্তে বলেন, 'মালাটা খুলবে না ? মানে শোওয়ার অসুবিধে হবে তো নইলে— ?'

বিশাখা নিশ্চিন্ত হয়ে মালা খুলে স্বরূপেরই হাতে দেয়।

কিন্তু ততক্ষণে যেন স্বরূপ পাগল হয়ে উঠেছেন।

জীবনে এই প্রথম নারী এল, যে নারী সর্বতোভাবে ঈপ্সিতা। পাগল হবারই তো কথা। বিশেষ এই ওঁর পূর্ণ যৌবনে।

কোনমতে সে মালাটা ওঁর মালার পাশে রেখে অকস্মাৎ দুই সবল হাতে বিশাখাকে টেনে নেন একেবারে বুকের মধ্যে—কঠিন আলিঙ্গনে পিষ্ট করার মতো। পাগলের মতোই চুমো খেতে থাকেন—মুখে কপালে গলায় গালে। সত্যিই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, সে অবসরও ছিল না নিরন্ধ্র শিক্ষা-সূচীর মধ্যে—এ উচ্ছ্বাস বা প্রেমের আবেগের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, দেহের, স্নায়ুকেন্দ্রের কাজ তারা স্বাভাবিক নিয়মে করে যাচ্ছে মাত্র। ক্রমশ একসময় নিজেই বোধ হয় দেহধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে বিশাখার দুই ঠোঁটে জোরে চেপে ধরেন নিজের ঠোঁট—অনেক অনেকক্ষণ ধরে। তেমনি দেহধর্মের নিয়মেই বিশাখার গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট দুটিও উন্মীলিত হয়, যেন পুষ্প বিকশিত হয় পুরুষের প্রবল দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে।

শিথিল অবশ হয়ে আসে বিশাখার দেহ, এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে. চৈতন্যও যেন তলিয়ে যেতে থাকে···

অবশেষে, বোধহয় ক্লান্ত হয়েই এক সময় থামতে হয়।

জোড়া বালিশে ঠেস দিয়ে বুকের মধ্যে থেকে বিশাখার মুখটা তুলে ধরেন। বলেন, 'আমাকে—আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে যমুনা—ঠিক ক'রে বলো তো ! আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে তুমি ঠিক সুখী হও নি আমাকে পেয়ে—তাই কি ?'

যে জন্য এ প্রশ্ন, স্ত্রীর মুখে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ শোনা—বা প্রশ্নের শেষাংশের প্রবল প্রতিবাদ—যাতে পছন্দ হওয়াটাও স্বীকৃত হয়ে যায় ; কথোপকথন আলাপ-প্রণয়ের সূত্রপাতও হয়—তা কিন্তু হয়ে ওঠে না।

এর উত্তরে এবার বিশাখাই জোর ক'রে—সবলে, যেন, ওঁকে আঁকড়ে ধরে স্বরূপের বুকের মধ্যে মুখটা চেপে ধরে। সে মুখ কোনমতেই আর তুলে ধরতে পারেন না স্বরূপ।

সারারাত ধরেই সেই ভাবে রইল বিশাখা।

যেন এ বাহুবন্ধন না স্বামী খুলতে পারেন কোনদিন—এমনি ভাবে অবুঝের মতোই বুকে মুখটা চেপে থাকে, দু হাতে তেমনি জড়িয়ে ধরে।

এটা যে নববধূর পক্ষে অশোভন দেখাতে পারে, তাও তার মাথায় থাকে না।...

ফলে এতদিনের প্রতীক্ষিত বহুঈপ্সিত বিবাহিত জীবনের প্রথম প্রণয়-রজনীটিতে প্রিয়তমার কণ্ঠের একটি প্রণয়গুঞ্জনও শোনা হয় না স্বরূপের।

৩

সেবা বলতে যা বোঝায় তা করেন বেতনভুক পূজারী। একজন নন—দুজন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ আছেন সে জন্যে। গোসাঁইরা বিশেষ পূজার দিন আসনে বসেন, অনেক সময় নিজেরা সন্ধ্যারতি বা ভোগ-আরতি করেন। স্বরূপের বাবা মূল পূজা নিজেই করতেন বেশির ভাগ, একজন মাত্র পূজারী ছিলেন সহকারী হিসেবে। স্বরূপ কাশী চলে যেতেই দুজন পূজারী রাখতে হয়েছিল। ফিরে আসার পরও কাউকে ছাড়ানো হয় নি। ছোট ভাই ছেলেমানুষ, শাস্ত্র বদলে ইংরেজী লেখাপড়ার দিকেই তার ঝোঁক বেশী এখনও। একজন পণ্ডিত এসে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়ান—শাস্ত্রও পড়াতে চেষ্টা করেন, তবে ত' যে ওর মাথায় ঢোকে তা মনে হয় না।

সেবা বলতে কাজ অনেক।

শয়ন থেকে তোলা বা ঘুম ভাঙানো : সেটা বাড়ির মেয়েরাই রাধারাণীর নাম-গান করে সম্পন্ন করেন। সত্যি সত্যিই গানও হয় কিছু, ভজনই বেশী—তবে মন্দিরা ছাড়া কোন বাদ্য থাকে না।

তারপর পূজারী দরজা খোলেন। মঙ্গল আরতি হয়। আরতির পর রাত্রের শৃঙ্গার বেশ ত্যাগ করিয়ে পূর্বদিনের চন্দন ও গোপীচন্দনের পত্রলেখা বা—প্রচলিত বাংলায় যাকে অলকা-তিলকা বলে—তা মুছে ফেলতে হয়। অতঃপর সুগন্ধি তেল মাখিয়ে স্নান, প্রথম দুধে পরে যমুনার চন্দনবাসিত জলে ; বেশ ও নূতন পত্রলেখা রচনা। বেশ প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। রাধা ও গোপীবল্লভের অন্তত পঞ্চাশ দফা বেশ আছে। কোনদিন ধুতি চাদর, কোনদিন চোস্ত পাজামা ও দীর্ঘ ঘেরের কুর্তা যা সোলার সাহায্যে চারিদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়, মনে হয় ঠাকুর নাচছেন। রাধারাণীরও সেইমতো ঘাঘরা-কাঁচুলি বা শাড়ি।

এটা এঁদের সামর্থ্য মতো। এই শ্রীধামে ছোট ছোট মন্দির অজস্র। কোন ভক্ত বা ভক্তিমতী প্রাণের আবেগে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন কিন্তু যথেষ্ট অর্থ রেখে যেতে পারেন নি। যাও বা রেখে গেছেন—বন্দোবস্তে যথেষ্ট কড়া বন্ধন না থাকায় তা পর-হস্তগত হয়েছে অধিকাংশ। এই সব কুঞ্জ-স্বামীদের বিলাসিতা চলে না। একই

পোশাকে হয়ত বিগ্রহ যুগলকে কাটাতে হয় দিনের পর দিন। একেবারে ছিঁড়ে না গেলে নূতন পোশাক পান না বেচারীরা।

একেবারে মূলে হাভাত হয়েছে দেবত্র সম্পত্তি যেখানে—সেখানের কোন কোন ক্ষেত্রে পূজারীর করুণা বা পাড়ার লোকের আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। কখনও হয়ত অন্য কুঞ্জে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন পূজারী। সেখানের কুঞ্জাধিপতির সিংহাসনের অদূরে একটি চৌকীতে আসন লাভ করে এঁরা কৃতার্থ হন।

শখ অনেকেরই হয়। তীর্থস্থানে দেবপ্রতিষ্ঠা পুণ্যকর্ম। তার এইসব শোচনীয় পরিণতি দেখেও আবেগপ্রবণ ভক্তদের চৈতন্য হয় না। কাশীতে এমন পরিত্যক্ত—কোন ঘাটে কি গাছতলায় স্তূপীকৃত—শিবলিঙ্গ বোধ হয় হাজার হাজার পড়ে থাকে। অনেকেই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পথে ব'সিয়ে এসে দেবত্রর প্রমাণ লোপ ক'রে বাড়ি বেচে দিচ্ছেন।

এই ব্রজধামে অনেক ভক্তিমতী স্ত্রীলোক এ কর্ম ক'রে গেছেন। বারাঙ্গনা সবাই নন, এমনি অবস্থাপন্ন বিধবা মহিলারাও কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজেরা যতদিন বাঁচেন ভালভাবেই সেবা পূজা করেন, তাঁর রজঃপ্রাপ্তির পর কি হবে কেউ ভাবেন না। এ ছাড়া বহু বিখ্যাত গায়িকা, অভিনেত্রী, কীর্তনওয়ালী—এ দুর্মতিতে পেয়েছে অনেককেই। শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহের সন্তান গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবদ্দশায় নাট্যসম্রাজ্ঞী তিনকড়ি এই প্রস্তাব করেছিলেন—গিরিশবাবু প্রবলভাবে নিষেধ করেন। বলেন ঃ 'কখনও না। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দুর্গতি প্রতিষ্ঠাতার মহাপাপের কারণ।' আরও নাকি বলেছিলেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরোধর্ম ভয়াবহ।'

কিন্তু গোপীবল্লভ বা গোবিন্দ-গোপীনাথ মদনমোহন-রাধাবল্লভ-বঙ্কুবিহারী-রাধারমণ-দামোদর—এঁরা 'কামাযে' ঠাকুর। সম্পত্তিও যথেষ্ট—উপার্জনও পর্যাপ্ত করেন। সেই কারণে, ভক্ত দর্শকদের চোখের সামনে সর্বদা থাকেন বলে, সেবার অনিয়ম ঘটে না।

শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের সেবাইত মোহান্তদের আত্মবৎ সেবা—মহিলামহল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়ির গৃহিণী বা বধূরা অনেকেই ভোরবেলা স্নান সেরে এসে গুন্‌গুন্ ক'রে শ্রীরাধার স্তব বা ভজন গাইতে গাইতে সাধারণ বা অসাধারণ রূপসজ্জা, তিলকচন্দন সেবা, বেশ পরিবর্তন—এ কাজগুলো ক'রে দেন—অধিকাংশ দিনই। ভোরে মঙ্গল আরতি বা রাত্রে শয়ন আরতির ঘড়ি কাঁসর—তাঁরাই বাজান।

দর্শন খোলার পূর্ব পর্যন্ত এঁদের অধিকার। সাধারণ দর্শকের সামনে এঁরা থাকেন না।

শ্যামসোহাগিনী নিজে কিছু করেন না কিন্তু বাল্যভোগ বা লাড়ুভোগ—কেউ কেউ বলেন ক্ষীরসা ভোগ, কেন না লাড়ু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না, থাকে পেঁড়া ও এই ক্ষীরসা (ছোট ছোট খুরিতে ঢাকাই ক্ষীরের মতো ক্ষীর ঢালা, এটা অন্তত আগেকার দিনে লাড়ুভোগে অপরিহার্য ছিল। প্রসাদ হিসেবে একটা ক'রে খুরি হাতে দেওয়া অনেক সুবিধা)—লাগবার আগে পর্যন্ত, মন্দিরের মধ্যে বা নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে সেবার ত্রুটি না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।

অন্য মেয়েরা বিশাখাকেও দলে টানতে চান।

তার সঙ্কোচের অবধি থাকে না। বিগ্রহ স্পর্শ করতে কেমন ভয় হয়—বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে থাকে। প্রস্তাবের পরমুহূর্তেই বোধ হয় ললাটে স্বেদরেখা দেখা দেয়।

শ্যামসোহাগিনী তা লক্ষ্য করেন, হাসেন।

সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি।

অন্যদের বলেন, ছেলে স্বরূপকেও, 'এমন ভাবে সেবা তো ওদের জানা নেই, দেখেও নি কখনও—ভয় তো করবেই। আর সত্যিই তো—এ তো আগুন নিয়ে খেলা। যেখানে আমরা মনে করি এই বিগ্রহের মধ্যে ভগবান বিরাজ করছেন—সেখানে তাঁকে স্পর্শ করতে ভয় করবে না? আমাদের এ সাহস ভালবাসার স্পর্ধা থেকে। আগে সে ভালবাসা জন্মাক—তবে তো! এরা নিভয়ে এ কাজ করে, অভ্যাসবশত। অত বোঝে না। অজ্ঞানের সাহস। আর করতে পারেন সেই সব সাধিকারা—যাঁদের গোপীভাবের সাধনা, সত্যি সত্যিই ভগবানকে আপনজন ভাবেন—ভাবতে পারেন।'

যথার্থই যমুনার এ ধরনের পূজা সেবা জানা নেই। বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছেন। গোপাল মূর্তিও আছেন। পূজারী এসে দুবেলা পূজা ক'রে যান। সন্ধ্যায় ও আরতির সঙ্গে শীতল দিয়ে—সেও লুচি-পায়স হয়ে ওঠে না অধিকাংশ দিনই—দুধ সন্দেশ দিয়েই কাজ সারতে হয়—পূজারী দুধটুকু নিয়ে বাড়ি চলে যান। মা সকালে দুটো ছোট নৈবেদ্য করেন, ভোগও সব দিন রান্না করতে পারেন না। অপর কোন আত্মীয়াকে ডেকে করাতে হয়। সকালে ভোগ রান্না হয়ে ওঠে না বলে বাড়ির ছেলেরা কেউ ভোগটা নিবেদন ক'রে দেয়। দুটো তুলসীপাতা দিয়ে নিবেদন করা—এই তো। এটুকু মন্ত্র সবাই জানে।...একথা যমুনা শাশুড়িকেও বলেছে, সত্য গোপন করে নি।

সাধারণ গৃহস্থ-ঘর ওদের। জমিজমার ওপরই ভরসা। হয়ত কিছু পুঁজি জমা আছে কোথাও—দু-একখানা কোম্পানীর কাগজ—অত যমুনা জানে না।

প্রথম যখন এ বিবাহের প্রস্তাব আসে তখন অসমান ঘরে বিয়ে দিতে বাবা রাজী হন নি, অবস্থার অনেক ফারাক বলে আপত্তি করেছিলেন। শিক্ষিত বড়-লোকের ছেলেকে জামাই করতে গেলে যা দেওয়া উচিত, যতটা খরচ করা—তা দেবার বা করবার সঙ্গতি ওঁর নেই। বস্তুত তার দশমাংশও দিতে পারবেন না। যমুনার মাও ভয় পেয়েছিলেন, মেয়ের ক্ষোয়ার হবে বলে।

ওপক্ষ থেকেই চাপ আসতে লাগল যখন, আশ্বাস এল যে তাঁদের কিছুই দিতে হবে না, নগদ আসবাব কিছুই না, অলঙ্কার শাশুড়িই ছেলের সঙ্গে যথেষ্ট পাঠাবেন, মেয়ের বাবা যদি কড়লোহা দিয়েও বিয়ে দেন, তাহলেও কোন অসুবিধা হবে না, কেউ জানতেও পারবে না।—তখনই রাজী হয়েছিলেন বাবা-মা।

সুলক্ষণা সুন্দরী সঘরের মেয়ে ঠাকুর দেবতার ঘরে নিরামিষ খেয়ে খুশী থাকবে —এমন বাঙালীর মেয়ে দুর্লভ বৈকি।

ভোরে মঙ্গল আরতির সময় ছাড়া বাড়ির মেয়েদের মন্দিরে যাওয়ার রীতি নেই। কেবল শয়ন আরতির সময়, যখন বহিরাগতরা কেউ থাকে না, তখন কোন কোন বয়স্কা এসে নাটমন্দির থেকে দর্শন ক'রে যান।

অন্দরমহলে গোবর্ধন শিলা আছেন, একটি সিংহাসনের ওপর। তাঁকেই তুলসী দিয়ে প্রণাম ক'রে জলযোগের পর্ব শুরু করেন সকলে, মধ্যাহ্নের পঙ্গতে বসার আগেও তাই।

বিশাখাকেও সে অভ্যাস করিয়েছেন।

স্নানের পর আহ্নিক শেষ ক'রে মন্দিরে যাওয়া, তারপর গোবর্ধন শিলায় তুলসী দিয়ে পরিক্রমা ক'রে তবে জল মুখে দেয় সে।

এ বাড়ির এই রীতি।

এক মাস যখন শেষ হয়ে আসছে, শ্যামসোহাগিনী একদিন প্রশ্ন করেন, 'বৌমা, মেয়েদের অশুচি অবস্থায়—মানে মাসিকের সময় মন্দিরে যেতে নেই, গোবর্ধনকেও স্পর্শ করা নিষেধ। গোবর্ধনই এখানে শালগ্রাম শিলার কাজ করেন, "আও লালা খাও জী" বলে ভোগ নিবেদন করলে গোবিন্দ স্বয়ং সে অন্ন গ্রহণ করেন। ঐ পাথরের শিলাটুকুকে সামান্য ভেবো না।'

নতমুখ আরও নত হয় বিশাখার, শুধু বলে, 'জানি মা।'

'কিন্তু—', বলতে গিয়ে থেমে যান শ্যামসোহাগিনী। অভ্যস্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। কোথায় যেন একটু সাগ্রহ প্রত্যাশার ভাবও ফুটে ওঠে সে দৃষ্টিতে—'কিন্তু এক মাস তো হয়ে গেল প্রায়।'

'আমার—আমার কিছু ঠিক থাকে না মা। বরাবরই এই রকম।' মুখ আরও নত হয়ে যায়, জড়িতকণ্ঠে উত্তর দেয় বিশাখা, 'কখনও কখনও তিন মাসও হয়ে যায়।'

আর কিছু বলেন না শাশুড়ি।

প্রশ্ন করেন স্বরূপও। বিশাখা উত্তর দেয় না, স্বামীর দেহের খাঁজে মুখটা চেপে ধরে থাকে শুধু।

কিছু বুঝতে পারেন না প্রাণস্বরূপ।

বিশাখার আচরণে কোন বিরূপতা নেই, বরং যেন নির্ভরতার ভাবও বেশী। আদরে সোহাগে যে বীতস্পৃহা তাও না। কোথাও কোন কঠোরতা কি বিরূপতাও প্রকাশ পায় না। বরং এক এক সময় মনে হয়—কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে সে।

স্বামী-স্ত্রীর আদিম সম্পর্ক—সব কিশোরী বা তরুণী মেয়েরই সে সম্ভোগে উন্মত্ত হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু, স্বরূপের মনে হয় বিশাখা অংশগ্রহণ করে মাত্র, উপভোগ করে না।

যৌন-সম্পর্কে অনীহা? না স্বামী সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা?

স্বরূপকে পছন্দ হয় নি?

সে কথাও বার বার জিজ্ঞাসা করেন—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, নানান ভাষায়।

'ঠিক ক'রে বল তো বিশাখা, আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি?' আহত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বার বার।

কথাটা ভাবতেই যেন আত্মসম্মানে, অবচেতন-অহংমকায় আঘাত লাগে, আত্ম-প্রশান্তিতেও।

অথচ তাই বা কেন হবে। প্রশ্ন মাত্রেই যেন শিউরে ওঠে, প্রবলতর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে স্বামীকে।

সকালে উঠে এক একদিন প্রণাম করার সময় তেমনি দুই পায়ের খাঁজে মুখ চেপে ধরে—সেই প্রথম দিনের মতো। আশ্বাস ও আশ্রয় প্রার্থনার ভঙ্গীতে। অন্তত স্বরূপের তাই মনে হয়।

স্বভাবত স্বল্পভাষী?

কথা যে একেবারে কয় না তাও তো নয়। সাধারণ ভাবে সব কথাই বলে, যদিও প্রশ্নের উত্তরই বেশির ভাগ। সেবার আগ্রহ সমধিক। যেন স্বামীর এতটুকু সেবা করতে পেলে জীবন সার্থক হবে—এই রকম ভাব। তবে ভালবাসার প্রশ্ন এলে এমন কাঠ হয়ে যায় কেন?

শ্রেষ্ঠতম আলিঙ্গনে, জীবনের গভীরতম ঘনিষ্ঠতায় কেন ওপক্ষ থেকে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য—প্রত্যুত্তর বলাই উচিত—আসে না।

একবার একজনের মুখে শুনেছিলেন, 'এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, যারা ভালবাসলেও দৈহিক সম্পর্কে উৎসুক নয়, তাদের ইংরেজীতে বলে 'কোল্ড্'—শীতল। এও কি তাই ?

কিন্তু তাহ'লে এই সারা রাত্রি এমন ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে এমন দেহের কোন একটা খাঁজে মুখ গুঁজে থাকা—যেন স্বামীর দেহ আঘ্রাণ করা—কেন হবে ? সে জড়িয়ে থাকায় দুজনেই ঘেমে নেয়ে ওঠেন, তবু হাত বাড়িয়ে পাখাখানা পর্যন্ত নিতে পারেন না স্বরূপ—স্ত্রীর বাহুবন্ধন একটু শিথিল করিয়ে। আবার, যখন সচেতন হয়ে ওঠে, স্বামীর কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারে—নিজেই উঠে গিয়ে পাখা এনে দাঁড়িয়ে বাতাস করে দীর্ঘক্ষণ ধরে। তখন কাছে টানলেও আসে না।

তাহ'লে পছন্দ হয় নি, ভালবাসে নি, শীতল—এ সব কথা তো বলা যায় না।

কী এ ?

এক এক বার ভাবেন—জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়ার মতো সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে এসে পড়ে একটা মানসিক চাঞ্চল্য ? কিছুই ভাল লাগছে না এখানের ? নিরামিষ খাওয়া, আতপ চাল—এতে অসুবিধা ?

শ্যামসোহাগিনীও লক্ষ্য করেন বধূর—ঠিক বিষণ্ণ হয় তো নয়—কেমন অসুখী মুখভাব। সোনার কমলে প্রভাতের প্রসন্নতা ম্লানতরই হচ্ছে যেন।

তিনিও ভাবেন, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে এসে পড়ার জন্যেই এ বিষাদ।

শান্তিপুর থেকে আনা দাসী হরিমতী তখনও ফেরে নি—সঙ্গে যাবার মতো লোকের অভাবে, তাছাড়া মথুরা গোকুল মহাবন এসব দর্শন করার ইচ্ছাতেও—সেও তত তাড়া দেয় নি। এবার সেও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, স্পষ্টই বলে, 'না মা, বলতে নেই প্রসাদ খুবই ভাল—এমন পঞ্চ-ব্যঞ্জন-ভাত কোথায় পাব—তবে কি জানেন, এসব তো অব্যেস নেই !'

শ্যামসোহাগিনী সেই সুযোগেই প্রশ্নটা তোলেন, 'হ্যাঁ গো মেয়ে, বৌমা অমন শুকিয়ে বেড়াচ্ছে কেন বল তো ? ওরও কি তোমার মতো খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে ?'

'না গো মা, না না। এমনিতেই—বোধ হয় বিধেতা এখেনে পাঠাবেন বলেই এই ছাঁচে গড়েছেন—মাছ মাংসে কোন দিনই তত রত নয়। তা ছাড়া বাড়িতেও তো অন্নভোগ হয়, সেও তো নিরিমিষ্যি, আলোচালের ভাত, দিব্যি খেত।...তা নয়, আসল কি জানো—ছোটবেলা থেকেই বড্ড বাপ-সোহাগী যে, বাপ ভেন্ন আর

কারুক্কে জানে না। বাপেরও আদুরী মেয়ে হ'ল চক্ষের মণি। জমি থেকে এসে সব্বাগ্যে মেয়ের খোঁজ—সে কোথায় গেল!'

এইটেই সম্ভব, বিশ্বাসযোগ্য। শ্যামসোহাগিনীও নিশ্চিন্ত হন।

কথাটা স্বরূপও শোনেন। মনে হয়, এত দিনের রীতি ভেঙে ওকে একবার বাপের বাড়িতেই পাঠাবেন নাকি?...

মনের মধ্যে কদিন তোলাপাড়া ক'রে আগে ওর কাছেই একদিন কথাটা পাড়েন, 'বাবার কাছে যেতে চাও? খুব মন কেমন করছে? বলো তো বাড়ির অমতেও পাঠিয়ে দিই একবার—দিন পনেরোর জন্যে? ত্যাখো—।'

বিশাখা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে একেবারে, 'না না, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমাকে কোথাও পাঠাবেন না!'

কিছুই বুঝতে পারেন না স্বামী।

এ কি মূর্তিমতী প্রহেলিকা বিয়ে ক'রে আনলেন তিনি!

আরও মাসখানেক কাটবার পর বিশাখা যেন কাঠ হয়ে উঠল।

শুকিয়ে কাঠ হওয়া নয়, যদিচ রোগা হয়েছে একটু সেটাও ঠিক—এ যেন আলাদা কাঠ হয়ে যাওয়া, যেমন কোন আতঙ্কে হয়।

আর এই পরিবর্তনটা সর্বাগ্রে শ্যামসোহাগিনীরই চোখে পড়ে।

স্বভাব-গম্ভীর মুখ তাঁর অন্ধকার হয়ে ওঠে।

স্বল্পভাষিণী কর্ত্রী আরও স্বল্পবাক হতে চান।

মুখের মেঘ কাটেও না। দৃষ্টি হয়ে ওঠে সংশয়-কুটিল। কেবলই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন বিশাখার দিকে, কী যেন লক্ষ্য করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কেন এমন ভাবে চেয়ে থাকেন, কি দেখেন কেন দেখেন—কাউকে বলেন না। বিশাখাকেও কোন প্রশ্ন করেন না।

আর কদিন দেখে বধুকে—এরা বৌরাণী বলতে শুরু করেছে প্রথম থেকেই, আশ্রিতা দাসদাসীর দল—মন্দিরে যেতে নিষেধ করলেন। সেই সঙ্গে গোবর্ধন পূজাও নিষিদ্ধ হ'ল।

নিষেধ করলেন ওকে নিভৃতে একা ডেকে। স্বল্প কথায় মূল বক্তব্যটা শুধু বলে চলে গেলেন অন্যত্র।

বিশাখা যে নিশ্চল পাথর হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, তাও চেয়ে দেখলেন না।

কি কারণে এই নিষেধ তা কাকেও বললেন না, ছেলেকেও না।

আত্মীয়া-দাসী-আশ্রিতার দল বিমূঢ় হয়ে যায়। দ্বিধায় পড়ে।

অন্তঃসত্ত্বা? তাহলে তো আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে যাবার কথা। বংশের প্রথম সন্তান আসছে, নতুন এক পুরুষের শুরু হবে।

ছেলেই হবে। এ বংশে মেয়ে কম।

সুতরাং প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা হলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, দেবালয়ে দেবালয়ে পূজা পৌঁছবে—এই তো সবাই জানে।

এক আত্মীয়া আব এক আত্মীয়াকে চুপিচুপি প্রশ্ন করেন, 'বৌ হিজড়ে নয় তো? আমার এক ভাসুরপোর কপালে অমনি জুটেছিল। সে আবার এমন, বৌকে বিদেয় করতে দিল না। অন্য বিয়েও করল না। বলে, ওর কি দোষ? দোষ গোবিন্দর, আর আমার কপালের। নইলে কারও তো এমন শুনি নি।'

যতই সংশয় ও কল্পিত কারণ মনে দেখা দিক, কৌতূহল যতই প্রবল হোক—শ্যামসোহাগিনীকে কেউ প্রশ্ন করবে এমন সাহস কারও নেই। শুধুই ছটফট করে সবাই।

আরও দশ-বারোদিন দেখে মথুরার বড় ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। সেই সঙ্গে এ বাড়ির পুরাতন দাইকেও। এরাই যথেষ্ট, বরং দেখা যায় ডাক্তারের থেকে বেশী বোঝে—তবু নিশ্চিন্ত হতে চান বলেই অত বড় ডাক্তার ডাকা।

পরীক্ষার সময় কাউকে থাকতে দেওয়া হ'ল না। গভীর রাত্রে ডাক্তাব এলেন, ঠাকুরের শয়ন হয়ে যাবার অনেক পরে—প্রসাদ পাবার পর অধিকাংশই গৃহগত হলে। এত রাত্রে আসার জন্য ডাক্তারকে ডবল ফি দিতে হ'ল।

স্বরূপ বিহ্বল হয়ে পড়েন।

স্ত্রীর কথা নিয়ে মার সঙ্গে আলোচনা করা বা কোন প্রশ্ন করা তখন অশালীন ধলে গণ্য হ'ত। বিশেষ তাঁর মায়ের মতো রাশভারী মানুষকে সে প্রশ্ন করার সাহসও নেই।

ফলে নানা প্রকার—নিরসনের উপায়হীন—কুটিল সংশয় দেখা দেয় তাঁর মনেও।

স্ত্রীকে প্রশ্ন ক'রে কোন লাভ নেই। সেখানেও উত্তর পাওয়া যাবে না।

সে পা জড়িয়ে ধরবে, কাঁদবে শুধু।

আগে বুকে মুখ লুকোত, এখন কে জানে কেন, অত জড়িয়ে ধরে না। আগে যেটুকু ছিল—কঠিন আলিঙ্গন—তাও আজকাল পাওয়া যায় না।

আজকাল গোপনে চোখের জল ফেলে বিশাখা, তাও লক্ষ্য করেন।

বুক ভারী হয়ে ওঠে স্বরূপের। অস্বস্তি ও অশান্তির সীমা থাকে না।…

আরও—কী এক অজানা কারণে, বিশাখাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও যেন কেমন ভয় করে। কী উত্তর পাবেন, পাওয়া সম্ভব—তার আবছা একটা কল্পনা মনে আসতেই সমস্ত মন ও দেহ যেন অবশ হয়ে আসে।

মনে হয় বরং পালিয়ে যান কোথাও।

মা আর যাই হোন, অবিবেচক নন আদৌ। তিনি কিছু বলছেন না যখন—তখন, তখন হয়ত বলার মতো নয়। হয়ত ছেলে কোন প্রবল আঘাত পাবে সেই জন্যেই বলছেন না।

কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সংশয় ও আশঙ্কা দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন—যেন এটা দৈহিক কিছু।

না না, হয়ত জরায়ুজ কোন পীড়া আশঙ্কা করছেন মা, এতদিন মাসিক হচ্ছে না দেখে। সন্তান যদি একেবারেই না হয়, এই ভয়ে ডাক্তার আনাচ্ছেন।

মনকে নানা রকমে আশ্বস্ত কবার চেষ্টা করেন স্বরূপ।

ডাক্তার ও দাই পরীক্ষা ক'রে মতামত জানিয়ে চলে যাবার পরই নতুন এক আদেশ জারী হ'ল।

ঠাকুরবাড়ী থেকে সামান্য দূরে—অথচ সীমানার বাইরে, একটি ছোট বাগান-বাড়ি আছে এঁদের। ছোট বাড়ি, চারিদিকে গাছপালায় ঘেরা। একজন মাত্র মালী (সে-ই দারোয়ানও) থাকে, বাড়ি ঘর সাফ রাখা ও গাছপালা দেখার জন্যে।

সেই বাড়ি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে, বিছানা রোদে দিয়ে বাসনপত্র প্রভৃতি মেজে রাখার হুকুম হ'ল।

এটাই এঁদের আঁতুড়-মহল। এ বাড়ির মধ্যে সন্তানের জন্ম হলে—ঠাকুর সেবার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। নইলে নতুন ক'রে অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত ভোগ-পূজা বন্ধ থাকে, বিলম্বিত হয়। গোসাঁইদেরও ততক্ষণ উপবাসী থাকতে হয়। এমনই তো শুভ অশৌচেও কদিন দেবতাকে স্পর্শ করা নিষেধ।

এখানে কাকে পাঠানো হবে? পুত্রবধূকে নাকি? কিন্তু এই তো মাত্র তিন মাস বিয়ে হয়েছে। তবে?

এ প্রশ্নও নিরুত্তরিত থেকে যায়। আসলে প্রশ্নটাই যে করা হয়ে ওঠে না।

পরের দিনই সেই বাড়িতে সরিয়ে দেওয়া হ'ল বিশাখাকে।

দিনে নয়, রাত্রে। ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলিতে চাপিয়ে। অবগুণ্ঠনবতী হয়ে নীরবে এসে ডুলিতে চাপল। সে সময় স্বরূপ পর্যন্ত রইলেন না। শুধু পূর্ববৎ গম্ভীর অন্ধকার মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্যামসোহাগিনী।

অন্য কোন পরিজন বা দাসদাসী—কেউ না এসে দাঁড়ায়, সে হুকুম আগেই দেওয়া হয়ে ছিল।

শুধু শোনা গেল এদের আঁতুড়ঘরের যে পৃথক পাচিকা ও রামরতিয়া বলে এক দাসী আছে, তারা অপরাহ্ণেই পৌঁছে গেছে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য, খাদ্য-বস্তু, কাঠ, লণ্ঠনের তেল—সবই।

পাহারা দেবার জন্য অতি পুরাতন ও বিশ্বস্ত এক দারোয়ানও।

অর্থাৎ এখানের সঙ্গে কোন দৈনিক সম্পর্ক বা আসা-যাওয়ার না প্রয়োজন থাকে। লোক যাতায়াত থাকলেই নানা প্রশ্ন, নানা আলোচনা, কানাকানি গা-টেপাটিপি।

পরের দিন প্রত্যুষেই, মঙ্গল আরতিরও আগে, স্বরূপ চলে গেলেন—বৃন্দাবন নগরসীমার প্রান্তে, যেখানে গোপীবল্লভের বাগানবাড়ি। প্রতি রাসযাত্রায় সোনার চতুর্দোলে চেপে যেখানে যান ঠাকুর ও রাধারাণী।

যাবার সময় শুধু মাকে প্রণাম ক'রে গেলেন। তিনিও কিছু বললেন না, মাও কোন প্রশ্ন করলেন না।

৪
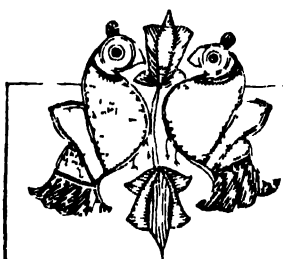
সাড়ে তিন মাস পরে একটি পুত্র-সন্তান হ'ল বিশাখার।

তার আগেই একদিন সমস্ত আশ্রিতা পরিজনদের ডেকে কঠোরভাবে সতর্ক ক'রে দিলেন শ্যামসোহাগিনী, বৌমা বললেন না, বিশাখাও না, যমুনা বলেই উল্লেখ করলেন—যমুনা সম্বন্ধে কোন আলোচনা, কানাকানি না এ বাড়িতে হয়, তার সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্যও। যদি কখনও এমন ধরণের কিছু ওঁর কানে আসে, ওর নাম ক'রে কেউ কোন আলোচনা করেছে কি কিছু বলেছে—তাহ'লে তার আর গোপীবল্লভের আশ্রয়ে থাকা হবে না, সেইদিন তদ্দণ্ডেই তাকে বিদায় নিতে হবে।...

এ বংশের বর্তমান বড় গোসাঁই-এর স্ত্রী পুত্র-সন্তান প্রসব করল—অথচ শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি হ'ল না, দেবালয়ে দেবালয়ে পূজা গেল না, পরিচিত বা আত্মীয়মহলে পেঁড়া কি লাড্ডু বিতরিত হ'ল না—বৈষ্ণব নাম-কীর্তনকারীরা নন্দোৎসবের গান গাইল না—এ অভূতপূর্ব ঘটনা, এ বাড়ির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই।

অন্যদিকে অবশ্য যা করণীয় তার কোন ত্রুটি ঘটে নি।

একুশদিনে স্নান, ক্ষেউরি—সবই হ'ল নিয়মমতো। কী পাড় শাড়ি এক্ষেত্রে পরানো হবে, নববস্ত্র দেওয়া হবে কিনা—প্রশ্ন করতে স্বয়ং শ্যামসোহাগিনীকেও কয়েক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হতে হ'ল—তার পরই যেন ধমক দিয়ে উঠলেন প্রশ্নকারিণীকে, 'লালপাড়ই দেবো—যা দেওয়া হয়, নিয়ম। পাড় নিয়ে এত মাথাব্যথা পড়ল কার?' ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মনে পড়ে গেল তাঁর, স্বরূপই মাথায় সিঁদুর দিয়েছে নিজে হাতে—এখানে কালাপাড কাপড পরালে ছেলেরই অকল্যাণ হবে না কি?

এ পর্যন্ত নিয়ম রক্ষা হ'ল, সিঁদুরও পরানো হ'ল। কিন্তু ষষ্ঠীপুজোর প্রশ্ন কেউ তুলল না, কর্ত্রীও কিছু বললেন না। শুভাশৌচ যখন পালন করল না কেউ তখন আর ষষ্ঠীপুজো কিসের?

শুদ্ধ হবার পরের দিনই যাত্রার ব্যবস্থা। যমুনার স্বাস্থ্য কেমন—এতখানি যাত্রা-

পথ, ধকল সহ্য করতে পারবে কিনা—রামরতিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

রামরতিয়ার উত্তরও অবিস্মরণীয়, 'বড়মা—মানুষটা মানুষ থাকলে তার ভাল-মন্দর কথা ওঠে। এ তো কাঠ। লকড়ির গুঁড়িয়া হয়ে গেছে। মুখে দুঃখের ভাবও নেই, হাসিও নেই। খেতে বললে যা পারে একটু মুখে দেয়। শুতে বললে শুয়ে পড়ে। বাচ্ছাটার দিকে তাকায়ও না। দুধ দেবার উপায়ও নেই—দুধ আসবে কোথা থেকে? না খেয়ে খেয়ে শরীরে কিছু রেখেছে? প্রথম থেকেই ঢোকা দুধ খাওয়াতে হচ্ছে। সব সময় যেন পাথর হয়ে বসে থাকে। দেহে প্রাণটা আছে কিনা বোঝা যায় না। যদি চোখে জলও পড়ত তো বোধহয় বেঁচে যেত মানুষটা।'

তারপর হাত জোড় ক'রে বলেছিল, 'বড়মা, আমার ছোটমুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, আমি আপনার পায়ের ধুলো হবারও যুগ্যি নেই, তবু বলছি, না বলে থাকতে পারছি না, জুতো মারতে হয় তো মারবেন—এ যেন মরতেই চাইছে। কিন্তু মরণ কি এত সহজে আসবে? হাজার হোক, নওজওয়ান লড়কী। এ জায়গা ওর ভাল লেগেছিল বড়মা, তোমাদেরও। এই জায়গা ছেড়ে যেতেই ওর বেশী কষ্ট। অনেক দেখেছি এতখানি বয়সে, এই কাজ করেই তো খাই—পাপের বাচ্ছা যে হতে দেখি নি তা তো নয়। কন্নাও করতে হয়েছে সে সব জায়গায়। এ শহরে এ তো নতুন কিছু নয। কিন্তু এ মেয়ে আলাদা। আবারও আস্পদ্দা ভাববেন—কথাটা বলছি বলে—পাপ কার, কেন, কি ক'রে কি হ'ল তা জানি না, তবে পাপ ওর তা আমার বিশ্বাস হয না—অথচ ওকেই চারগুণ সাজা সইতে হচ্ছে, অপরের পাপে ওর জীবন যেতে বসেছে।'

শ্যামসোহাগিনী অজ্ঞাতসারেই যেন 'ষাট ষাট' বলে ওঠেন অস্ফুট কণ্ঠে। পাথরের চোখে বুঝি একটু সজলতাও দেখা দেয়।

তারপরই আবার স্বাভাবিক স্থৈর্যে ফিরে এ.স কি কি করতে হবে—বুঝিয়ে দেন রামরতিয়াকে।

পরের দিন শেষরাত্রে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে চাপিয়ে বিদায় দেওয়া হ'ল। শেষ মুহূর্তে আর শ্যামসোহাগিনী আসেন নি। প্রয়োজনই বা কি। নির্দেশ বিচ্যুতি-হীন। আর সে নির্দেশমতোই কাজ হবে তাও তিনি জানেন।

বৃদ্ধ দারোয়ান সুরয পাণ্ডে আর দাসী রামরতিয়া সঙ্গে ছিল। হাতরাসে ট্রেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত দুজন সেঠেল সঙ্গে গেল। পালকি ক'রেই মথুরা পযন্ত যাবে যমুনা, বাচ্ছাটাকে কোলে ক'রে রামরতিয়াও। সদ্য প্রসূতিকে টাঙ্গায় পাঠানো সম্ভব নয়।

মথুরায় পৌঁছে না কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তার জন্য আগেই লোক পাঠিয়ে একটা ঘরভাড়া করা হয়েছিল, সেখানেই স্নানাহারের ব্যবস্থা। ট্রেন এলে মেয়েদের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় তুলে দেওয়া হবে। সুরয সিং আর পাইক দুজন যাবে থার্ড ক্লাসে। হাত্তরাসে বড় লাইনের গাড়িতে সুরয সিং উঠবে ইণ্টার ক্লাসে—কারণ থার্ড ক্লাস বহুদূরে—ওর কাছাকাছি থাকা দরকার। নইলে হঠাৎ কোন প্রয়োজন পড়লে এরা সুরযকে জানাতে পারবে না।

পাইকরা ওখান থেকেই ফিরে আসবে, বড় ট্রেন ছাড়লে।

নির্দেশ নিখুঁত, ভ্রান্তিহীন।

বাক্স ক'রে বাপের বাড়ির দেওয়া গহনা; অন্যান্য জিনিস, কাপড় জামা ট্রাঙ্কে ক'রে দেওয়া হ'ল। তার সঙ্গে ওঁদের দেওয়া ও ব্যবহার করা শাড়ি জামাও। এঁদের দেওয়া গহনা—চুড়ি বালা গায়ে ছিল, সোনার লোহা শাঁখা—তাও রইল। খুলে নেবার কথা কেউই বললেন না।

সুরয পাণ্ডে ও রামরতিয়াকে যা বলা ছিল, সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরেই পালিত হ'ল।

একেবারে যমুনার বাপের বাড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিনাবাক্যে ত্বরিত গতিতে ফিরে গেল ওরা।

কি হয়েছে, এ কী ব্যাপার—হতভম্ব গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করারও অবসর দিল না।

এই রকমই হুকুম দেওয়া ছিল।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দু-একজন ছুটে গেল ওদের পিছু পিছু, ধরেও ফেলল। ওরা হাত জোড় করল, 'আমাদের কিছু বলার হুকুম নেই। বৌমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

উত্তরটা সুরযই দিল। রামরতিয়ার তখন কিছু বলার শক্তি নেই। বৌয়ের বাপের বাড়ির কাছাকাছি আসার সময় থেকেই তার চোখে অবিরল ধারা নেমেছে। এখন তো রীতিমতোই কাঁদছে। যেন সোনার প্রতিমা অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সে—এই রকম তার মনের অবস্থা।

বিশাখাকে প্রশ্ন করা হ'ল বৈকি। কিন্তু সে যেন নিষ্প্রাণ পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে রইল নিজের পায়ের দিকে চেয়ে।

অবশ্য প্রশ্নের খুব প্রয়োজন ছিল কি?

অসময়ে তারা বাপের বাড়ি মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে—সব জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে। সঙ্গে একটি শিশু।

এর পর আর বিশেষ কি জানবার আছে !

মা মূর্ছা গেলেন। অতঃপর শুরু হ'ল অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও অন্তহীন গঞ্জনা।

কাকা-কাকীরা—দুই মামাও এসে পড়েছিলেন সেদিন, তাঁরা কাছেই বাঘ-আঁচড়ায় থাকেন—সকলে মিলে যা মনে এল তাই বলে তিরস্কার, ধিক্কার, অনুযোগ, গালিগালাজ শুরু করলেন।

এর মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, মেয়ের আগমন ও শ্বশুরবাড়ির লোকের প্রস্থান—নিকট প্রতিবেশীদের চোখ এড়াবে তা সম্ভব নয়।

তাঁরাও কেউ কেউ ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে—বা ডালের কড়া চাপানো অবস্থাতেই ছুটে এলেন। এর মধ্যে কে বুদ্ধি ক'রে—এই ঝাঁক বেঁধে আগমনের আরম্ভ দেখেই—বাড়ির তিনটে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল তাই—নইলে শ্রুতিরোচক কেলেঙ্কারির গন্ধ পেয়ে গোটা পাড়াটাই বোধ হয় ভেঙে পড়ত।

প্রাথমিক লাঞ্ছনার প্রচণ্ডতা একটু কমলে—মানে ক্লান্তি বোধ হলে শুরু হ'ল প্রশ্নের বন্যা—'কে এ কাজ করলে বল !'

এর মধ্যে মেজকাকা প্রচণ্ড একটা চড় মেরেছিলেন—আরও হয়ত মারতেন, যদি না কেউ এসে হাত চেপে ধরত।

'বল্ হারামজাদী, বল্—কে এ কাজ করলে—তাকে আর তোকে একসঙ্গে চিতেয় তুলে দিই !···এতবড় বংশের নাম ডোবালি তুই ! সবচেয়ে—কোন্ বাড়িতে দিয়েছিলুম তোকে, তাদের কাছে আমাদের সবাইকে কোথায় কোন্ নরকে নামিয়েদিলি। তারা এতদূর থেকে এসে বিশ্বাস ক'রে আমাদের মেয়ে বলে নিয়ে গিছল—ঁয়্যা ! সেকথাটা ভাবলি না ! হয়েছিল—আগে বলতে পারো নি ? যা হবার এখানে হ'ত !'

কে একজন বলে উঠলেন, 'তবু তারা খুবই ভদ্র বলতে হবে, এমন ভাবে যত্ন ক'রে লোক সঙ্গে দিয়ে কে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেয়। অন্য লোক হ'লে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ঝাঁটা মারতে মারতে পথে বার ক'রে দিত।'

এঁদের মধ্যে কারও মনে হ'ল না, এরও কিছু বলার আছে হয়ত।

মনে হ'ল না যে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসে সে এখনও উঠোনেই দাঁড়িয়ে আছে একভাবে, পাথরের মতো। নিজের বাবা-মার কাছে এসেও চরম দুর্দিনে যদি একটু আশ্রয় না পায়—তাহলে কোথায় যাবে সে ! আর যে একমাত্র পথ খোলা আছে তার কাছে, সে পথে গেলে তাঁদের বংশের নাম আরও পাঁকে ডুববে।

মনে হ'ল না যে সদ্যোজাত শিশু একটার কথা, কেঁদে কেঁদে তার দম বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে !

পাপজ বটে—কিন্তু সে কি ঐ শিশুর দোষ ? আমরা তো নিত্য মন্ত্র পড়ার সময়

উচ্চারণ করি, 'পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।'

মনে হ'ল যমুনার দাদা বিমলেরই শেষ পর্যন্ত।

সে এসে হাত ধরে যমুনাকে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরের মধ্যে। জোর ক'রে বিছানায় বসিয়ে দিল। তাতেই বোধহয় চৈতন্য হ'ল ওর এক মামামার—তিনি এসে সেই কাঁথাজড়ানোসুদ্ধ বাচ্ছাটাকে কোলে ক'রে ঘরে এনে দুধজল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন।...

ততক্ষণে মার মূর্ছা ভেঙেছে, তিনি মেঝেয় মাথা খুঁড়ছেন!

এরপর মামা-কাকার দল যমুনার মাকে নিয়েই পড়লেন। 'তোমার দেখা উচিত ছিল! তুমি মা, তুমি নজর রাখলে কি এ কাজ হ'তে পারত!...আর, তুমি বুঝতেও পারলে না। ছিঃ ছিঃ, কতদূর পর্যন্ত আমাদের মাথা হেঁট হ'ল বল দিকি! কী অপমান হ'ল সারাগুষ্টির! আর কেউ আমাদের ঘর থেকে মেয়ে নেবে?'

মা কান্নার মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন, 'আমি কেমন ক'রে জানব! ওর মাসিকের ঠিক থাকে নি কোনদিন। বাড়িতে কেউ বাইরের লোক ছেলে-ছোকরা আসে না —সন্দেহ হবেই বা কেন? মেয়ে ইস্কুলে যেত পুনি-ঝিয়ের সঙ্গে, সে গিয়ে নিয়ে আসত। ওর দাদার বন্ধুরা এলে বাইরে বৈঠকখানায় বসে—বাইরের কেউ অন্দরে আসে না। এসব নোংরা কথা ভাববই বা কেন?'

আবার শুরু হ'ল সেই জেরা।

দাদাই এর মধ্যে একটু শরবৎ খাইয়ে দিয়েছে। এতক্ষণের মধ্যে একটা কথাও যেমন বলে নি যমুনা, তেমনি 'না'ও বলল না। নিঃশব্দেই শরবৎ খেয়ে নিল।

তার মধ্যেই শোনা গেল, কে একজন প্রতিবেশিনী পিছন থেকে বেশ শ্রুতি-গোচরভাবেই ফিসফিস ক'রে বলছে, 'মাগো, লজ্জা-ঘেন্না বলে কিছু কি থাকতে নেই! আমরা হ'লে ঐ শরবৎ খাবার আগে—'

বোধহয় বিমল ক্রুদ্ধমুখে তাকাতেই থেমে গেল সে।

তবু, আর একটু পরে, আর একজন কে আরও ফিসফিস ক'রে বলার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠল, 'যাই বলো বাবু—পষ্ট কথা আমার কাছে—ঘাঘু মেয়ে একখানি!'...

জেরা চলল বৈকি। প্রশ্নের ঝড় বইতে লাগল।

কিন্তু কোন অনুনয়ে অনুরোধে হুমকিতেই কথা বলানো গেল না যমুনাকে। এ কাজ কে করল, শিশুর জন্মদাতা কে—তা জানা গেল না। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে চড়-চাপড় দু'চার ঘা যে পড়ল না, তাও না। তবু, কথাও যেমন বলল না, চোখ দিয়ে

এক ফোঁটা জলও বেরোল না।

খুবই যে শক্ত জান, প্রতিবেশিনীরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

শেষ পর্যন্ত এই প্রায়-অন্তহীন লাঞ্ছনা বন্ধ করল বিমলই।

সে এমনি ভদ্র—এ বাড়িতে বাবা-কাকার মুখের ওপর কথা বলার চলন নেই—কিন্তু এখন আর থাকতে পারল না। বলল, 'আপনারা আর কতক্ষণ এ পর্ব চালাবেন ? মধ্যযুগের প্রোটেস্টান্টদের নির্যাতনের মতো হয়ে উঠছে যে। ও পাথর হয়ে গেছে, দেখছেন না ? থাম্বস্ক্রু চালালেও কথা কওয়াতে পারবেন না। আর কে করেছে জেনেই বা লাভ কি ? বিয়ে দিতে পারবেন ? হিন্দুর বিয়ে—মেয়েদের দুটো বিয়ে করা যায় না।…এসব ছেড়ে দিন। দুটো দিন যাক, একটু হাঁফ ছাড়তে দিন—চোখে জলও আসবে, মুখে কথাও। নিজেই বলবে। এখন কি করা হবে সেইটে ভাবুন।'

যে কখনও চড়া কথা বলে না—তার এই ভাষায় ও কণ্ঠস্বরে সকলেই যেন থতমত খেয়ে চুপ করলেন। খানিক পরে এক কাকা মুখ গোঁজ ক'রে বললেন, 'এ বাড়িতে থাকতে দেওয়া যাবে না, অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

বড় মামা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'আচ্ছা সুস্থ হয়ে ধীর মাথায় ভাবলেই হবে। এখুনি সে কথা ঠিক করা যায় না। চলো আমরা অন্য ঘরে যাই।'

বিমলের এই মূর্তিতে প্রতিবেশিনীদেরও অসমাপ্ত রান্নার কথা মনে পড়ল। ঘরবাড়ির দরজা খুলে রেখে সবাই এখানে এসেছে কিনা সে চিন্তাও।

তাঁরা এবার গৃহাভিমুখী হতে শুরু করলেন।

মামা সবাইকে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে বসেছেন। একজন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—যমুনার বাবা কেশববাবু বাগানের এক আম গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন।

এবার সকলেরই মনে পড়ল, তিনি একবারও সামনে আসেন নি। একটি কথাও বলেন নি। কেউ দেখেও নি তাঁকে।

সাধারণত এসময় তিনি চাষ তদারক করতে যান বলে তাঁর অনুপস্থিতির কথা অত কারও মনেও পড়ে নি।

হয়ত কখন নিঃশব্দে এসেছিলেন, পিছন দিকে। তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেছেন।

সবাই ছুটল সেই দিকে। মা আবারও মূর্ছা গেলেন।

যমুনা কিন্তু সেই ভাবেই বসে রইল, তেমনি স্থির হয়ে। এখনও চোখে জল এল না তার।

৫

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহ এ বাড়িতেই রাখতে হ'ল যমুনাকে। পাপ সেই দিনই বিদায় করা গেল না।

কেশববাবুর আত্মহত্যার হাঙ্গামা মেটাতেই চার-পাঁচ দিন লাগল। শ্রাদ্ধশান্তির ল্যাঠা নেই, আত্মহত্যার পর এক বছর না গেলে ঔর্ধ্বদৈহিক কাজ কিছু করা যায় না। কিন্তু আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়—একান্নবর্তী সংসারের কর্তা, বিশেষ যদি সে সংসার প্রধানত এজমালি সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়—হঠাৎ মারা গেলে। পুলিসের ব্যাপার তো আছেই, তবে সেটা মেটানো তত কঠিন হয় নি, এতদিনের সম্ভ্রান্ত পরিবার, কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি তো থাকবেই। বাকী সমস্যাই প্রধান।

একটা যন্ত্র চলতে চলতে যদি তার প্রধান 'নাট'টা শিথিল হয়ে খসে পড়ে অতর্কিতে—তখন বিভ্রাটের শেষ থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

তবু, সেজকাকা খুব বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ এবং করিৎকর্মা, তিনি এর ভেতরেই দুদিন গিয়ে নবদ্বীপ ঘুরে এসেছেন। ব্যবস্থাও একটা হয়ে গেছে। এ ধরনের পাপের বোঝা নামাতে হ'লে—বিশেষ বাঙালীর পক্ষে—নবদ্বীপ কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় কি ? ব্রহ্ম এসব স্থানে প্রত্যক্ষ, আর স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া তাঁর পাপী সন্তানদের কে আশ্রয় দেবে ?

সেজকাকা জানেন এক্ষেত্রে বিলম্ব করা মানেই কেলেঙ্কারির সংবাদ দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া। তাছাড়া মেয়েটার লাঞ্ছনা তো চলছেই। বাপের ওই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী মেয়ের দুষ্কৃতিই—এ তো জলের মতো পরিষ্কার। মা পর্যন্ত একদিন এলোপাতাড়ি কিল চড় লাথি মারলেন। তবে সে লাঞ্ছনা আর বেশী দূর এগোল না এই জন্যে যে পাথরে মাথা কুটলে নিজেরই মাথা ভাঙে, পাথরের কিছু হয় না। নিজেদেরই ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হ'ল।

একমাত্র বিমলই কোনদিন কিছু বলে নি—কে জানে সে কি ভেবেছে। হয়ত জীবন সম্বন্ধে তারও কিছু বাস্তবজ্ঞান জন্মেছে, অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তার জন্যেই যমুনা আর শিশুটার জীবনধারণ সম্ভব হয়েছে।

সেজকাকা যে ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন, তা অনুমোদন করলেন সবাই। অথবা করতে বাধ্য হলেন। আর কীই বা করা যেতে পারত। সকলেই তখন অনেকগুলি ও অনেক প্রকার রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়ে ব্যস্ত, চিন্তিত, উদ্‌ভ্রান্ত।

আশ্রয়টা পাওয়া গেছে নবদ্বীপেই। অবশ্য শহরের একেবারে উপান্তে।

শহর কি তখন বলা যেত? নবদ্বীপ তখন প্রায় হৃত-গৌরব, বড়গোছের পাড়াগাঁ একটা—অর্থাৎ যাকে গণ্ডগ্রাম বলা উচিত।*

তারও এক প্রান্তে একটি জীর্ণ দেবমন্দির, এ দেশের ভাষায় ঠাকুরবাড়ি, কেউ কেউ বৃন্দাবনের অনুকরণে বলেন কুঞ্জ। কোন সুদূর অতীতে বিত্তশালী প্রতিষ্ঠাতার সাধ হয়েছিল তীর্থস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গৌর নিতাইয়ের পূজা হবে প্রত্যহ। তাঁর বোধ হয় স্বপ্ন কল্পনা ছিল যে দেবসেবা হবে সমারোহ সহকারেই—এবং প্রত্যহ কিছু অতিথি ভিক্ষুক প্রসাদ পাবে। অতিথিদের কথা ভেবেই সম্ভবত অনেকগুলি ঘরও বানানো হয়েছিল, প্রায় খান কুড়ি ঘর। নিশ্চয় সেই মতো সম্পত্তিও দেবত্র ক'রে রেখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তরপুরুষরা সে ভ্রম সংশোধন বা 'ভীমরতি'র প্রতিকার করবে—এইটেই স্বাভাবিক। আইনের সঙ্গেও লড়তে হয় না এসব ক্ষেত্রে, বিশেষ দলিলপত্র বাড়িতেই থাকে, তা অন্তর্হিত হতে বা নষ্ট হতে কতক্ষণ? কেই বা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে! কোন নিকট-আত্মীয় তার হিস্যায় বঞ্চিত হলে সে ঝগড়াঝাঁটি লাঠালাঠি করতে পারে—আইনের আশ্রয় নিতে সাহস করে না। কারণ তাহলেও তার হাতে কিছু আসবে না, হয়ত সরকারী কর্মচারীদের গর্ভেই চলে যাবে।

ফলে মন্দির বা সংলগ্ন অতিথিশালা মেরামত তো দূরের কথা, নিত্য দুটো ফুল ফেলারও অর্থ জোটে না। তথাকথিত সেবাইতরা ঠাকুর-সেবা বাবদ মাসে দশ টাকা ক'রে পাঠান। পালে পার্বণে খুব কাকুতি মিনতি ক'রে চিঠি লিখলে, ঠাকুরের বস্ত্র শতছিন্ন এমনি কোন অজুহাত দিলে হয়ত কখনও কখনও আরও পাঁচ দশ টাকা দেন। গত ত্রিশ বছরে নাকি সে বাড়ির কেউ কলকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এ মন্দিরের অবস্থা দেখতে আসে নি।

পূজারী হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তীরও হতদরিদ্র অবস্থা। একদা ভিক্ষে করতে করতেই বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে এখানে এসেছিল। তার কাছে এই আশ্রয়টুকুই সব থেকে প্রয়োজন তখন, লোভনীয়ও। তার বিদ্যাবুদ্ধি কি সে প্রশ্ন সেবাইতরা করেন

---

* অনেক শিক্ষিত লেখক ও অধ্যাপক বিপরীত অর্থে গণ্ডগ্রাম শব্দ ব্যবহার করেন। আধাশহর জনপদকেই গণ্ডগ্রাম বলে।

নি—একটা 'পূজুরী বামুন' পেলেই হ'ল। বেশী বিদ্যা থাকলে কেউ ঐ টাকায় থাকে না, তা যত সস্তাগণ্ডাই হোক না কেন। হরেকৃষ্ণরও ঐ টাকায় চলবার কথা নয়। সে এই সঙ্গে এমনি আরও এক প্রায়-পরিত্যক্ত বিগ্রহ সেবার ভার নিলে—সেই সঙ্গে এক স্থানীয় উকিলবাবুর বাড়ি রান্নার কাজ। ছেলে-মেয়ে আছে, আরও হবে —বাড়তি আয় না হলে চলবে কেন? স্ত্রী মোহিনী গোরু ছাগলের ব্যবসা করে, তাতে বেশী আয় তার স্বামীর চেয়ে। ছাগল বড় হয় প্রায় নিজে নিজেই, লোকের বাড়ির ফ্যান, ফেলে দেওয়া আনাজের খোসা খেয়ে—অথচ আয় অনেক, দুধও বিক্রী হয় মাদীগুলোর, মদ্দগুলো বড় হলে বিক্রী হয়। তাতে ভালো টাকা ঘরে ওঠে।

হরেকৃষ্ণ সাগ্রহেই ঘর ছেড়ে দিল। ঠিক হ'ল এরা যেমন খায়—যমুনাও তাই খাবে। মাসে সাত টাকা ক'রে পাঠাবেন কাকারা। বাচ্চাটার দুধের জন্যে আর দু-এক টাকা বাড়াবার কথা বলেছিল হরেকৃষ্ণ, সেজকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন, নবদ্বীপে এক একটা 'পারস' মাসিক আড়াই টাকা তিন টাকায় বিক্রী হয়। ঢের বেশী দিচ্ছেন তাঁরা। তিনি শুধু কটা জামা কিনে দিয়ে গেলেন বাচ্চাটার জন্যে, যমুনার আপাতত জামা বা সেমিজ বা কাপড়ের দরকার নেই, যখন বুঝবেন—পাঠাবেন তাঁরা।

বড়মামাও সঙ্গে এসেছিলেন, সেজকাকাকে আড়ালে বললেন, 'বেশী দিন এ খরচও টানতে হবে না। এত দুর্দশাতেও এক ফোঁটা জল এল না চোখে, বাবার প্রাণ ছিল এই মেয়ে—তার মৃত্যুতেও কাঁদল না। ও তো পাগল হয়ে যাবে। পাগল হয়ে পথে বেরিয়ে যাবে কিংবা কেউ হয়ত ধরে টেনে নে গিয়ে খান্‌কী-বাড়ি তুলে দেবে। এই ওর পরিণাম– বেশ দেখতে পাচ্ছি।'

ভাঙা বালি-ঝরা ঘর, দরজা জানলা অর্ধেকের ওপর ভাঙা। তবু মোহিনী নিজেদের পাশের ঘরটাই দিয়েছিল, কিছু আবরু তখনও আছে সে ঘরের—দরজাটা অন্তত ভালই আছে। ভাল কাঁঠাল কাঠের দরজা। অন্য ঘর থেকে টেনেটুনে একটা চৌকীও এনে দিয়েছে। তবে শয্যা বলতে ওদেরই কিছু নেই। সেজকাকা একটা পুরনো তোশক আর একখানা চাদর এনেছিলেন সঙ্গে, সেই সঙ্গে ছেলেটার একটা কাঁথাও। সামনেই শীত, তখন কি হবে তা নিয়ে অত মাথা ঘামান নি। মোহিনীই পাড়া থেকে মেগে-পেতে দুখানা কাঁথা সংগ্রহ ক'রে এনেছে ওদের জন্যে, ক্ষারে কেচেও দিয়েছে।

এই ভাবেই দিন কাটে।

মোহিনীরও ভয় করে যমুনার রকমসকম দেখে।

পাগল নয় তো? না হ'লেও পাগল হয়ে যাবে হয়ত শীগগিরই। চান করছে

বললে চান করে, খেতে দিলে খায়। খুব প্রয়োজন হ'লে দু-একটা কথা যে বলে না তা নয়, তাতে কোন এলোমেলো ভাবও নেই, এই যা ভরসা। কিন্তু অবাক হয়ে যায় মোহিনী ছেলেটার প্রতি ওর আচরণ দেখে—নিজের সন্তান সম্বন্ধে এমন উদাসীনতা, এমন নিস্পৃহতা কারও দেখে নি সে। সতীনপো হ'লেও এতটা অবহেলা করে না কেউ। ছেলে যেন বিষ ওর কাছে। পাপজ সন্তান যে না দেখেছে তা তো নয়—তার জন্যে ছেলেটার কি দোষ, এমন ভাবে তাকে ঘেন্না করবে কেন ?

'সে পাপ তো তুই-ই করেছিস, ছেলেটা তো যেচে সেধে আসে নি। ছেলেটার দোষ কি। এমন রাক্কুসী মা কোথাও দেখি নি বাবা।'

মোহিনী গজগজ করে আপন মনেই।

ওর বড ছেলেটা—রাখহরি, বছর ন'দশের ছেলে—সে মাঝে মাঝে নিজে থেকেই কোলে ক'রে নিয়ে বেড়ায়—বেশী কান্নাকাটি করলে। আর মোহিনী আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে একটু একটু দুধ খাওয়ায় ছাগলের।

হরেকেষ্ট একটু লোলুপ হয়ে উঠবে বৈকি।

শ্যামবর্ণ, রোগা হাড বার করা চেহারা মোহিনীর, তিন সন্তানের মা, আরও একটি গর্ভে তখন—তাতে কাজ চলতে পারে, পিপাসা মেটে না।

পরিপূর্ণ সরোবর সামনেই, হাতের কাছে। রূপসী নবযুবতী—লালসা সম্বরণ তো কঠিন বটেই। আগে উশখুশ, পরে চুলবুল করতে লাগল হরেকেষ্ট। অকারণ মিষ্ট কথা, সহানুভূতি জ্ঞাপন ও আশ্বাসদান, সোহাগে-গলে-যাওয়া কণ্ঠ—যা ওর স্বরে বা ভাষায় আদৌ মানায় না। শেষে একদিন আলো-আঁধারে হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

প্রস্তুতি পর্বটাই হ'ল ওর পক্ষে নির্বুদ্ধিতা। মোহিনীর চোখে না হোক কানে এই অস্বাভাবিক আত্মীয়তার চেষ্টাটা পৌঁচেছে। সে চোখে চোখে রেখেছিল স্বামীকে। সে চেঁচামেচি করল না, ঝগড়াঝাঁটি করল না—রাখহরি কোথা থেকে একটা বাব্‌লার ডাল ভেঙে এনেছিল বেড়াল তাড়াবে বলে—সেটাই এনে এলোপাতাড়ি পিটতে শুরু করল।

'তবে রে মিনসে! রস আর ধরে না দেখছি! এই যা পেয়েছিস—তোর চোদ্দ গুষ্টির ভাগ্যি। রূপী বাঁদর হয়ে চাস সাক্ষেৎ সীতের দিকে হাত বাড়াতে!...বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি। আমি অন্য লোক ডেকে এনে পুজো সারব।'

কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হরেকেষ্ট চেঁচাতে চেঁচাতে কোনমতে বৌকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে সোজা গিয়ে উঠল ওর পরিচিত গাঁজার আড্ডায়।

'মরুক মরুক মাগী। কত সংসার চালাতে পারে চালাক। আমার কি—একটা পেট চলেই যাবে। শাঁকে ফুঁ না হোক উনুনে ফুঁ—বামুনের ছেলের আবার ভাতের অভাব। অন্যত্তরে গিয়ে আর একটা বে ক'রে নতুন সংসার পাতব। তুই পারবি আর একটা বামুন জোটাতে, চারটে ছেলেমেয়েসুদ্ধ ঐ ব্রেষকাঠ মেয়েমানুষ কেউ ঘাড়াবে।'

গজগজ করতে থাকে হরেকেষ্ট গাঁজার কল্‌কে হাতে ক'রে।

তবে গজগজ যতই করুক, ওর থেকে মোহিনীর যে রোজগার বেশী, তার ওপর পাকা গৃহিণী—হাতের রান্না ভাল—এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই গভীর রাত্রে ফিরেই আসতে হ'ল এবং বৌয়ের পায়ে-হাতে ধরে, 'আর কখনও এমন কাজ করব না' দিব্যি গেলে মিটিয়ে নিতেও হ'ল।

ওদিকে হাত বাড়ানো চলবে না, মোহিনীর সাফ নজর, বুঝে অন্য পথ ধরল হরেকেষ্ট।

দু পয়সা রোজগারের চেষ্টা করতে দোষ কি? এমন সুযোগ যখন সামনে।

আড়ালে পেলে—দূরত্ব বজায় রেখেই অবশ্য, বাবলার জ্বালা এখনও ভোলে নি—অন্যদিকে মুখ ক'রে (মোহিনীর দৃষ্টি কতদূর থেকে এসে পড়বে কে জানে) বোঝায়, 'এই তো তোমার বয়েস, এমন ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে কেন? জগৎ বাগচী মস্ত ধনী লোক, এ শহরে এক ডাকে তাকে সবাই চিনবে, দু-চারটে মাঝারি জমিদারকে সে চাকর রাখতে পারে। সে তোমাকে দেখেছে দূর থেকে। তোমাকে বে করতে চায়। অমন অনেক বে-ই হয়—কে জানছে। তোমাকে লুকিয়ে পৈরাগে নিয়ে যাবে আগে, কাশীতে ওর মেলা চেনা লোক—তাছাড়া পৈরাগে ধরো গে নিজেরই পেল্লায় বাগানবাড়ি, সেখেনে বৌ বলেই তুলবে, এখেনে রটিয়ে দেবে ওখানকার মেয়ে বে করেছে, সেই পরিচয়ে এ বাড়িতে এনে তুলবে। বড় বৌয়ের ছেলে হয় নি। দুটো না তিনটে মেয়ে—তাই ওর দুঃখু, তোমার যে কালে একটা ছেলে হয়েছে, তোমার হবে। বলেছে জড়োয়ায় সোনায় মুড়ে দেবে। বিশ্বেস না করো এক লাখ টাকা কোম্পানীর কাগজ ক'রে দেবে আগেই। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। যে-সে লোক নয় জগু বাগচি। চেহারাও সোন্দর, টক-টক করছে রঙ, ইয়া দশাসই লাশ। দেখলে মেয়েদের জিভ দিয়ে জল পড়ে।' ইত্যাদি—

এই-ই মোট বক্তব্য। একসঙ্গে একদিনে বলে না, সে অবসর নেই।

থেকে থেকে বলে, ক্ষেপে ক্ষেপে। নানা ভাবে নানা দিনে বলে, একটু একটু ক'রে। সে একেবারে বোকা নয়। ভাবে, হোক না পাথর, পাথরেও তো ঘষতে ঘষতে

গর্ত হয়। বহু লোক আনাগোনা করায় কত দেবমন্দিরে ওঠার সিঁড়ি ছ্যাখো গে গিয়ে বাঁকাচোরা খাঁজকাটা হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে একদিন এ পাথরও কি আর গলবে না?

অবশেষে একদিন মোহিনীর অসাক্ষাতে একটা পাথর-বসানো ভাল নেকলেস নিয়ে আসে কোঁচায় খুঁটের আড়ালে।

আসলে হয়ত জগৎ বাগচীকে ও-ই লোভও দেখিয়েছে। আড়াল থেকে—মন্দিরে ঠাকুর দেখার নাম ক'রে হয়ত দেখেও গেছে। যতই প'ড়ো পুরোনো মন্দির হোক, শহরের প্রায় বাইরেই হোক—কখনও কোনদিন কোন দর্শনার্থী আসবে না—তা হয় না। কেউ কেউ কালেভদ্রে আসে বৈকি—ধুলোটে, রাসে, ঝুলনে—ভাল ভাল কাপড় জামা পরা বিশিষ্ট ব্যক্তিও আসেন। তবে পোশাকের আড়ালে মানুষটা কেমন দেখতে তা নিয়ে পূজারীরা মাথা ঘামায় না, দু পয়সা এক আনা প্রণামী পড়বে এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পাথর এবার নড়েচড়ে উঠল ঠিকই। তবে হরেকৃষ্ণর'কল্পনা মতো নয়—অন্য ভাবে। কথাও বলল। সামনে হারটা মেলে ধরতে—যমুনা ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে এক রকম দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দেখুন, যদি আপনি এই রকম রোজ রোজ জ্বালাতন করেন, তাহ'লে আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। আপনি তাতে খুশী হবেন তো? মনস্কামনা সিদ্ধ হবে?'

পায়ে পায়ে পিছিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি হারটা কুড়িয়ে নেয় হরেকৃষ্ণ। খুব সম্ভব ঝুটো পাথর, ওর হাতে দামী নেকলেস তুলে দেবে এত বোকা কেউ নয়—তবে মোহিনী অত বুঝবে না। এবার হয়ত আঁশবঁটিটা এনে কোপই বসাবে।

তবে শুধু হরেকেষ্টই তো নয়, পাড়ায় আরও মানুষ আছে। তারাও উশখুশ করে। শুধু যে টাকা দেখেই মেয়েরা ভোলে তা নয়—কখনও কখনও অকারণেই ভোলে। কুৎসিত বা নিঃস্ব, বা বদ—পশু স্বভাবের পুরুষেও ভোলে। সুতরাং আশা ছাড়বে কেন? এরা সকলেই হয়ত আশা করে একদিন মন ভুলবে, প্রাণ গলবে।

শিস দেওয়া বাড়ির সামনে এসে, আশপাশ থেকে গান গেয়ে ওঠা এর বেশী জানে না, সময় অসময়ে জানলার সামনে ঘোরাঘুরি করে। দর্শন করতে আসে নিত্য, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েও থাকে হাত জোড় ক'রে।

আগলে আগলে রাখে মোহিনীই। গায়ে পড়েই ছুতোয়নাতায় প্রতিবেশিনীদের বাড়ি যায়, তাদের কাছে যমুনার প্রসঙ্গ তোলে।

'দেখো না, এ তো আমার নিজের খুড়তুতো বোন, ভাল ছেলে দেখে আমার কাকা সাধ্যির অতীত্ খরচা ক'রে বে দিছল, ভাবলে সোন্দর মেয়ে বলেই এত কমে নে যাচ্ছে ওরা। তা কপাল। আমাদের বংশে কি আর ভাল পাত্তর নিয়ে ঘর করা লিকেছে বিধাতা। এই রকম হাডজ্বালানে হতচ্ছাড়া হলে ঠিক থাকত। প্রেথম প্রেথম তিন চার মাস বেশ কাটল, বর নিয়েছিল—তার পরই অন্য মূর্তি। আসলে ছেলে র‍ঁাডবাজ, বৌ সোন্দর পেলে তাকে ভুলবে ভেবেই, শ্বশুর শাশুড়িও এত আগ্-গেরো ক'রে নে গিছল। তা ধরো গে বাজারের মেয়েছেলে, খানকী, তাদের ছলা-কলায় যারা ভুলেছে তাদের কি আর রুচি ভালমানুষ মেয়েতে মন ওঠে। পেটে একটা আসতেই ছেলে ঘরে আসা বন্ধ করলে। শ্বশুর শাশুড়ির মনে হ'ল বৌ তাদের ঠকিয়েছে, সোন্দর মেয়ে বরকে ঘরবাসী করতে পারে না। আসলে ওরও ইচ্ছে নেই। এই সব নানা বেত্তান্ত। নিয্যাতনের সীমে পরিসীমে নেই—শেষে মারধোর শুরু করতেই মেয়েটা পালিয়ে এল। একটা ছেলে নে কোথায় যায় বলো। ··বাত্তারা রটে গেল ঘর ছেড়ে এসেছে, তাই কাকাও আর ভরসা পেলে না ঘরে রাখতে, এখেনে পাঠিয়ে দিলে। রূপেও কিছু হয় না, পয়সাতেও না। আসলে মেয়েদের কপাল সব্বস্ব, কী বলো ভাই?'

আবার কখনও ঝ্যাঁটা হাতে করে বাইরে এসে শূন্যে আস্ফালন করে, আর যেন বাতাসে কথাটা ছাড়ে, 'আ মরণ। মরণদশা ছোঁড়াগুলোর। শোকা তাপা বোনটা নিজের জ্বালায় জ্বলছে, তার ওপর টাঁক সব। কুকুরের মতো এত্তখানি জিব বার ক'রে হাঁই হাঁই ক'রে ঘুরছে। ঐ জিব এক এক করে টেনে ছিঁড়ব। আয় না, এগিয়ে আয়, এই খ্যাংরার চোটে কত ভূত ছাড়িয়েছি, তোরা তো মানুষ।'

তাতেই কতকটা ভয়ে ভয়ে থাকে। ভেতর থেকে অভিভাবকদের গঞ্জনা, এ'দিক থেকে রণরঙ্গিনীর ভয়।

তা ছাড়া ভদ্রলোকের বাসও তো কিছু কিছু আছে। তাঁরা দরিদ্র হয়ত কিন্তু অমানুষ নন।

এক পাশেই তো পড়ে আছে এরা, খেটে খায়, কী দরকার এদের উত্ত্যক্ত করার। তাঁরাও হাঁকডাক ক'রে শাসিয়ে দেন ছেলেছোকরাদের।

এমনি ভাবেই দিন কাটে।

একটি দিনের সঙ্গে আর একটি দিন যুক্ত হয়।

বছরও ঘুরে আসে।

তবে সে হিসেব বোধ হয় মাথায় ঢোকে না যমুনার। হিসেব রাখেও না।

দিন মাস বৎসর সব একাকার হয়ে গেছে ওর কাছে।

৬
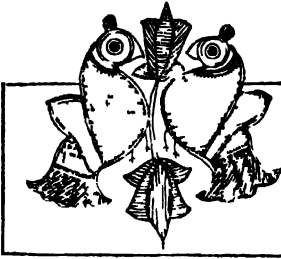
শ্যামসোহাগিনীর কর্তৃত্ব, তাঁর আদেশ এ সংসারে অমোঘ, অলঙ্ঘ্য বলেই জানত সবাই, কিন্তু তাঁকেও হার মানতে হ'ল তাঁর নিজের ছেলে, গর্ভের শ্রেষ্ঠ সন্তান—রূপে গুণে বিদ্যায় বিনয়ে গর্ব করার মতো ছেলে—তার কাছেই।

তিনি নির্বোধ নন, ছেলেকে অনেকটাই চিনতেন, তাড়া করা উচিত নয়। তা ছাড়াও, এখনই নূতন বধূ আনার চেষ্টা অশোভন। এমনিই তো শহরে আলোচনার শেষ নেই—তা নিজে কানে না শুনেও বুঝতে পারেন শ্যামসোহাগিনী, তাই মাস ছয়েক একেবারেই চুপ ক'রে ছিলেন, ও প্রসঙ্গই তোলেন নি। কদর্য ঘটনার আলোড়ন থিতিয়ে যাওয়া দরকার—ঘরে ও বাইরে সকলকার মনেই।

এবার কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একটু নাড়াচাড়া শুরু করতেই বুঝলেন, চিনলেও —ছেলেকে এখনও পুরোটা চেনা হয় নি তাঁর। তাঁরও।

পাত্রীর খোঁজটা আগে। এবার অত দূরে নয়—কাছাকাছির মধ্যে চাই। বৃন্দাবন মথুরা না হোক—এমন কোথাও থেকে আনতে হবে যাকে গিয়ে তিনি নিজে চাক্ষুষ দেখে ঘরে আনতে পারবেন, লোক লাগিয়ে যার খোঁজ-খবর করতে পারবেন। শুধু রূপ আর বংশ দেখে ভুলবেন না। ভাল কলমের গাছের ফলেও কোন-কোনটায় পোকা লাগে।

চোখে চোখে কৌতুক, ইশারায় ইশারায়। ঠোঁটের কোণে কোণে চাপা হাসি, কামদার মশাইকে* ঘরে ডাকিয়ে এনে মায়ের আলোচনা—স্বরূপ গোসাঁইয়ের চোখে না পড়ার কথা নয়। দু'চারদিন দেখেই ব্যাপারটা আঁচ ক'রে নিলেন।

প্রাণস্বরূপ আর অপেক্ষা করলেন না। এখন উদাসীন থাকলে কথা হয়ত অনেক দূর এগিয়ে যাবে, তখন বিবাহ বন্ধ করতে গেলে অপ্রীতি অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হওয়াও বিচিত্র নয়। মা অপমানিত বোধ করবেন, জটিলতার অন্ত থাকবে না।

নিজের বিবাহ প্রসঙ্গ গুরুজনদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা করা তখন অসভ্যতা,

* মন্দিরের ম্যানেজার বা কর্মকর্তা।

নির্লজ্জতা বলে গণ্য হ'ত। কিন্তু প্রাণস্বরূপ দুই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে থেকে যেটায় ভবিষ্যৎ সমস্যা কম, সেটাই বেছে নিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'বিটুউইন টু্য ইভিল্‌স্'।

একদিন অপরাহ্ণে মায়ের বিশ্রামের অবকাশে তাঁর ঘরে গিয়ে বিনা ভনিতায় বললেন, 'মা, তুমি কি আমার আবার বিয়ের ব্যবস্থা করছ?'

[এ বাড়িতে মাকে আপনি বলাই রীতি ছিল এত কাল, এখনও কোন কোন বনেদী বাঙালী বাড়িতে সে প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নি, বিশেষত ঠাকুরদের বা তাঁদের আত্মীয় সমাজের মধ্যে। কিন্তু শিশুকাল থেকেই প্রাণস্বরূপ 'তুমি' বলে আসছেন, শ্যামসোহাগিনী সে বে সহবৎ সংশোধনের চেষ্টা করেন নি ইচ্ছে ক'রেই। বলেছেন, 'মাকে আপনি-আজ্ঞে করলে বড্ড পর-পর লাগে না? ও যা চালু হয়ে গেছে তাই থাক।']

শ্যামসোহাগিনা বোধ হয় এটাই আশঙ্কা করছিলেন, তিনি নিজে সরে গিয়ে বিছানাটা দেখিয়ে বললেন, 'বোস্।' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা করতে হবে না? সংসারধর্ম পালনও তো আমাদের সেবার একটা অঙ্গ।··· একটা দুর্ঘটনা—দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলব—ঘটে গেছে বলেই এ পর্বে ছেদ টানতে হবে তার কোন মানে নেই, এমন তো কত ঘটনাই ঘটে জীবনে, তাকে ঠেলে সরিয়ে আবার সহজ স্বাভাবিক হওয়াই তো মানুষের কাজ বাবা।'

প্রাণস্বরূপ বিছানাতে বসলেন, কিন্তু ঠিক মুখোমুখি মায়ের সঙ্গে এসব কথা বলতে এখনও সাহস হ'ল না। তিনি সামনে টাঙানো বাবার বড় ছবিটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'দুর্ঘটনা ঘটে—তবে এমন ব্যাপার তোমার স্মরণকালের মধ্যে, তোমার অভিজ্ঞতায় কখনও ঘটেছে বলে শুনেছ? সাধারণ গৃহস্থ-বাড়িতে নাকি এমন হয়েছে এক-আধ জায়গায়, এ কাশীতে থাকতে আমি শুনেছি। তবে তা নিয়ে কেউ এত বড় দেবগৃহে বিয়ে ক'রে আসে না। যাদের এমন হয়, তারা গোপনে কাজ সেরে আসে। বিয়ের পর লোকমুখে এমন সংবাদ শ্বশুরবাড়ি পৌছলে হয়ত সেখানে অশান্তি হয়। আমার মতো এমন অবস্থা কখনও হতে দেখেছ কি কারও?'

মা আরও নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'সব ঘটনারই একটা আরম্ভ থাকে। কখনও শুনি নি বলে চুপ ক'রে থাকলে চলবে কেন? অশান্তি অপমানের কারণ যত বড়ই হোক, প্রতিকারের চেষ্টা করতে হবে বৈকি। সেইটেই তো বড় বংশের, শিক্ষিত লোকের কাজ। হার মানব কেন?'

স্বরূপ বোধ হয় এই ধরনের যুক্তি অনুমান করেই এসেছেন। তিনি তেমনি শান্ত ভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'না মা, আমাকে ক্ষমা করো—আমার বহু

অপরাধ তো ক্ষমা করেছ, এটাও করো। আমি আবার বর বেশে সঙ সেজে বিয়ে করতে যেতে পারব না।'

শ্যামসোহাগিনী উত্তর দিলেন, 'এইটেই যদি তোমার আপত্তির প্রধান কারণ হয়, তাহলে আমি বাড়িতে পাত্রী আনিয়ে বিনা আড়ম্বরে বিয়ে দেব। তাহলেই তো হবে ?'

'না, তা হ'লেও হবে না।'—এত স্পষ্ট ক'রে, যেন যুক্তিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে তিনি যে মায়ের সঙ্গে কথা কইতে পারবেন, তা বোধ হয় কিছুক্ষন আগেও মনে হয় নি তাঁর।—'আমার মনে হয়েছে, দৃঢ় বিশ্বাস, গোপীবল্লভের ইচ্ছা নয় যে আমি বিয়ে ক'রে ঘরসংসার পাতি। নইলে কার এমন হয় বলো—এমন সাংঘাতিক আঘাত এমন অপমান কেন সইতে হবে আমাকে ? তিনি কঠিন আঘাতেই সচেতন ক'রে দিয়েছেন। আর না। আমাকে নিজের কাছেই বোধ হয় টেনে নিতে চান। আমি সেই পথেই এগিয়ে যাবো।'

অনেক, অনেকক্ষণ পরে, প্রায় অসহায় ভাবে প্রশ্ন করেন মা, 'তাহ'লে ? এ সব কি হবে ? ঠাকুরের রাজপাট, গুরুবংশের দায়িত্ব ? ছোট তো এ পথে আসতেই চায় না।'

'সে আমি তাকে বুঝিয়ে, তার হাতে পায়ে ধরতে হ'লেও তাকে রাজী করাব। আমি শিক্ষা দেব যতটা পারি। আর ধরো, হঠাৎ আমি মরে গেলে কি হ'ত—ওকেই দায়িত্ব নিতে হ'ত তো ? তুমি ওরই বিয়ের ব্যবস্থা করো। ও-ই যাতে মূল সেবাইত হ'তে পারে, সে দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারে, সে শিক্ষা আমি কেন—তুমিও দিতে পারবে। তুমিই তো দিয়েছ আমাকে !'

প্রাণস্বরূপ চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও একটু ইতস্তত করেন, তার পর মাথা হেঁট ক'রে বলেন, 'মা, জীবনে তোমার কাছে কোন কথা গোপন করি নি কখনও, করার দরকারও হয় নি। আজ একটা কথা যা আমার মনে হয়েছে তোমাকে বলে যেতে চাই—আমাকে বেহায়া ভেবো না। বড় যন্ত্রণা মা—এই দ্বিধা আর সন্দেহ। আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না—সে, সে এর জন্যে দায়ী। আমি মিথ্যে বলছি না, অনেক ভেবেছি, আমার প্রাণের দেবতা বলছেন, সে নির্দোষ, নির্মল।'

মা অনেক, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর প্রায় চুপিচুপি বললেন, 'ওরে, আমারও যে তা মনে হয় না তা নয়। শুদ্ধ আত্মা যাকে বলে, ওর মুখের দিকে চেয়ে তাই মনে হয়েছে আমার।...তবে ও জানত, অন্তত ভয়ে ছিল—সেইজন্যে অমন কাঠ হয়ে থাকত। বিগ্রহ স্পর্শ করতে ভয় পেত। আমি সবই লক্ষ্য করেছি

বাবা, হয়ত দোষ ওর নয়। কেউ জোর ক'রে এ কাজ করেছে। হয়ত এমন কেউ, যার কথা বলতে পারে নি—মা বাবা কারও কাছেই। কিন্তু আমাদেরও তো হাত পা বাঁধা বাবা, এ বৌকে তো ফিরিয়ে নেবার কোন পথ নেই!'

কথাটা নির্মম সত্য।

কিছুক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রাণস্বরূপ।

এ কথার কোন উত্তর নেই, কিছুই বলা গেল না তাই।

শ্যামসোহাগিনী তার পরও তেমনি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

রামরতিয়া—ওঁদের পুরনো আঁতুড়ের ঝি—তার একটা কথা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি।

সে দূরে ঘরের বাইরে থেকে হাত জোড় ক'রে দুই কান ধরে বলেছিল—কাছাকাছি কেউ ছিল না তখন—'বউমা, ছোট মুখে বড় কথা বলছি, আস্পর্দা নিও না, আগেই কান মলেছি মা সে জন্যে—এমন বাচ্ছা আরও অনেক জন্মাতে দেখেছি, এখানে তো এ কম্ম নতুন নয়। এই করতেই আসে অনেকে—কিন্তু সে সব মা দেখলেই বোঝা যায়, শুধু শরীরে নয় তারা মনেও নষ্ট। কিন্তু আমাদের বহুদিদি—একেবারে আলাদা। এটা কি ক'রে হ'ল তা জানি না। তবে এ নষ্ট মেয়ে নয়।'

তাকেও স্থির কণ্ঠে এই প্রশ্নই করেছিলেন শ্যামসোহাগিনী, 'তা কি করব বল্, কি করতে বলিস তুই। ওই মেয়েকে এই সংসারে ফিরিয়ে নেব?'

তার পর বলেছিলেন, একটু যেন তিক্ত কণ্ঠেই—সে তিক্ততা কার ওপর, নিজের না রামরতিয়ার, না ভাগ্যের, তা আজও বোঝেন না—'মিছিমিছি এসব কথা বলতে এসেছিস কেন? কারণ কি, কে এ কাজ করলে, তা তো সে বলে নি। আর বললেই বা কি, যত ভাল মেয়েই হোক, যদি হঠাৎ কেউ জোর ক'রেও এ কাজ ক'রে থাকে—ওকে কি চান করিয়ে ঘরে তুলতে পারি? কেউ পারে—জেনে শুনে? সবটা কি আমার মর্জির ওপর নির্ভর করে?'

রামরতিয়া আবারও কান মলে, বাইরে থেকেই দণ্ডবৎ ক'রে, সেইখানকার রজ মাথায় জিভে ঠেকিয়ে চলে গিছল। আঁতুড়ের ঝি—ঘরের মধ্যে ঢোকা নিষেধ তার, সে মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে দর্শন করতে পারে কিন্তু সেবাইতের অন্তঃপুরে তার প্রবেশ নিষেধ। এ নিষেধ কেউ যে কোনদিন কাগজ-কলমে করেছে তা নয়—ভাঙ্গী চামার নয় ওরা—তবু, ওরা নিজেরাই ঢোকে না। সঙ্কোচ বোধ করে, ঢোকা উচিত নয়, এ ওরা নিজেরাই ধরে নিয়েছে।...

সেদিনও যেমন ছিলেন আজও তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্যাম-সোহাগিনী মেঝের দিকে চেয়ে।

চোখে কি একবার আগুন জ্বলে উঠেছিল? কে জানে, লক্ষ্য করার মতো তো কেউই কাছে ছিল না।

হতভাগী! নিজেও নষ্ট হ'ল, নিজের জীবনটা—আশা ভরসা ভবিষ্যৎ—সব শেষ হয়ে গেল—আমাদের এই দেবতার আশ্রিত সংসার, এই বংশও শেষ ক'রে দিয়ে গেল।

গুরুবংশের প্রধান হবার উপযুক্ত ছেলে তাঁর, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ব্যবহারে বিবেচনায় এ ব্রজপুরীতেও অদ্বিতীয়—একথা তিনি জোর গলায় বলতে পারেন। বহু বড় বড় গোসাঁইদের দেখেছেন। এমন নির্মল চরিত্র, সৎ, নির্লোভ—ঈশ্বর-গত প্রাণ কাউকে চোখে পড়ে নি। সাধনার নাম ক'রে লাম্পট্য ক'রে বেড়ায় এমন বড় বড় গুরুও দেখেছেন বৈকি। তারা—বলতে নেই—এর পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়।

এ-ই যদি সবে দাঁড়ায়, ছোট ছেলে পারবে এই ঠাট বজায় দিতে, সব দিক সামলে চলতে?

কে জানে তার বৌই বা কেমন আসবে।

ছেলেই বা বিয়ের পর কি দাঁড়াবে তার ঠিক কি।

হে গোপীবল্লভ, এ কী করলে তুমি!

তিনি জীবিত থাকতেই কি এত বড় বংশের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে! আর তাই তাঁকে দেখতে হবে!

প্রাণস্বরূপ সেই ঘটনার পর থেকেই এখানে বেশির ভাগ দিন রাত্রিবাস করেন না। ঠাকুরের শয়ন আরতি সেরে বাগানবাড়ি চলে যান। রাত্রে প্রসাদ মুখে দেন নামমাত্র।

সঙ্গে দারোয়ান একজন যায়। কিছু দূরে ওঁদের নিজস্ব একা অপেক্ষা করে, তাইতেই যান। আবার লাড্ডুভোগ নিবেদন করবার সময় নাগাদ ফিরে আসেন। বাগানবাড়িরই এক প্রান্তে ছোট একটা ঘর করিয়ে নিয়েছেন, সেখানেই থাকেন তিনি। নিজস্ব পূজা-আহ্নিকের সরঞ্জাম নিয়ে।

দুপুরের আরতি, সন্ধ্যারতি কোনদিন করেন, কোনদিন বাইরে বসে থাকেন একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে চেয়ে। বরং সকালের পূজা এক-একদিন করেন—পূজারীদের অনুমতি নিয়ে। তিনিই কর্তা, তবু অনুমতি নেন পাছে পূজারীরা মনে করেন উনি

অবহেলা করছেন তাঁদের, অপদার্থ অকর্মণ্য ভাবছেন।

এই পূজা আরতির অবসরে ছোট ভাইকে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াতে বসেন—যাকে বাঘের মতো ভয় করে সে। কিন্তু মিষ্ট কথা বলে, মিনতি ক'রে নিজের ভাগ্য দেখিয়ে তাকে বশ করেছেন, সে সত্যিই এখন সংস্কৃত চর্চা শুরু করেছে বিশ্বরূপ গোস্বামীর কাছে।

কি করে ও বাগানে—কৌতূহল স্বাভাবিক। অথচ গোয়েন্দাগিরি না মনে হয়, সে ভয়ও আছে। শ্যামসোহাগিনী সুকৌশলে দারোয়ানকে ডেকে ছেলের স্বাচ্ছন্দ্য ও সেবার কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা সেই প্রশ্নের মধ্যেই সেটা শুনে নেন, আসল প্রশ্নের উত্তরটা।

দেখলেন দারোয়ানও বলতে চায়, তারও কৌতূহল যথেষ্ট। কৌতূহল ও আশঙ্কা।

তার বক্তব্য, দাদা গোসাঁই যেন দিন দিন সাধন-ভজনেই ডুবে যাচ্ছেন সন্ন্যাসী বাবাজীদের মতো। এখান থেকে ফিরে অত রাত্রেও শুতে যান না। আসনে বসে জপ করেন বা চোখ বুজে ধ্যান করেন। কত রাত্রে বিছানায় যান তা কেউ জানে না; আবার ওঠেন পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই। কোন দিন বা আরও আগে। তখনই স্নান ক'রে একদফা আহ্নিক পুজো সেরে তবে রওনা দেন ওখান থেকে।

আরও বলে দারোয়ান, 'এর জন্যে পাড়ায় রটেছে, ঐ ওপাড়ার বুড়ো গোসাঁই-বাবার মতো রোজ বাগানে যান, ওখানে সেবাদাসীরা আসে—মানে খারাপ মেয়ে-ছেলেরা সব—তাদের সঙ্গে আমোদ করেন।...অথচ আমি জানি মা, এক-একদিন রাতে উঠে দেখেছি, ঠাকুরের ছবি, দাদার হাতেই আঁকা ঠাকুরের পটের সামনে দণ্ডবৎ করার মতো শুয়ে পড়ে আছেন, যেমন ভাবে পিঠটা ফুলে ফুলে ওঠে—মনে হয় কাঁদছেন, আর বার বার নিজের কান মলছেন। তারপর—যেন শান্ত হয়ে উঠে আবার জপে বসছেন!'

শিউরে ওঠেন শ্যামসোহাগিনী। ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে না তো শেষ পর্যন্ত! এ কি পরীক্ষায় ফেললেন গোপীবল্লভ! কী অপরাধ উনি করেছেন যে এত বড় শাস্তি দিচ্ছেন! মান-ইজ্জৎ তো গেলই, শেষ পর্যন্ত ছেলের এই শোচনীয় পরিণামও কি ওঁকে চোখে দেখতে হবে!

এক এক সময় ওঁর অখণ্ড ধৈর্যও নষ্ট হয়। হিংস্র হয়ে ওঠেন। কী কুক্ষণেই ঐ মেয়ে ঘরে এনেছিলেন! সব দিক দিয়েই সর্বনাশ ক'রে ছাড়বে।

আবার ভাবেন, ওঁরই কোন সেবায় ত্রুটি ঘটেছে। হয়ত সেবার অহঙ্কার জেগেছিল মনে। তাই এই শিক্ষা।

তিনিও বিগ্রহের সামনে মাথা খোঁড়েন নির্জন অবসরে।

দারোয়ানের তো জানবার কথাই নয়, শ্যামসোহাগিনীরও কল্পনার অতীত এ রহস্য—কেন প্রাণস্বরূপ অমন ক'রে গোপীবল্লভের সামনে মাথা খোঁড়েন, মুখ ঘষেন। কান মলেন।

তিনি যে ব্যর্থ, বার বারই ব্যর্থ হচ্ছেন।

যতই সাধনায় ধ্যানে পূজায় ডুবিয়ে দিতে চান নিজেকে, তত বারই মন অন্যত্র অন্য চিন্তায় চলে যায়। তারই জন্য এ আকুলতা, এই ক্ষমা-প্রার্থনা।

কিশোরী বধূর সেই বিপন্ন পশুর মতো অতি অসহায় দৃষ্টি, পায়ে মাথা রেখে আশ্রয়-প্রার্থনা, আত্মনিবেদনের আকূতি—কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে। সেই ওঁর দেহের খাঁজে মুখ গুঁজে দেওয়া, দীর্ঘায়ত প্রণাম, ওঁকে সেবার জন্য ওঁর কাজে লাগার জন্য ব্যাকুলতা—দিন দিন বরং স্মৃতিতে আরও স্পষ্ট, আরও রঞ্জিত হয়ে উঠছে ওঁর আর্তি আকুলতায়, ওঁর কামনায়—এমনভাবে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছে দিন দিন।

স্বল্পদিনের প্রণয় স্মৃতি, তারই যন্ত্রণা তারই পিপাসা—দেবতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ঘটতে দিচ্ছে না কিছুতেই। বিপুল এক ব্যবধান—বা অন্তরায় রচনা ক'রে রেখেছে।

৭
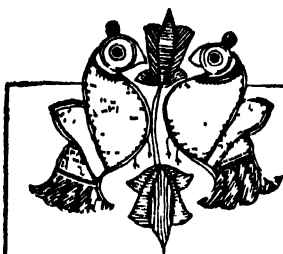
পাষাণে যে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে ধীরে ধীরে, তা লক্ষ্য করার কথা নয় মোহিনীর। সারাদিনের কর্মব্যস্ততায়, অন্তহীন পরিশ্রমে—শুধু যে লক্ষ্য করাব অবসর বা কৌতূহলের অভাব তাই নয়, ক্ষুদ্র সংসারের ভাল-মন্দ, জীবন-ধারণের বিপুল সমস্যা তার মনকে এই এক বিন্দুতে এমন কেন্দ্রায়িত করেছে যে—কোথায় কি সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে তা চেয়ে দেখবার লক্ষ্য করার শক্তি হারিয়ে গেছে।

যমুনার স্তম্ভিত বা প্রস্তরীভূত ভাব কাটল আর এক তীব্রতর আঘাতে। বা শক্তিতে ?

কামনায়।

কামনার মতো শক্তি আর কোন মনোভাবের আছে !

স্বরূপ অর্থাৎ স্বামী সম্বন্ধেই কামনা।

প্রথম যৌবনে, যখন সবে নরনারী কৈশোর অতিক্রম করে, যে কোন আঘাত বিঘ্ন দুঃস্মৃতি ক্ষতি—কাটিয়ে উঠতে পারা যায়।

গুরুত্ব হিসেবে সময়ের তারতম্য ঘটে—এই পর্যন্ত।

বিশাখার এই পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব একটু বেশী হবারই কথা। তার কারণ—এত অল্পবয়সে, সংসার ভাল ক'রে জানবার চেনবার আগেই এমন সব কঠিন দুঃসহ আঘাত এসে পড়ল উপর্যুপরি—যা কোন বেশী বয়সের মেয়েরও সহ্য করা শক্ত। হয়ত অল্প বয়স বলেই পারল,—বা সবটা বোঝে নি বলেই পারল—কে জানে।

অবিশ্বাস্য যেসব ঘটনা ঘটল তার এই কটা বছরের জীবনে, তা বুঝতেই তো সময় লাগল এত। এখনও যে ঠিক পুরো বুঝেছে তাও নয়।

ওর এই প্রস্তরবৎ অবস্থা হয়ত সেই কারণেই—কি ঘটল কি ঘটছে, কেন তার এই অকারণ লাঞ্ছনা—দুর্দশা-অপমান—তা ভাল ক'রে বুঝতে না পারার জন্যেই।

বাঁচাল তাকে যৌবনধর্মই। এই বয়সে মেয়েদের পুরুষ সম্বন্ধে আকর্ষণ আসঙ্গ-লিপ্সা আপনিই দেখা দেয়, দেহের নিয়ম এটা। সেই নিয়মেই পুরুষেরও নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ জন্মায়, কারও কারও আরো অল্প বয়সে—তেরো-চোদ্দ

বছর বয়সে এই ক্ষুধা বা তৃষ্ণা—যা-ই আখ্যা দিন—এমন তীব্র হয়ে ওঠে, এটা কী তা বোঝবার আগেই যে, তারা নানা অস্বাভাবিক উপায়ে সে দুর্দমনীয় পিপাসা মেটাতে বাধ্য হয়। স্বচ্ছ জলের অভাবে মরুক্লান্ত পথিক তো কাদাও খায় শোনা গেছে।

যমুনার পিপাসা অতটা অসহনীয় হয় নি—তার বিবাহের আগে পর্যন্ত।

তাদের পারিবারিক জীবনে এমন ব্যবস্থা ছিল (এ ব্যবস্থা যে আছে তাও বোঝা যেত না, চোখে অস্বাভাবিক লাগত না গৃহবাসীদের, তার কারণ এটা বহুদিন ধরে চলে আসছে, যমুনার কালের অনেক আগে থেকে) যে, নিকট-আত্মীয় ছাড়া কোন পুরুষকে কাছে থেকে দেখার কি ঘনিষ্ঠতা করার কোন সুযোগ ঘটে নি। তখনও সিনেমার এত চল হয় নি, থিয়েটার দেখতে গেলে কলকাতা যেতে হ'ত, সুতরাং তাও হয়ে ওঠে নি।

এ সম্বন্ধে জ্ঞান হ'ত সেকালের মেয়েদের—বিবাহিতা দিদি বা নববিবাহিতা বৌদিদের কাছ থেকে। যমুনার নিজের বা খুড়তুতো দাদা কারো তখনও বিয়ে হয় নি, দিদি কেউ ছিল না। মামাতো পিসতুতো দিদিরা আসতেন দু'চার দিনের জন্যে। 'ঝাঁকের ঘরে' অর্থাৎ বড় একান্নবর্তী পরিবারে, বহু সমবয়সী বা অন্য লোকের মধ্যে তাঁরা এই 'পুঁচকে' মেয়েটার সঙ্গে এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করবেন কখন? কেনই বা করবেন?

অতি বিস্ময়ের সঙ্গেই সচেতনতাটা ঘটল তাই—বিয়ের পরে। একেবারে স্বামীর কঠোর আলিঙ্গনে, উত্তপ্ত দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে। প্রথম যে অপূর্ব সুখ ও শিহরণ—অনাস্বাদিত অপরিচিত—বোধ করল, তাতেই পুরুষসঙ্গসুখ সম্বন্ধে তার মনের মধ্যেকার যৌবনতৃষ্ণা প্রথম জাগ্রত হ'ল।

এতে যে এত আনন্দ, এত মাদকতা—তা জানত না, কখনও ভাবেও নি। বিয়ে হয় মেয়েদের এটা জানত, সকলের সমান বিয়ে হয় না, মনের মতো পাত্র পাওয়া, ভদ্র শ্বশুরবাড়ি—এ দুর্লভ, তাও শুনেছে বহু লোকের মুখ থেকে বহুবার। যমুনার কপাল খুবই ভাল, সকলে বলতে লাগলেন বার বার—এমন স্বামী পাওয়া বহু জন্মের তপস্যার ফল, জন্ম-জন্মান্তরের শিবপূজার পুরস্কার—কেন তা অত বোঝে নি। জ্ঞান হবার পর থেকেই বিয়ে সম্বন্ধে এই ধরনের কথা শুনে—এর যে কোন বিশেষ অর্থ বা মূল্য আছে তাও মাথায় ঢোকে নি, তা নিয়ে চিন্তাও করে নি।

বিয়ের পর কতকটা বুঝল।

সে এই দৈহিক সুখ ও শ্বশুরবাড়ির সাদর আচরণ যে ঠিক সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারত না—সেটা অন্য কারণে। 'কারণ'টার কারণও পুরোপুরি বোঝে নি,

সুতরাং অপরাধবোধও অতটা ছিল না—ছিল সহজাত একটা সঙ্কোচ। অপরাধ কিছু ঘটেছে কিনা এই জিজ্ঞাসাই একটা মনের মধ্যে ছিল, ফলাফল কি হতে পারে তাও জানা ছিল না। মনের মধ্যে কিন্তু জোরও ছিল—সে যখন কোন দোষ করে নি, ভগবান তাকে শাস্তি দেবেন কেন ? যদি দোষই হয় এটা।

এটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ না থাকলে সে-ও হয়ত এই নবীন সুখে উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠত। সে-ই স্বাভাবিক। তবু উপভোগ করেছে বৈকি। আর তার ফলে কী বিস্ময়! কী বিস্ময়! স্বামীর দেহের গন্ধেই যে এত মাদকতা, তার এত আকর্ষণ—এতখানি সমস্ত দেহ-মন-অবশ-করা একটা সুখাস্বাদ থাকতে পারে—তাই বা কে জানত!

সহবাস এল আরও পরে। সেদিক দিয়ে সে সৌভাগ্যবতী, আজ তাই মনে হয়। এই সুখের, মিলনের সমস্ত অধ্যায়গুলোই পুরোপুরি আস্বাদ করতে পেরেছে। ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে—দাম্পত্যজীবনের কমলদল খুলেছে।

যে বাঘ নাকি মানুষের রক্তের স্বাদ পায়, মানুষের মাংস ছাড়া তার আর কিছু রোচে না—মোহিনী বলে প্রায়ই।

এর অর্থ স্পষ্ট হ'ল তার এই জাগরণেই।

একটি একটি ক'রে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র আপাততুচ্ছ স্মৃতি মনে পড়ে আর মনের মধ্যে এক অস্থিরতা, উন্মত্ততা বোধ হয়। আকুল হয়ে ওঠে স্বামী-সান্নিধ্যের জন্যে।

কী সুন্দর দেখতে মানুষটা! আরতির সময় তার বিস্তৃত পিঠখানা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে যায়—আরতির সময় উত্তরীয় সরে পিঠের অনেকখানি অনাবৃত হয়ে পড়ে—প্রায় সব পিঠটাই চোখে পড়ত। সে সময় মনে হ'ত ঐখানটায় যদি মুখটা ঘষতে পারত! আবার সে যখন প্রতিদফা আরতির শেষে দেবতা-দর্শকদের* উদ্দেশ্যে এদিকে ফিরে শূন্য পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর পাত্র, বা পানিশঙ্খ দেখায়, তখন ললাট ও বক্ষও চোখে পড়ে চকিতে—সেটুকু দেখার জন্যেই শেষের দিকে কদিন—একটা মাস বোধ হয়—লালায়িত থাকত!

কী মধুর স্বভাব, কী মিষ্টি কথাবার্তা! যমুনার জন্যে, ওর মুখে প্রসন্নতা ফোটাবার জন্যে কী উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেও বাপেরবাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল।...অথচ আবার সেই কোমলপ্রাণ মানুষেরই পেশীতে কত শক্তি—কী

---

* অনুমান করা হয় আমার বা আমাদের বিশেষ দেবতার আরতির সময় অন্য সব দেবতা বা স্বর্গবাসীরা সে আরতি দেখার জন্য ভীড় করেন—তাঁদের উদ্দেশেই এই শূন্যে বা উর্ধ্বে তুলে ধরা, আরতির বিভিন্ন দফা উপকরণ।

কঠিন আলিঙ্গনে চেপে ধরত ওকে—একান্ত বাঞ্ছিত ঐ বুকের ওপর।

ক্রমে ক্রমে কামনা উদগ্র হয়ে ওঠে। তাকে আবার তেমনি ভাবে পাওয়া এ জীবনে সম্ভব নয় তা সে বোঝে, এখন বুঝতে পারে—একবার শুধু দেখার জন্যে যেন পাগল হয়ে ওঠে এক এক সময়। একটা যন্ত্রণা বোধ হয়।

এইবার চোখে জল দেখা দেয়, সে অশ্রু ধারায় ধারায় নেমে এসে বুক পর্যন্ত ভেসে যায়। অন্ধকার নির্জন ঘরে আকুল হয়ে কাঁদে এক এক দিন। কোন কোন দিন পুরনো ঘরের খোয়া-ওঠা মেঝেতে মাথাও খোঁড়ে।

এই মাথা খোঁড়ার দাগেই মোহিনী একদিন বোঝে ব্যাপারটা। যেন এক নিমেষেই বুঝতে পারে। নিঃশব্দে কাছে এসে বসে যমুনার মাথাটা ওর শীর্ণ বুকে চেপে ধরে পিঠে গায়ে হাত বুলোয়।…

বহুদর্শিনী, সংসারের-পোড়-খাওয়া মেয়ে মোহিনী জানে এ দুঃখে সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই। সে অন্য পথ ধরে। তবে ধীরে ধীরে, একেবারে বেশী এগোনো চলবে না। এবার সে যমুনার স্বামী সম্বন্ধে প্রশ্নও করে। প্রথম প্রথম চুপ ক'রে থাকত, তার পর বলতে শুরু করে যমুনাও। বলতে পেয়ে যেন বেঁচে যায়। বলতেই তো চায় সে। পৃথিবীতে একজনও ব্যথার ব্যথী আছে—এইসব ঘনান্ধকারময় হতাশ মুহূর্তে—এ একটা পরম আশ্বাস, সান্ত্বনাও।

'হায় হায়! আবাগী! এমন সোয়ামী পেয়েও ভোগ করতে পারলি নি! সত্যিই তো, পাগল হয়ে যাবারই তো কথা।…ঝাঁটা মারি বিধেতা পুরুষের কপালে! কেন, কি দোষ করেছিল এই কচি মেয়েটা—দুধের মেয়ে বলতে গেলে—তাকে এমন সাজা দিলি, এমন সব্বনাশ ঘটালি। কী বয়েস ওর, ও কি কিছু বুঝতে শিখেছে, না জানে কিছু! হাত্তোর ভগবানের বিচের রে!'

অন্ধকার গুহায় এই হয়ত আমরণ বন্দীদশা, নির্গমনের পথ নেই কোথাও,—এই কথাই মনে হয়ে আরও অধীর আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যখন—মোহিনীর সত্যকার সহানুভূতিতে, ভালবাসাই বলা উচিত—অকস্মাৎ পথ দেখতে পায় যমুনা।

সে বৃন্দাবনে যাবে, একাই যাবে। যেমন ক'রেই হোক যাবে ও পৌঁছবে সেখানে। দূর থেকেও কি দেখতে পাবে না কোন দিন, এক-আধবার? তা না পেলেও, কাছে আছে এটাও যে বড় একটা সান্ত্বনা।

আর, এটা যদি তার পাপই হয়ে থাকে, সে প্রায়শ্চিত্তও সে সেখানে গিয়ে করবে। সাধন-ভজনেই দিন কাটাবে, দীক্ষা তো হয়েই আছে, নিরন্তর জপ করবে,

উপবাস করবে—যত রকমে সম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন করবে।

আর, যদি তিনি বিয়েই ক'রে থাকেন, করেছেনই—এতদিন কি আর বিয়ে দেন নি শাশুড়ি? কেনই বা করবেন না?—আড়াল থেকে সে বৌকে একবার দেখার চেষ্টা করবে। সে কতটা ভালবাসছে তাঁকে, ঠিক ঠিক সেবা করতে পারছে কিনা।…

মোহিনীর অবসর কম, খুবই কম—তার মধ্যে আবার হরেকেষ্ট কি রাখহরি থাকবে না—এমন অবসর দুর্লভ।

কিন্তু হয়ত গোপীবল্লভেরই কৃপা, এমন অবসর পেয়েও গেল একদিন।

বিকেলের নানাপ্রকার কাজের মধ্যেও সেদিন একটু ফাঁক পেয়ে মোহিনী এসেছিল ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে।

যমুনার ছেলেটাকে একটু আদর করতেও। ও যেন মোহিনীকে পেয়ে বসেছে। শিশু বেশ বোঝে কে তাকে ভালবাসে।

তবে এখন সে ঘুমোচ্ছে। রাখহরিও ইস্কুল থেকে আসে নি, চারটেয় ছুটি হয় —কিন্তু কোনদিনই সে এ সময় ফেরে না। ছুটির পর অন্য ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা বা গাছে গাছে ফল চুরি করা—এই লোভেই সে ইস্কুলে যায। পড়াশুনো যে তার হবে না তা সে নিজেও জানে, তার বাপ-মাও জানে। মাইনে লাগে না যখন— ছেলেটা একটু আটকে থাক, এই জন্যেই তারা পাঠায়।

রাখহরিও নেই। হরেকেষ্ট গেছে তার আড্ডায়—তাস খেলতে ও বিনা-পয়সায় গাঁজা খেতে। এই-ই প্রকৃষ্ট অবসর।

মোহিনী এসে ওর অভ্যাসমতো খোয়া-ওঠা মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসে নিজের পায়েই হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল বুঝি?'

অবসর বটে তবে দীর্ঘস্থাযী যে নয় তা যমুনা ভালই জানে। সে এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একেবারে বিনা ভূমিকায় ওর দুটো হাত চেপে ধরে বললে, 'দিদি, তুমি আমাকে স্নেহ করো, তোমার দয়াতেই বেঁচে আছি—সেই ভরসাতেই বলছি, তুমি আমার একটা উপকার করবে? বলো, কথা দাও!'

এমনিই অবসর কম, তার মধ্যে এখনই হয়ত কেউ এসে পড়বে বা গরুবাছুর মাঠ থেকে হঠাৎ ফিরে আসবে, কোন ছাগল পরের বাড়ি গাছ খেয়ে হ্যাঙ্গাম বাধাবে— সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীকে ছুটতে হবে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথাগুলো বলে নেওয়া দরকার। ওর বলতে গেলে এটা একরকম জীবন-মরণ সমস্যা। সেইজন্যেই এমন হঠাৎ বলা।

মোহিনী হকচকিয়ে গেল। এমন ভাবে কোনদিন কথা বলে নি যমুনা—সাধারণ মেয়ের মতো। আগে কথাই বলত না, এখন—এই গত মাসখানেক হ'ল, কিছু কিছু

বলছে। কিন্তু এ ভাবের কথা ওর মুখে অবিশ্বাস্য।

একটু সামলে নিয়ে—যমুনাকে কাছে টেনে মুখখানা তুলে ধরে বললে, 'ব্যাপার কি বল তো? তুই বললে—যদি আমার সাধ্যিতে কুলোয়—নিশ্চয় করব। অবিশ্যি যদি কোন দুষ্য কাজ না হয়। তার জন্যে এত "কথা" আদায় করতে হবে কেন?'

'দিদি—আমি আর পারছি না। যদি এ থেকে মুক্তি না পাই তো আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে হয়ত। অনেক আগেই করতুম, আত্মহত্যা নাকি মহাপাপ তাই করি নি। গত জন্মে—যদি জন্মান্তরের কর্মফল বলে কিছু থাকে, আমার মা, শাশুড়ি এঁরা বিশ্বাস করেন তাই বলছি—গত জন্মে কত কত মহাপাপ করেছি তাই পরিপূর্ণ সুখ সৌভাগ্য দিয়েও ভগবান সে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলেন। আত্মহত্যার কথা বার বার মনে হয়েও করতে পারি নি—মনে হয়েছে আগের জন্মে যা পাপ করেছিলুম তা ক্ষয় হয়ে যাক, পরের জন্মে যেন ওঁর পা দুটি আবার ফিরে পাই।'

'এত কথা বলছিল কেন ভাই, কি করতে হবে তাই বল না!'

মোহিনী এ ধরনের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। বোধ হয় সব কথার মানেও বোঝে না—সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

'তুমি, তুমি এই ছেলেটার ভার নাও দিদি। তোমার তো এ অব্যেস আছে, আর এখনও তো তুমিই বলতে গেলে বাঁচিয়ে রেখেছ। আমার পেটে এসেছে, তবু বলছি দিদি—ও আমার ছেলে নয়। সেসব কথা বলতে পারব না কাউকে কোনদিনই—তবু একটা প্রাণী তো। কেউ ভার না নিলে ছুটি পাবো না।'

প্রস্তাবটার পূর্ণ অর্থ বুঝতে এবারও দেরি হয় মোহিনীর।

খানিকটা বিহ্বলভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'তার পর? ওর ভার না হয় নিলুম; আমার তো মায়াই পড়ে গেছে—আমি কেন, গাঁজাখোর ঐ মানুষটাও তো দেখেছিস, খ্যাল হলে কত আদর করে, নাচায়। তা সে যাকগে—তুই ছুটি নিয়ে কি করবি? আপ্তঘাতী হবার ইচ্ছে নাকি!'

'না দিদি, তাহলে সেইদিনই করতুম। বললুম তো তোমাকে—কেন করি নি। আমি বৃন্দাবনেই যাবো।'

'বিন্দেবন যাবি!' আবারও দেরি হয় মোহিনীর ব্যাপারটা বুঝতে, 'সে কি? বিন্দেবনে গিয়ে কি করবি? কোথায় যাবি? সেখেনে কি তোকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নেবে ভাবছিস!'

'না না, এত পাগল এখনও হই নি আমি। কেন যাবো, কি ভেবেছি সে বড় লজ্জার কথা—তবে তোমাকে আমার লজ্জা নেই। এখন এ পৃথিবীতে বোধ হয়

তুমিই আমার একমাত্র আপন।…না, আশা আর কোথাও কিছু নেই—তবু, কাছাকাছি, এক শহরে তো থাকব। কোনদিন এক-আধবার কি চোখে দেখতে পাবো না তাঁকে? এই আশাতেই যাওয়া, সত্যি বলছি!'

'ওলো, তাতে জ্বালা বাড়বে বৈ কমবে না। এ দূরে আছিস একরকম ভাল, কিছুটা সয়ে গেছে, আরও যাবে। কাছে যাবি, দেখবি, তবু তাকে ধরতে ছুঁতে পাবি নি, কথা কইতে পারবি নি—সে যে আঙরায় পোড়া তুষের আগুনে দগ্ধে মরা। এ পাগলামি করতে যাস নি!'

'না দিদি, আমাকে ছেড়ে দাও, এভাবে থাকলেও পাগল হয়ে যাবো। না হয় না-ই দেখলুম, এক শহরে আছি, খবরও হয়ত পাবে'—মনে হয় এতেও খানিকটা সুখ! আর,…যদি কোন পাপ হয়ে থাকে আমার, তীর্থে বসে দিনরাত ভগবানের নাম জপ করলে হয়তো সেটার স্খালন হবে।'

খানিকটা চুপ ক'রে রইল মোহিনী, বোধ হয় ওর জ্বালার কিছুটা বুঝল। তার পর বলল, 'তা কার সঙ্গে যাবি? কি খাবি, কোথায় থাকবি, সে কথাগুলো ভেবেছিস? তুই তো ঘরের বৌ হয়ে ছিলি, সেও কটা মাস বা—একরকম নজরবন্দী হয়ে থাকা—ওখেনের কিছুই তো জানিস না।'

'কারো সঙ্গে যাবো না, একাই যাবো। তোমার স্বামী বলেন শুনেছি এখান থেকে বর্ধমান গিয়ে দিল্লীর গাড়ি ধরা যায়, পথে কি তুণ্ডুলা স্টেশন পড়ে, সেখান থেকে ছোট লাইনের গাড়িতে মথ্‌রা। আমি তো একবার গিয়েছি, এইভাবেই গেছি, মনে পড়ছে। না হয় কোন লোককে জিজ্ঞেস করে নেবো—'

'ছ্যাথ—এ হ'ল পুরো ক্ষ্যাপামি। তুই নিহাৎ ছেলেমানুষ, কচ্‌ছেলে ছাড়া এমন কথা কেউ বলে না। যাকে পথ জিজ্ঞেস করবি, সেই অন্য পথে নিয়ে যাবে। আর, এই কাঁচা বয়েস, রূপের পসরা—বধ্যমান পজ্জন্তই কি যেতে পারবি? কাঁচাখেগো রাক্কসের দল ছেড়ে দেবে তোকে?…তার পর? কোথায় থাকবি গিয়ে? কিছুই তো জানিস না সেখেনের হালচাল। কার খপ্পরে পড়বি ঠিক আছে! খাবিই বা কি? যদি টাকা সঙ্গে নে যাস, সেও তো আর এক বিপদ!'

'সে—সেখানে গিয়ে ঠিক করব। কোথাও কি একটা আশ্রয় পাবো না? সবাই কি খারাপ সেখানের? আর খাওয়া—মাধুকরী করব!'

'ছ্যাথ ছুঁড়ি, এবার আমার হাতে চড় খাবি। অমন পাগলের মতো কথাবাত্তারা বললে দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখবো!'

তারপর একটু থেমে বলে, 'বিন্দেবন আমি যাই নি। কিন্তু আমার জানাশোনা, আমার শাউড়ী, গেরামের বেস্তর লোক গেছে সেখেনে, তাদের মুখে অনেক বিত্তেন্ত

শুনেছি। তাছাড়া এই নবদ্বীপে বসেও সেখেনের কথা কি কম শুনেছি, মনে করিস! গোবিন্দ গৌরাঙ্গ এক যাত্তারায় দর্শন করতে হয় বলে অনেকে সেখেন থেকে সোজা এখেনে আসে। গোবিন্দ পাপী-তাপী তরান, তাঁর ছিচরণের আচ্ছয়ে এরা গিয়ে পড়ে। তবে তাপীদের তরান কিন্তু পাপীদের তরাতে পারেন না। তাপীরাই বরঞ্চ তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। কে জানে এ তাঁর কি লীলে। তবে এত লোক এই এক কথাই বলে—সে কি মিছে হয়! তোমাদের ঐ গাঁজাখোর চক্কত্তি একটা কথা বলে বড মন্দ নয়—বলে, দেখিস না মা-বাবার দুষ্টু বয়াটে ছেলেদের দিকেই টান বেশী—তা গোবিন্দই বল আর মা কালীই বল—আমাদের তো বাপ মা।'

'সে আমি জানি না দিদি, তাহলে তুমিই একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও, তোমার দুটি পায়ে পডছি—' সে সত্যি-সত্যিই মোহিনীর দুটো পা চেপে ধরে, 'যেমন ক'রেই হোক্ তুমি আমাকে মুক্তি দাও।'

'ষাট ষাট, দ্যাখো পাগলীর কাণ্ড।' হাত বাড়িয়ে দাড়িতে হাত দিয়ে হাতে চুমো খায় নিজের, 'তুই সত্যিই পাগল হয়ে গেছিস।...আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি, তুই কটা দিন ধয্যি ধরে থাক, আমাকে একটু ফাঁক দে, দেখি তেমন কোন জানাশোনা ভাল লোক এখেন থেকে সিধে বিন্দেবন যাচ্ছে কিনা। যায় তো পেরায়ই। বিন্দেবন দেখে এই গৌরের মাটিতে যেমন আসতে হয়—নবদ্বীপের লোকও গৌর গোবিন্দ মিলিয়ে নিয়ে যায়।...দেখি।'

৮
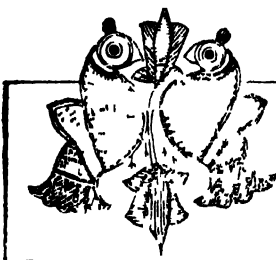
সত্যিই মোহিনী যেন ভেল্‌কি দেখায়। মাসখানেকের মধ্যেই একটা সুব্যবস্থা করে।

এক বৈষ্ণব বাবাজী আর তাঁর স্ত্রী (অথবা সেবাদাসী) পোড়া-মা-তলার কাছে এক হেলে-পড়া চালাঘরে থাকতেন। ঠিক ভিখিরী নন, জাত বৈষ্ণব, নামগানই পেশা, তবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'হরে কেষ্ট! চারটি ভিক্ষে দিন মা' বলে দাঁড়াতেন না। বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, অগ্রাণ ও মাঘ ফাল্গুন মাসে নিত্য পাড়ায় নামগান করে ভোরবেলা "ফেরা" দিতেন মাত্র। কখনও দুজনে কখনও বা একাই। এক-জনের অসুখবিসুখ হলে অপরজন বেরোতেন। "ফেরা"টা বন্ধ হ'ত না।

তখনকার দিনে এর বদলে নামবিতরণকারীর 'তনুরক্ষা' করা কর্তব্য বলে মনে করতেন গৃহস্থরা। পরের মাসের গোড়ার দিকে – সামর্থ্য মতো, যার যা সুবিধা বোধ হ'ত, এদের প্রয়োজন বুঝে—তাই দিতেন। চাল ডাল নুন তেলের বড় সিধা, ধুতি বা শাড়ি, গামছা, কেউ বা নগদ পয়সা—এক টাকা, আট আনা। এর মধ্যে কোন কোন সম্পন্ন লোকের বাড়ি থেকে—যেমন বাগচিদের কি রায়েদের বাড়ি থেকে বেশীই দেওয়া হ'ত, সিধের সঙ্গে টাকাও।

এই ভাবেই দিন চলছিল। কিন্তু দু'জনেরই বয়স বাড়ছে, ক্রমে সেটা অনুভব করতে লাগলেন, বা করতে বাধ্য হলেন। এভাবে প্রতিদিন প্রায় অর্ধেকটা শহর পরিক্রমা করা আর পোষাচ্ছে না। অনেক ভেবে ওঁরা ঠিক করেছেন, এখানের পাট উঠিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলে যাবেন। চেনা এক ভদ্রলোক আছেন—এককালে এ পাড়াতেই থাকতেন, এক বড় জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। এখন আধা সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনের পুরনো শহরে অষ্টসখীর কুঞ্জের কাছে পুরনো মনিবের কুঞ্জে কামদার হয়ে আছেন। তিনিই—বছর দুই আগে স্ত্রীর মৃত্যুর সময় এসেছিলেন একবার। যদিও শ্রাদ্ধকৃত্যে কোন অংশ নেন নি—ওদের শরীরের অবস্থা দেখে বলে গিছলেন, 'আর কেন, রাধারাণীর আশ্রয়ে চলো, আমি থাকার জায়গা একটু দিতে পারব,

একটা ক'রে পারসও* হয়ত দেওয়াতে পারব—বাকী, মাধুকরী করতে পারবে। এত হাঁটতে হবে না প্রত্যহ, ঐ পাড়াতে অনেক ছোট বড় কুঞ্জ আছে, ব্রজবাসী গৃহস্থ-বাড়িও আছে—জয় রাধে বলে দাঁড়ালেই দু'জনের মতো রুটির যোগাড় হয়ে যাবে।'

কথাটা মনে ছিল। এখন প্রায় অপারগ হয়ে পড়ায় মন স্থির করেছেন। অল্প দু'চারখানা কাপড় জামা, অল্প কটা টাকা নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করছেন। বাসনকোসন সামান্য যা ছিল বিক্রী করেছেন, ঘরের কিছুই প্রায় নেই—জমিটুকু বাবদ শ'খানেক টাকাও পেয়েছেন—সেই ভরসাতেই রাধারাণীর নাম নিয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যেই শুনেছেন ওখানে শীত খুব বেশী, শুধু কাঁথায় হবে না, সে জন্যে কিছু শীতবস্ত্রও নিতে হয়েছে—তাতেও বেশ খানিকটা বেরিয়ে গেছে।

খবর পেয়ে তাঁর কাছেই গিছল মোহিনী।

প্রথমটা তো নামদাস বাবাজী আঁতকেই উঠেছিলেন। 'আমি কখনও কোথাও বেরুই নি, কিছুই জানি না শুনি না—নিজেরা কোথায় গিয়ে থাকব তারই ঠিক নেই। ঠিকানাটা ত্যাখন লিখে রাখি নি—সে মানুষটাকে খুঁজে না পেলে আমরাই নিরাচ্ছয় হয়ে পড়ব। অজানা অচেনা দেশ, গোবিন্দ আছেন ঠিকই—তেমনি তাঁর চরণে আচ্ছয় নেবার লোকও ঢের আছে। পাজী বদমাইশ লোকের অভাব নেই শুনেছি। আমি একটা সোমথ সোন্দর মেয়ে নে কোথায় যাবো? তুমি কি ক্ষেপেছ পূজুরীদ!'

(পূজারার স্ত্রী অর্থে পূজুরীদ।)

মোহিনীও এত সহজে হাল ছাড়ার মেয়ে নয়। সে বলে, 'ত্যাখো বাবাজী মশাই, সত্যি কথাই বলি—বামুনের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়ে—বেন্দাবন যাবে বলে ক্ষেপে উঠেছে। একা গেলে পথেই গুণ্ডা বজ্জাত রাঁড়ের দালাল—কে কোথায় ভুলিয়ে নে গিয়ে কোথায় কোন নরককুণ্ডুতে ফেলবে তার ঠিক আছে! কে হয়ত বা একা মেয়েছেলে দেখে পুলিস সেজে এসে থানায় নে যাচ্ছি বলে কোন খানকী-বাড়ি বেচে দেবে। সেটা কি ভাল হবে? তুমিও যাচ্ছ প্রিভুর চরণে ঠাঁই খুঁজতে—এও তাই। সঙ্গে নে যাবে, মেয়ে কি নাতনী বলে পরিচয় দেবে—এই পজ্জন্ত। তোমাদের সঙ্গে থাকলে গাড়িতে কেউ অত ভোলাবার রাস্তা পাবে না। আর আচ্ছয়? বলি তোমরাও তো কোথায় কার কাছে যাচ্ছ তাই জানো না, সে লোকটা বেঁচে আছে কিনা তারও ঠিকানা নেই—তোমাদেরও তো কোথাও উঠতে হবে? ধম্মশালা অনেক আছে শুনিছি—একজন বলেছে আমায় গুপীনাথের ঘেরায় মন্দিরের কাছেই

* একজনের মতো প্রসাদ। অন্ন রুটি লুচি ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন সব মিলিয়ে। অবশ্য কুঞ্জস্বামী বা স্বামিনীর সাধ্য-সামর্থ্য মতো।

ভাল দুটো ধর্মশালা আছে—অমনি কোথাও উঠে তোমাদের আচ্ছুর খুঁজতে হবে তো ? তিনদিন থাকতে দেয় শুনেছি, হাতে পায়ে ধরলে আর একদিন কোন্ না দেবে। তোমরা তোমাদের আস্তানার ব্যবস্থা দেখবে, সেও নিজের রাস্তা দেখবে। পায় ভালো, না পায় ভালো—তোমরা আর দায়িক থাকবে না।...যে কাঠ খেয়েছে সে আঙরা নাদবে এ তো শাস্তরের কথা। এই পথটুকু নে যাওয়া, তিন চার দিন সঙ্গে থাকতে দেওয়া—এই তো। সে যাচ্ছে নিজের খরচে টিকিট কি:—সেদিক দে তোমাদের কোন ঝক্কি থাকবে না।'

আরও কিছু বুলি খরচ ক'রে বাবাজীর সেবাদাসীকেও নরম ক'রে আনল মোহিনী। অগত্যা বাবাজীকেও রাজী হতে হ'ল।

দিনটাও মোহিনী জেনে এল। কথা রইল মোহিনীই স্টেশনে পৌঁছে দেবে যমুনাকে।

গহনার বাক্স এবং শাড়ি ইত্যাদি ট্রাঙ্কে ছিল সব। তার চাবি আগেই মোহিনীর কাছে জিম্মা ক'রে দিয়েছিল যমুনা। প্রথম অত কিছু তার মাথাতেই যায় নি। কি ঘটছে, কে কি বলছে কিছুই জানে না। তবে সে অবস্থা হরেকেষ্টর বোঝার কথা নয়—সে দিন তিনেক যেতেই একদিন ওর কাছে এসে বলেছিল, 'আমাকে—আমাকে পাঁচটা ট্যাকা দিতে পারেন ? বড্ড ঠ্যাকায় পড়ে গেছি। তিন দিন গোনা—তিন দিনের ভিত্‌রেই আমি শোধ দিয়ে দোব—এই আপনার দিব্যি বলছি !'

যমুনা তার কোন উত্তর দেয় নি, স্থির হয়ে মাটির দিকে চেয়ে বসেছিল পাথরের মতোই। হরেকেষ্ট তখনও ব্যাপার বোঝে নি, কাকুতি মিনতি ক'রেই যাচ্ছিল—'ও কি হচ্ছে কি ? বলি হচ্ছেটা কি তাই শুনি ! মেয়েটা আসতে না আসতে তাকে জ্বালাতে শুরু করেছ ! নেশার পয়সার জন্যে ! আবার দিব্যি দিলেশা গালা। হায়া পিত্তি বলে কি একটুকুনও থাকতে নেই !'

বলতে বলতে মোহিনী দোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই পালিয়ে গিছল হরেকেষ্ট। মোহিনী কাছে এসে চুপি চুপি বলেছিল, 'চাবিটা কোথাও লুকিয়ে রেখো ভাই, ও গাঁজাখোর বামুন সব পারে।'

তাতেও কোন সাড়া না পেতে মোহিনী আর দ্বিধা করে নি। বাক্সর মুখেই লেগে ছিল চাবিটা, যেমন কাকারা রেখে গেছেন, মোহিনী বাক্সর চাবি বন্ধ ক'রে টেনে দেখে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। যমুনা কোনদিনই খোঁজ করে নি। কাপড় জামা খুব ময়লা হলে কি ছিঁড়ে গেছে দেখলে নিজেই বার ক'রে দিত মোহিনী।

আগে আগে ময়লা হলে নিজেদের ময়লা কাপড় জামার সঙ্গে ক্ষার কাচায় টেনে চাপিয়ে দিত। মাস কতক পরে, কিছুটা সম্বিৎ ফিরে আসতে, নিজে কাচার চেষ্টা করতে গেছে দু-একবার, কিন্তু মোহিনী হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।

এই প্রথম—যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হতে—এক দুপুরবেলা নিজেই চাবিটা চেয়ে নিয়ে বাক্স খুলল যমুনা।

তখন হরেকেষ্টর আড্ডার সময়, ছেলেরাও সব বাইরে। মোহিনী খাওয়া-দাওয়া সেরে এই সময়টা গোয়াল তদারকে যায়—আজও পা বাড়িয়েছে—তাকে ডাকল যমুনা।

'দিদি, এক মিনিট শুনে যাবেন?'

'কী লো, কি আবার হ'ল? কি কি নিবি, এই সমিস্তে?' বলে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল মোহিনী।

যমুনা একেবারে গয়নার বাক্স আর চাবি—সব ওর পায়ের কাছে রেখে বলল, 'এইটে আপনি তুলে রাখুন কোথাও, ছেলে মানুষ করার তো খরচ আছে, ভারী কোন অসুখবিসুখও হতে পারে—কিম্বা ঐ—ঐ ওঁরা খরচের টাকা পাঠানোও বন্ধ করতে পারেন—সে যাই হোক, দরকার লাগবেই। যে দায় চাপালুম তার ভার কম নয়; সেটা এখন এইখানে এসে নানা লোকের কথায়বার্তায় আন্দাজ করতে পেরেছি কিছুটা—সে তুলনায় এ আর কতটুকু—কিন্তু, কিন্তু আপনি বুঝবেন—আর তো আমার কিছু নেই!'

মোহিনী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ধপাস ক'রে সেই খোয়া-ওঠা মেঝেতে বসে পড়ে বললে, 'সে আবার কি! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! এ আমি নিয়ে কি করব! ছেলে মানুষ করার ভার যখন নিয়েছি তখন আমি যা পারি যতটুকু পারি তা করবই—আমার ছেলেমেয়ে যেমন ভাবে মানুষ হচ্ছে তেমনিই হবে অবিশ্যি, তোর ছেলেকে তো আলাদা ভাবে মানুষ করতে পারব না। মানুষ হয়ত কোনটাই হবে না, বড় হবে এই পজ্জন্ত। তারপর—ওদের বরাত। গরিবের ছেলের মতো যদি খেটে খেতে পারে সেই ঢের, চোর ডাকাত ছ্যাচড় না হয়।…তার জন্যে এত গয়না কি হবে—আর আমি রাখবই বা কোথায়? তোর ছেলের জন্যে আলাদা ক'রে তুলে রাখব এখন কথাও দিতে পারব না। যে মনিষ্যি নিয়ে ঘর করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস—নেশার পয়সা না পেলে সিঁধ কাটতেও পারে।'

'তা হোক দিদি। তুমি যা করেছ তার ঋণ শোধ নয়—এ আমি নিজের গরজেই দিচ্ছি। তা ছাড়া আমিই বা কি করব!'

'এই ছ্যাখো, ক্ষেপীর কথা শুনলে গা-জ্বালা করে। একটা অজানা অচেনা দেশে

যাচ্ছিস, সঙ্গে কিছু না নিয়ে গেলে খাবি কি—থাকবি কোথায়—তার তো একটা উপায় রাখতে হবে! এ ছাড়া টাকা কিছু রইল—নগদ? থাকলেও সে কতই বা থাকবে!'

'তোরঙ্গে যা দেখেছি, উনিশ কুড়ি টাকা বোধ হয় তলায় পড়ে আছে। বোধ হয়—যা মনে হচ্ছে—ওখান থেকে, মানে শ্বশুরবাড়িতে কিছু নগদ টাকা পেয়েছিলুম মুখদেখানি, সে সব তাঁরা এই তোরঙ্গেই রেখে দিয়েছিলেন। তেমনিই চলে এসেছে। হয়ত বেশীই ছিল, ঠিক জানি না। মামা বোধ হয় বাক্স হাতড়ে দেখার সময় কিছু বার করেছিলেন—কে যেন একবার বললে। তবে বেশী আর দরকারই বা কি, টিকিট ভাড়া ওতে হবে না?'

'তা হবে। টিকিট ভাড়া দিয়েও কিছু থাকবে। কিন্তু সে আর কত। তাতে কদিন চলবে, গিয়েই তো কোন ব্যবস্থা হবে না—খাবি কি? তার মতো কিছু নিয়ে যা সঙ্গে।'

'ভিক্ষে ক'রে খাবো বলেই তো যাচ্ছি দিদি। প্রায়শ্চিত্ত করতেই তো যাওয়া।'

'ওমা—তাই বলে গিয়েই ভিক্ষেয় বেরুবি নাকি। এই চেহারা আর এই বয়েস। ক'দিন বাদই দে, ক'বেলা ভিক্ষে করবি, ক'দিন করতে পারবি? না না, ওসব পাগলামি ছাড়, কিছু সঙ্গে নে যা।'

যমুনা প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়ল, 'না দিদি, এক পয়সাও নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই আমার। একেবারে নিঃসম্বল হয়ে যেতে চাই···তা ছাড়া, তুমিই তো বলেছ, টাকা-পয়সা সঙ্গে থাকলে পথেঘাটে বিপদ বেশী।···না, গোপীবল্লভকে ভরসা ক'রে তাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি তো জানেন আমার পাপ কি, কতটুকু দায়ী আমি। তাঁর বিচারে যা হয়—সেটুকু প্রায়শ্চিত্ত করতেও কি তিনি দেবেন না!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মোহিনী বলে, 'জানি নে বাবা—কী তোর পাপ, আর কি তার প্রাচিত্তির! তোকে তো এই এতদিন দেখছি—দেখে তো মনে হয় না কোন পাপ অন্তত জান্তে করেছিস। আমরা তো এই জানি, গুরুজনরা যা বলেছেন—অজান্তে যা করা যায়, তাতে পাপ হয় না।···এক এক সময় মনে হয় তোর মাথায় ভূত চেপেছে, তাই এত জেদ ক'রে এমন অকূলে ভাসছিস!'

যমুনা আর কথা বাড়ায় না। চাবিটা জোর ক'রেই মোহিনীর হাতে গুঁজে দিয়ে দু হাতে শুধু ওর পা দুটো চেপে ধরে।

'ষাট, ষাট! পাগলী আমায় জালিয়ে খেলে একেবারে!'

বলতে বলতে তারও চোখে জল এসে যায়। সে যমুনাকে সেদিনের মতোই একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে।

তার চোখের জল আর চোখেই আবদ্ধ থাকে না। যমুনার বিপুল রুক্ষ কেশ-রাশির মধ্যে ঝরে পড়তে থাকে।

এবার যমুনারও বুঝি কাঠিন্যের দৃঢ়তার বাঁধ ভেঙে পড়ে এই যথার্থ সস্নেহ সহানুভূতির বন্যায়—তারও চোখে ধারা নামে, অনেক বেশী, বুকফাটা কান্নার মতোই কতকটা—সে জল মোহিনীর শুষ্ক শীর্ণ বুক ভাসিয়ে যেন প্লাবিত ক'রে দেয়…

কে জানে এ কান্না কিসের!

এ কি কৃতজ্ঞতার আবেগ—সর্বনাশের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অতল অন্তহীন গভীর অন্ধকারে যে প্রথম স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, যথার্থ সহানুভূতির তাপে শীতল শিলীভূত অন্তরটাকে সঞ্জীবিত রেখেছিল—বিপদে-আপদে সর্বদা রক্ষা ক'রে এসেছে এই দু'বছর—যার আন্তরিক মমতা ও কল্যাণ চিন্তাই দিকদিশাহীন অন্ধকারে একমাত্র আলোকরেখা ছিল—কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে কথঞ্চিৎ ঋণ স্বীকারের চেষ্টা—এ কী?…

অন্ধকারেই ছিল এতদিন। তবু তার মধ্যেও আশ্রয় একটা ছিল, ছিল অবলম্বন—বুঝি প্রশ্রয়ও। সেটুকুও সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে একেবারেই অকূলে ভাসতে যাচ্ছে। তার পরিণাম কি তাই বা কে জানে! এ কি সেই দুশ্চিন্তা?

এতদিনে সেও মোহিনীকে ভালবেসে ফেলেছিল। এ হয়ত সেই স্নেহাস্পদকে ছেড়ে যাওয়ারই বেদনা।

মোহিনী নবদ্বীপ স্টেশনের গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারল না।

পাড়ার এক মহিলাকে প্রায় হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়ে ছেলে মেয়ে আর 'গাঁজাখোর চক্কত্তী'কে শাসনে রাখার ভার দিয়ে ওদের সঙ্গে বর্ধমান পর্যন্ত গেল।

যমুনা ব্যস্ত হয়ে বলার চেষ্টা করল, 'এ কি করছেন দিদি—আপনার অসুমর কাজ। কখন ফিরতে পারবেন তার ঠিক নেই—'

'তুই থাম দিকি!' ধমক দিয়ে ওঠে মোহিনী। 'মেলা নবেলী কথা বলিস নি আমার কাছে, আমি অত বুঝি না। মরছি নিজের জ্বালায়, চিন্তার শেষ নেই, কোথায় কার হাতে গিয়ে পড়বি এই ভাবনায় আহার-নিদ্রে বন্ধ হতে বসেছে—তার ওপর তোর বকবকানি সহ্যি হয় না। দিদি বলে তো ডাকিস, আপনার দিদি হলে নিশ্চিন্তি থাকতে পারত!'

আবারও যমুনার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

হায় রে! আপনজনের চেহারা যদি দেখতে দিদি!

এই স্নেহ, এই ব্যাকুলতা, মঙ্গল-চিন্তা—কি আর কোথাও আর কারও কাছে আছে!

এর মধ্যেই সামান্য যেটুকু ঘি ছিল ঘরে তাতে কখানা পরোটা ভেজে আলুচচ্চড়ি ক'রে নিয়ে এসেছে; এনেছে তিনজনের মতোই, এরা না খেলে ও একা খাবে না কিছুতেই। আর এদের গরজেই এরা ওকে খাওয়াবার চেষ্টা করবে।···

গাড়ি ছাড়ল রাত্রে। এরা একটা ছোট কামরায় ভাল জায়গা পেয়ে গেল। আর দু-তিনজন যারা ছিল, তারাও তীর্থযাত্রী, বয়স্ক লোক সব। এক মহিলা ছিলেন খুবই বৃদ্ধা। মোহিনী কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল তবু।

গাড়ি ছাড়ল। চলেও গেল প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে, দূর দিগন্তে মিলিয়েও গেল একসময়।

অন্ধকার রাত। চারিদিকেই অন্ধকার। ইস্টিশানে তেলের আলো বেশির ভাগই এবার নিভিয়ে দেওয়া হবে। দু-একটা মাত্র জলবে। অন্য বড় যা গাড়ি—মেল গাড়ি না কি বলে—তা আসতে শুরু হবে আরও অনেক পরে। তখনই আবার আলোর মুখ দেখা যাবে।

তা হোক। নিজের জন্যে ভাবে না সে। ওর অত ভয়ডর নেই। অন্ধকারেও তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।

ঐ যে কচি মেয়েটা অকূল অন্ধকারে ভাসল, ভাবনা তার জন্যেই।

হে গোবিন্দ, হে শ্যামসুন্দর, মহাপ্রভু—অনেক দুঃখু দিয়েছ মেয়েটাকে, আবার যেন পাঁকে না পড়ে।

৯
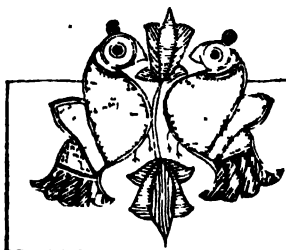
ধর্মশালায় তিন দিন থাকতে দেওয়া নিয়ম। একেবারে অন্যথা যে হয় না তা নয়। তবে সে অন্য ব্যাপার—মালিকপক্ষের মুনিমজীর চিঠি আনলে হয়। কিংবা আর যেটা, সেটা গোপন পথের ব্যবস্থা—তা এদের জানার কথা নয়।

প্রথম দিনটা তো কিছু কিছু দর্শনেই কেটে গেল। এটা অবশ্য-করণীয়। যেখানের যিনি অধীশ্বর—তাঁকে (বৃন্দাবনের ক্ষেত্রে "তাঁদের"—গোবিন্দ, মদন-মোহন, গোপীনাথ, এই তিন মূর্তি দর্শন হলে তবে ভগবানকে পূর্ণ দর্শন করা হয়) আগে না প্রণাম জানালে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় 'যেখানে যাবি থানাদারকে আগে সেলাম দিবি।'…এঁরা পৌঁচেছেন বেলায়, স্নান সেরে বেরোতেই দেরি হ'ল, এখানে ঠাকুররা ১১/১১॥টায় ভোগে বসেন, এক ঘণ্টা ধরে আহার করেন (!!), তার পর শুধু ভোগ-আরতির সময় ক'মিনিট খোলা থাকে—আবার সেই বিকেল চারটেয়। সুতরাং দিন তো কাটবেই।

পরের দিন ভোর হতেই নামদাস বাবাজী বেরিয়ে পড়লেন আশ্রয়ের খোঁজে। চোখে ভাল দেখেন না, নইলে হয়ত রাত থাকতেই বেরোতেন।

যিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানা পুরো মনে না থাকলেও পুরনো শহরে অষ্টসখী কুঞ্জের কাছে—এটুকু মনে ছিল। তাই জায়গাটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু খবর যা পেলেন তাতে একেবারে বসে পড়লেন। সেই কামদার মাত্র মাস কতক আগে 'রজ' পেয়েছেন—অর্থাৎ মারা গেছেন। এখন যাঁরা আছেন তাঁরা কিছু জানেন না, অজানা অচেনা লোককে জায়গা দিতে রাজী নন তাঁরা। উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলায় যেখানে এই কুঞ্জ-প্রতিষ্ঠাতার জমিদারী, সেখান থেকে হুকুমনামা নিয়ে এলে হতে পারে।

সারা দিন বাবাজী ফিরলেনও না, কিছু খাওয়াও হ'ল না। সন্ধ্যাবেলায় ফিরলেন প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে।

একটা সন্ধান পেয়েছেন। কোথায় গোয়ালিয়রের মহারাজার ঠাকুরবাড়ি আছে, তারই কাছাকাছি কোথাও নবদ্বীপের এক ভদ্রলোক থাকেন, কতকটা বানপ্রস্থ নিয়ে

আছেন—যদি সে বাড়ি চিনে বার করতে পারেন তো হয়ত একটা সুরাহা হতে পারে। নবদ্বীপের পুরনো অধিবাসী, দেখলে বাবাজীকে চিনতে পারবেন নিশ্চয়। কিন্তু রাতে কোথায় খুঁজবেন, চোখে ভাল দেখেন না। ক্লান্তও হয়ে পড়েছেন যৎপরোনাস্তি। স্বল্প পুঁজি ভাঙিয়ে কিছু পুরী কিনে এনেছেন, তাইতেই আজকের মতো জীবনরক্ষা করতে হবে।

কিন্তু এখন যেন নিজের চেয়েও তাঁর চিন্তা হচ্ছে যমুনার জন্যে। সে কাল দর্শনেও যায় নি, তেমনি আর কোথাও যাওয়া কি ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা—তারও কোন উদ্যোগ কি উদ্যম দেখা যাচ্ছে না। থুম হয়ে বসেই আছে, একভাবে।

এ কি ফ্যাঁসাদে তাদের ফেলল পূজুরীদি!···

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সোজাসুজি কথাটা পাড়তে বাধ্য হলেন।

এর রকমসকম আদৌ সুবিধের নয়। শেষ মুহূর্তে কি করবে কে জানে।

'দিদিভাই, সময় তো হয়ে এল—কালই তো শেষ দিন। পরশু ভোরের ভিত্‌রি ঘর ছাড়তে হবে। আমরা কোন ঠিকানা না পাই—জাতে বোষ্টম, ভিক্ষে করেই খাই— রাস্তাতেও কাটিয়ে দিতে পারি কটা দিন। সঙ্গেও কিছু এমন নেই যে চোর ডাকাত লাগবে পেছনে। কিন্তু তুমি? তুমি কি করবে, কোথায় যাবে—যা হোক একটা ব্যবস্থা করো এবার!'···

বাইরে কোন অস্থিরতা প্রকাশ না পেলেও মনে মনে চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে বৈকি। ভাবছে তো আকাশপাতাল, আজ সারা দিনই তো ভেবেছে।

মনের সুতীব্র আবেগ আর কোন দিকে চোখ মেলতে দেয় নি, এতদিন শুধুই ভেবেছে কবে বৃন্দাবন পৌঁছবে, তাঁর দেবতার সঙ্গে যোগাযোগ না হোক—হওয়া সম্ভবও নয়—তাঁর সান্নিধ্যে, কাছাকাছি থাকবে, এতেই অনেক শান্তি। খবরও হয়ত পাবে। গোপনে ঘোমটা দিয়ে রাত্রে আরতির সময় চোখের দেখা দেখে আসতে পারবে।

আর কোন তথ্য তলিয়ে ভাবে নি, ভাবার মতো অভিজ্ঞতাও ছিল না। সাধারণ বাস্তব জীবনের কিছুই তো সে প্রায় জানে না। কিসে কি হয়—কত কি অসুবিধা এ-সব কিছুই জানত না, বোঝবার কথা মনেও হয় নি।

'ভিক্ষে করব' 'মাধুকরী করব'···এসব শোনা কথা, তা-ই বলেছে। তার আগে কোথাও একটা আস্তানা ঠিক করতে হবে এই সহজ কথাটাও মনে পড়ে নি। কী ক'রে মাধুকরী শুরু করতে হয়, কি বলতে হয় তাই তো জানে না। এই বয়সের মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, চেহারা তার ভাল—এখন অপরের মুখে শুনছে—সেটাই তো সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সকলের মুখেই এ কথা শুনেছে, সুদর্শনা

তরুণীদের বিপদ পদে পদে। তা ছাড়া এদিক দিয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে নবদ্বীপেই।

এ দু দিন নয়—ট্রেন থেকেই চিন্তার শুরু হয়েছে।

তবু, সে অকূল চিন্তার মধ্যেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল মনে, এঁরা যদি একটা আশ্রয় পান, তার মধ্যেই কি একটু ঠাঁই দেবেন না? অন্তত দিনকতকের জন্যে? ওর অসহায় অবস্থা দেখলে হয়ত রাজী হবেন। তেমন হলে এঁদের সঙ্গেই মাধুকরীতে বেরোতে পারবে। অন্তত একটু ভেবে দেখার সময় পাবে।

সে আশাও তো নির্মূল হয়ে গেল।

বাবাজীরা রাস্তায় বাস করতে পারেন, তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না, সে যদি ওঁদের সঙ্গে থাকে তো তামাশা দেখতেই ভীড় জমে যাবে।

আরও একটা কথা এতদিন মাথায় যায় নি। প্রবল—সব-বিবেচনা-ভাসিয়ে-দেওয়া যথার্থ-অর্থে একাগ্র কামনায় সে কটা দিন কোন বাস্তব বুদ্ধির স্থান ছিল না মনে—এখন মনে হচ্ছে। এখানে আসার পর "বহুরাণী" বা বড় গোসাঁইয়ের বৌকে দেখতে বহু মহিলাই এসেছেন; আরতির সময়, প্রাভাতিক পূজোর সময় অনেক দিনই মন্দিরে থাকতে হয়েছে বহু কৌতুহলী চোখের দৃষ্টির সামনে। মাথায় কাপড় দেওয়া থাকত ঠিকই, তবে সে অর্ধ অবগুণ্ঠন, পুরাকালের বধূদের মতো দীর্ঘ ঘোমটা দেওয়ার রীতি ছিল না—তাতে কাজের অসুবিধা হয় বলেই। শ্যামসোহাগিনী তা নিয়ে রসিকতাও করেছেন অনেকদিন, 'আমরা যখন ছোট ছিলুম বৌমা, আমিও তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছি—দেখেছি সামনে এক হাত ঘোমটা দিতে গিয়ে পিঠের খানিকটা আদুড় হয়ে যেত। তখন তো জামা পরার অত রেওয়াজ ছিল না।'

তার ফলে সাধারণ দর্শনার্থী অনেকেই দেখেছে। বড় গোসাঁই-এর নবোঢ়া বধূ, দর্শনীয় তো বটেই। সে কৌতুহলেও অনেকে আসত ঐ সময়গুলোয় ভীড় ক'রে। পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়ালে কেউ না কেউ চিনতে পারবেই। দুজন-একজনও যদি চিনে ফেলে, সে কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না। তাতে যমুনার আরাধ্য দেবতারই কি অপমান নয়, তাঁকেই কি প্রচণ্ড আঘাত করা হবে না?

সমস্ত শ্বশুরকুলেরই অপমান, তাঁরা উপহাসাস্পদ হয়ে পড়বেন। তার চেয়ে গোপনে কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল।...

সারারাতই জেগে বসে কাটিয়ে দিল যমুনা।

চিন্তার কোন কূলকিনারা নেই। চিন্তাও তো অসংবদ্ধ, এলোমেলো।

আসলে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে, দিশাহারা।

মাঝে মাঝে মেঝেতে মাথা কোটা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না, স্থির হয়ে

বসে সম্ভাব্য উপায় ভাবা হয়ে ওঠে না।

অবশেষে একেবারে ভোরবেলায়—ওঁরা তখনই বেরিয়ে গেছেন গোয়ালিয়র মহারাজার ঠাকুরবাড়ির খোঁজে—মনে পড়ল রামরতিয়ার কথা।

রামরতিয়া?…রামরতিয়া!

দোষ কি!

তার সেই চরম দুর্দিনের আশ্বাসবাণী—স্নেহ ভালবাসায় মাখা কথাগুলো—যা তখন ভাল ক'রে শোনাও হয় নি, মাথাতেও যায় নি।

আসবার দিন বলেছিল সে, 'বহুরাণী, আমি অনেক লেড়কী দেখেছি এই বয়সে, মানুষ দেখে চিনতে পারি। তুমি কোন পাপ কাজ করতে পারো না, জেনেশুনে নিজের ইচ্ছেয় কিছু করো নি। কে এ কাজ করেছে তা বললে না, কিন্তু যে-ই করুক—জোর ক'রেই করেছে।'

তারপর চোখ মুছে বলেছিল, 'জানি না বহুরাণী দিদি, আউর কোই ভাল দিন আসবে কিনা—বিপদে পড়লে কিন্তু—যদি এখানে কোনদিন আসো, কোন তেমন দরকার হয় আমাকে ইয়াদ ক'রো। আমি জান দিয়েও তোমাকে বাঁচাব।'

তাই করবে?

তার শরণাপন্ন হবে?

কিন্তু সে যদি ওঁদের—ওঁকে খবর দেবার চেষ্টা করে? যদি ওর উপকার করতে গিয়ে অপকার ক'রে বসে? পেটে কথা থাকবে কি?

অবশ্য একবার বলেছিল সে, 'আমি বহুৎ বড় ঘরের কেচ্ছা জানি, তার যদি একটা কথাও বেরোয় তো তাদের মাথা হেঁট হবে, আমি কখনও কাউকে বলি না। আমার মরদকেও বলি না তেমন বুঝলে!'

চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করল রামরতিয়াকে।

ক'মাস তো ছিল ওর কাছে কাছে—না তেমন মানুষ নয়। যমুনাকে বিপদে ফেলবে না।

এক—

অনেক আশার মধ্যে একটা বড় আশঙ্কাও দেখা দেয়—যদি বেঁচে না থাকে!

এমন ভাবে কি তাকে লাঞ্ছিত করবেন গোপীবল্লভ! এমন নিঃস্ব দীনহীন হয়ে এসেছে তাঁর শরণ নিতে, প্রায়শ্চিত্ত করতে, সে সুযোগটুকুও দেবেন না!…

আশা ও আকাঙ্ক্ষায় কণ্টকিত হয়ে বসে রইল বাবাজীদের অপেক্ষায়।

বাবাজী যদি দয়া না করেন তো খবরই বা কে দেবে!

বাবাজী মশাইরা ফিরলেন দুপুরেরও পর।

ওঁদের মুখের চেহারা দেখে যমুনা বুঝল—তাঁদের সমস্যার একটা কিনারা হয়েছে কিছু।

ওঁরা বললেনও তাই। অনেক খোঁজখবর ক'রে সে ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়েছেন। ভদ্রলোক চিনতেও পেরেছেন কিন্তু তাঁর নিজের কোন উপায় ছিল না, স্থান ক'রে দেবার। ভদ্রলোক থাকেন একা, একটা ঘরভাড়া ক'রে। জপতপ ক'রে দিন কাটান। বাড়িটা বাঙালীরই, কিন্তু আগে ব্রজবাসীদের যাত্রীতোলা বাড়ি ছিল, খুপরি খুপরি ঘর, জানলার পাট বিশেষ নেই, লোহার শিক দেওয়া দরজা—আলো বাতাস বলতে ঐটুকু যা খোলা। বৃষ্টির সময় কোন কোন ঘরে তেরপলের পর্দা ফেলে ছাট আটকাতে হয়।

তবু—সে ঘরও খালি নেই আর। অনেক ব'লে কয়ে বাড়ির মালিকের হাত ধরে অনুনয় করতে সিঁড়ির নিচে একটু জায়গা হয়েছে। এখানের সিঁড়ি বেশির ভাগই সংকীর্ণ কিন্তু দৈবক্রমে সেখানে ভেতরদিকে গুহামতো একটা খাঁজও আছে। মালিকরা বুড়োবুড়ী, তাঁদেরও ঠাকুরঘরের মতো একটু আছে, সিংহাসনে গোবর্ধন শিলা, তার সঙ্গে পিতলের একটি বাল-গোপাল মূর্তি। নিত্য এক পূজারী এসে পুজো ক'রে যান।

সেই ঘরের পাশ দিয়েই সিঁড়ি উঠেছে। ঠাকুরঘরের পিছন বলে চোরাকুটুরীর মতো একট জায়গা বেরিয়েছে। সাধারণত ভেঙ্গোঢাকনা কিছু কিছু থাকে। বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কাকুতি-মিনতিতে সে জায়গাটুকু দিতে রাজী হয়েছেন, ভাড়া কিছু লাগবে না। ঘরেরই ভাড়া তো মাসিক দু' টাকা এক টাকা—ঐটুকুর জন্যে আর কি নেবেন! সাফসুতরো রাখবেন একটু—ঠাকুরঘরের লাগোয়া তো—এই শর্ত। পারেন তো ঠাকুরঘরের রোয়াকে বসে ভোরে কি সন্ধ্যায় একটু নামগান করবেন। তবে এও বলে দিয়েছেন, একতলার খুপরি মতো জায়গা—একটা তক্তাপোশ কিনে নিলে ভাল হয়। সাপের ভয় খুব একটা নেই, তবে চারদিকে ঠেঁটির জঙ্গল—বিচ্ছু আছে, বিছুট আছে।

সব বৃত্তান্ত খুলে বলে বাবাজী বললেন, 'আমরা কাল ভোরে যাব বলে এসেছি। বৈকালে উনি গিয়ে আশেপাশের বাজার থেকে দু'একটা জিনিস কিনে নেবেন। দু-জনে গিয়ে হাতাপিতি ক'রে সাফ ক'রে নেব, কতক্ষণই বা লাগবে!'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তবে তোমাকেও ভোরেই ঘর ছাড়তে হবে দিদি-ভাই। তার বেশী তো চৌকিদার থাকতে দেবে না। তুমি কি ঠিক করলে?

আমাদের যে খাঁজ সেখানে আমরা দু'জন থাকলে একটা বেড়াল থাকারও জায়গা থাকবে না। যদি কোন দিন রেঁধে খেতে হয়, চৌকি খাড়া ক'রে রেখে সেই জায়গায় আঙোটিতে রাঁধতে হবে। আমরা অবিশ্যি মাধুকরীই করব—অত অসুবিধে হবে না। তবু—'

এই অবধি বলে চুপ ক'রে যান। 'তবু'র জের টানেন না।

বোধহয় অনাবশ্যক বোধেই।

বৈষ্ণবী তখন ভাড়া করা আঙোটিতে রান্না চাপিয়েছেন। রান্না আর কি, ভাত তার সঙ্গে কিছু আনাজ সিদ্ধ। আলু ভাতে কি করলা ভাতে, বড় জোর ডাল ভাতে। এই খাওয়া। কাল তো পেটে ভাতই পড়ে নি।

বাবাজী ততক্ষণে তামাক ধরিয়েছেন, তামাক খেতে খেতেই সব খুলে বলে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন।

আর সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। যা করতে হবে, যা বলতে হবে—এখনই।

যমুনা একেবারে ওঁর পা চেপে ধরল।

'বাবাজী মশাই, একটা উপকার করবেন আমার? শেষ অবলম্বন এটা—নইলে যমুনায় গিয়ে গা ঢালা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না!'

'আরে আরে—করো কি দিদি! নাতনী বলি ঠিকই, তবু বামুনের মেয়ে, তায় সধবা—পায়ে হাত দিলে আমার অপরাধ হয় যে। কী করতে হবে তাই বলো না, যেটুকু সাধ্যে কুলোবে সেটুকু নিশ্চয় করব!'

রামরতিয়ার ঠিকানা সে বলেছিল কয়েকবারই—তবে তার কিছুই প্রায় মনে নেই। পুরনো শহরের বঙ্কুবিহারী মন্দিরের প্রায় উলটো দিকে একটা পথ গেছে—গলির মতোই—পাড়ার নামও বলেছিল, সেটা এখন ঠিকমত মনে করতে পারছে না, তবে কে এক পাণ্ডা লালুরাম ব্রজবাসীর নামটা মনে আছে, তার বাড়ির কাছেই থাকে। পিছন দিকটায়। বোধ হয় মণি-পাড়া, আবছা আবছা যা মনে পড়ছে।

সেই ঠিকানাই বুঝিয়ে দিল। ধর্মশালায় অন্য ঘরের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে বাবাজী তা লিখেও নিলেন।

'সেইখানে রামরতিয়া বলে একটি আধাবয়সী মেয়েছেলে থাকে—আঁতুড়ের ঝি, তেমন সাধারণ ঘরে প্রসবের বা দাইয়ের কাজও করে। খাপরার চালের বাড়ি, তবে তা নাকি ওর নিজস্ব। যদি তাকে খুঁজে বার করতে পারেন—বহুরাণী এসেছে এখানে, ধর্মশালায় আছে—বললেই সে ছুটে আসবে।'

বাবাজী মশাই বললেন, 'তার মানে দিদিমণি তুমি এখানকারই বৌ। নিশ্চয়

বড়ঘরে বে হয়েছিল !…ইস্ ! এই হাল তোমার !…যাবো ভাই, নিশ্চয়ই যাবো। মরে মরেও যাবো। তোমাকে একেবারে পথে বসিয়ে যেতে আমাদেরই কি মন চাইছে !'

খাওয়াদাওয়ার পরই রওনা দিলেন বাবাজী, তিনটে নাগাদ। এত রোদ মাথায় ক'রে যাওয়া—বৈষ্ণবী খুঁতখুঁত করছিলেন, উনি বুঝিয়ে দিলেন, দিনের আলোয় খোঁজ না করতে পারলে আজ আর হয়ে উঠবে না। প্রায় অন্ধকার শহর, মাঝে মাঝে দু-একটা তেলের আলো রাস্তায়। তাতে পথঘাট চেনা যায় না। উনি চোখেও ভাল দেখেন না, ওদিকটা বড় বড় গোল গোল এবড়ো-খেবড়ো পাথর দিয়ে পথ বাঁধানো, অন্ধকারে চলতেই পারবেন না।

পথের দিকটা জানতে গেলে ধর্মশালার চৌকিদারও বললেন, 'এ গোপীনাথ ঘেরা থেকে পুরনো শহর বাঁকে-বিহারীর মন্দির অনেকটা পথ, এত রোদে যাবেন ?'

'উপায় কি ?' সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।…

ফিরতে দেরি হ'ল অনেক। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল একসময়। বৈষ্ণবী চিন্তিত হবেন বৈকি ! আর সে চিন্তা স-রবও। বেশ একটু তিক্ততাও তাতে।

'বুড়োটা না হোঁচট খেয়ে পড়ে কোথাও পা ভাঙে। তা হলেই তো চিত্তির। ভিক্ষে ক'রে খেতে গেলে পা-টা থাকা চাই তো। যা রাস্তার ছিরি এখানকার। …কোথা থেকে এক উটকো হ্যাঙ্গাম ঘাড়ে চাপাল পূজুরিদি—বুড়োর জানটা বুঝি যায় !' ইত্যাদি ইত্যাদি—

এটা স্বাভাবিক। তবু অপমানে কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে যমুনার। এখনও এটা হয়—সেও দেহের স্বাভাবিক নিয়মে। প্রাণপণে নিজেকে বোঝায়—এই তো সবে প্রায়শ্চিত্ত শুরু। আরো তো ঢের সইতে হবে।

দেরির কারণ—বাবাজী মশাই হিন্দী বোঝেন না, এখানের লোকও, পাণ্ডা ছাড়া, বিশেষ কেউ বাংলা বোঝে না। ভাগ্যে বাঙালীর সংখ্যা কম নয়—তাই মাঝে মাঝে তাদের দেখা গেলে জিজ্ঞাসা করা যায়। তাও সবাই সব চেনে না। একজন বলে দিলেন, রেঠিয়া বাজার পার হয়েই সিধে পথ, 'বাঁকে-বেহারী' বললেই পথ দেখিয়ে দেবে সবাই।

অবশেষে সেখানে পৌছানো গেছে। মণি-পাড়াও দেখিয়ে দিয়েছে লোকে। তবে লালুরাম নাকি মারা গেছেন, তাঁর ভাই কাশীরাম আছেন। তিনি কোথায় বাইরে গিছলেন, তাতেও একটু দেরি হ'ল। অবশ্য তিনি এসেই বাবাজীর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে রামরতিয়ার খাপরার চালওলা বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছেন।

দিদিভাইয়ের সৌভাগ্যই বলতে হবে—গোবিন্দর কৃপা—রামরতিয়া বাড়িতেই ছিল।

বহুরাণী শব্দটা উচ্চারণ করার ওয়াস্তা—লাফিয়ে উঠেছে সে।

'বহুরাণী? আয়ী? হিঁয়া? কাঁহা জী?'

প্রশ্ন করেছে কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করে নি। বলতে বলতেই মরদকে ডেকে দ্রুত কি সব নির্দেশ দিয়ে—বোধহয় সংসার সামলাবার কি রসুই করবার ভার চাপিয়ে—প্রায় ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।...

'অনেক আগে আসতে পারত, প্রায় ছুটেই আসছিল', বাবাজী বললেন, 'অন্ধকার হয়ে গেছে, এবড়ো-খেবড়ো পাথর-বাঁধানো রাস্তা, পথ দেখতে পারব না বলতে থেমে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে এসেছে। তাও একরকম টানতে টানতেই এনেছে।'

এসব কথা শোনবার অবসর মিলল না।

তার আগেই 'বহুরাণী দিদি, তোমার এই হাল! তোমার এই চেহারা দেখতে হ'ল আমাকে!' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল রামরতিয়া।

১০
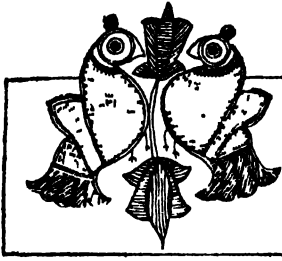
আকস্মিক আঘাতের বেদনা-উচ্ছ্বাস কমতে অবশ্য খুব বেশী দেরি হ'ল না। তার পরই রামরতিয়া কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল। সমস্যা কি সেটা বাবাজীর কাছে শুনে নিয়েছিল, কেন এসেছে তা সে নিজেই বুঝেছে, অনাবশ্যক প্রশ্ন করল না। চোখ মুছতে মুছতেই বাইরে কোথায় চলে গেল, মিনিট পনেরো কুড়ি পরে ফিরে এসে সোজা চলে গেল চৌকিদারের ঘরে। তাকে যা বলল—তা এখান থেকেই শোনা গেল, কারণ, ভাষাটা অনুনয়ের নয়, তর্জনের। এঁরা হিন্দী না বুঝলেও আভাসে মর্মার্থটা বুঝলেন, যমুনা তো কতকটা জেনেই গেছে এখানে মাসকতক বাস ক'রে।

রামরতিয়া বলল, 'ঐ সাত নম্বর ঘরের লেডকী হয়তো আরও দু-একদিন থাকতে পারে। কোন কানুন দেখিও না আমাকে, তুমি পয়সা নিয়ে অনেক যাত্রীকে বেশী-দিন থাকতে দাও, বাবুদের চিঠি নিয়ে এসেছে বলে—তা আমি জানি। আমি রাম-রতিয়া, এখানে সব বড় বড় গোসাঁইদের বাড়িই আমার যাতায়াত আছে—তোমার নোকৃরি ছুটিয়ে দেব, যদি বেশী কথা বলতে এসো। দরি দেওয়া তোমাদের আইনে আছে—দাও নি কেন? নওজয়ান লেডকী, ঐ বুড়ো মানুষ দুটো—মেঝেয় শুচ্ছে! খাটিয়ার ভাড়া নেওয়া তোমার হক, তোমার খাটিয়া—দরিরও ভাড়া নাও নাকি?'

অতঃপর বিজয়গর্বে একখানা মস্তবড় শতরঞ্চি নিয়ে সাত নম্বরে ফিরে এল। নিজেই দুপাট ক'রে বিছিয়ে দিলে, বললে, 'এখানেই শোবেন আপনারা। আর বহু-রাণী দিদি—তোমাকে কালকের দিনটা অন্তত এখানেই কাটাতে হবে, এই তো রাত হয়ে গেল, ঘর একটা ঠিক করতে হবে তো, নিরিবিলি জায়গা হবে, ভাড়া না লাগে দেখতে হবে—একটু সময় লাগবে বৈকি। তবে ভোর থেকেই ঘুরব আমি—আমার তো মনে হয় দুপুরের মধ্যেই একটা কিছু হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না।'

তারপর, যেতে গিয়ে আর একটা কথা মনে পড়ল, 'হ্যাঁ, রাধারমণের মন্দির থেকে তোমার জন্যে একটা পারস পাঠাবেন ওঁরা, এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে কেউ। একজনের মতোই দেবে, তবে যা নিয়মমতো দেবে তাতে তোমার দুবেলাই চলে যাবে। দশখানা রুটি, দু হাতা ভাত। তোমার যা খাওয়া দুবেলাতেও শেষ করতে

পারবে না। খাবার থালায় আনবে, তবে পাতাও আনবে, পাতাতে সাজিয়ে দিয়ে থালা নিয়ে চলে যাবে, তাকে কিছু দিতে হবে না, সে আমি আগাম দিয়ে এসেছি—ডাল ক্ষীর রসা* এগুলো কুল্লডে থাকবে। ভাল করে খেয়ো, এমন ভাবে শরীর নষ্ট করো না। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবেন, আমার কাছে যখন খবর পৌঁচেছে, তখন ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। মাধুকরীও করতে দেব না আমার জান থাকতে। তাই বলে আমি দেব কিছু এমন আস্পদ্দা আমার নেই।'

আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করার লোক সে নয়—তখনই চলে গেল, বলে গেল, 'দেখি, একটা জায়গা ঘুরেই যাই—যদি এখনই কিছু একটা ঠিক করতে পারি।'

বাবাজীরা তো হতবাক।

'দিদিভাই, এত তোমার প্রতাপ, এমন সব লোক তোমার হাতের এক তুড়িতে ছুটে আসে—আর তুমি এত আকাশপাতাল ভাবছিলে! কী জানি তোমার এমন কষ্ট করার কারণটা কি '…যাই হোক, তবে আমরাও তো এখানেই রইলুম গোয়ালিয়ার ঠাকুরবাড়ির পাশেই দ্বিজু সাণ্ডেলের বাড়ি, বললেই লোক দেখিয়ে দেবে। তেমন কিছু দরকার পড়লে—কিম্বা রাধারাণী না করুন অসুখ-বিসুখ হলে আমাদের খবর দিয়ো। যতটা পারি তা করব।'

পরের দিন বেলা ঠিক তিনটে বাজার একটু পরেই রামরতিয়া এসে হাজির।

ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেছে। মনের মতোই জায়গাটা। কোথায় তবু বুঝিয়ে বলল, সবটা যমুনার মাথায় যাবে কিনা তা না ভেবেই, গোবিন্দ মন্দিরের কোল দিয়ে যে পথটা সাক্ষী-গোপালের ভাঙা মন্দির বাঁয়ে আর বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি ডাইনে রেখে সোজা চলে গেছে গোপীনাথ ঘেরার দিকে—তা থেকেই দুইয়ের মাঝামাঝি আর একটা পথ বেরিয়েছে—চলে গেছে সোজা লালাবাবুর কুঞ্জ পর্যন্ত (এ-দিকটা লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পিছন পড়ে), সেখান থেকে বেঁকে যমুনার ধার ধরে গোপেশ্বরের দিকে—তার মাঝামাঝি একটা ছোট মন্দিরও পড়ে—বলে কিশোরীমোহনের কুঞ্জ—তারই প্রায় উলটো দিকে—একটু পাশ ক'রে—এক বিরাট বাড়ি। কোন্ এক বিকানীর না যোধপুরওয়ালা লালার বাড়ি, এককালে খুব আসত লোকলস্কর নিয়ে—এখন কেউ বড় আসে না। বুড়ো কর্তারা সব চলে গেছে

---

* রসা—অর্থাৎ নিরামিষ ঝোল। ঝোল বলতে মাছের ঝোল মাংসের ঝোল মনে আসে, তাই বৈষ্ণবরা রসা বলেন।

—ছোটদের এদিকে মন নেই। অবশ্য এরা কেউ মন্দির-টন্দির করেন নি—মানে রাধাকৃষ্ণর মন্দির—ভেতর দিকে একটা ছোট ঘরে মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা আছে—তাঁর পূজারীই বাড়ির চৌকিদার।

তার সঙ্গেই কথা হয়েছে। দশ বারো টাকা মাইনে দেয়, তাতেই মহাবীরের সেবাও করতে হয়। তবে বলা আছে, যদি কোন ভাল ভাড়াটে পায়—দু'চার দিনের জন্যে তীর্থ করতে এসেছে—তাকে ভাড়া দিতে পারে। আর তা থেকে দু'পাঁচ টাকা নাও, ক্ষতি নেই। কিন্তু কিছু টাকা রাখতে হবে—বাড়ি চুনকাম মেরামত এ সব তো আছে। তবে সে বিশেষ হয় না। ঐ হাম্‌দো বাড়িতে কে আসবে বলো। এক ঝুলনে কি হোলির সময় একটু ভীড় হয়—তবে সে দেহাতী গাঁওয়ার যাত্রীই বেশী। এরা পথেই দিন কাটায়—ধরমশালায় জায়গা না পেলে। লঙ্কাবাটা মাখানো শুখা রুটি আনে টিন ভর্তি ক'রে। তাই খেয়েই কটা দিন কাটিয়ে দেয়। ঝুলনে বাঙালী আসে অনেক। তবে তারা এমন বাড়িতে পয়সা দিয়ে কেউ থাকতে চায় না। আত্মীয়দের ঠাকুরবাড়ি কোনটা না কোনটার খোঁজ-খবর নিয়ে আসে, নইলে পাণ্ডাদের যাত্রী-তোলা ঠাকুরবাড়ি তো আছেই। নয় তো ধর্মশালা। স্থায়ী ভাড়াটে মেলে—পাঁচ সাত টাকায় হয়ত তিন-চারখানা ঘর নিয়ে থাকবে—তাতে মালিকদের মত নেই।

আরও বলল, 'জায়গাটা অবশ্য বলতে গেলে হাটের মধ্যে। চারদিকেই বড় বড় মন্দির। ওদিকে স্বয়ং গোবিন্দজী, এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র—এ বাড়ির পিছনেই ব্রহ্মকুণ্ড—বলে ব্রহ্মার চোখের জলে কুণ্ড হয়ে গেছে, এখন শীতে গরমে তলায় একটু সবুজ রঙের থকথকে জল থাকে, পাঁকই বেশী, বড় বড় ব্যাঙ লাফায়, তাতেই তেলেঙ্গীরা ডুব দিয়ে চান করে—ওদের এত পুণ্যির লোভ। এই ব্রহ্মকুণ্ডরই ওধারে রঙজীর মন্দির, ঐ যে যেখানে বলে সোনার তালগাছ, মন্দির তো বিরাট—একটা দেওয়ালই ইদিকে, সামনেই গোবিন্দজী। কাজেই লোক চলাচল খুব। কাছেই গৌর ডাক্তার, অসুখ-বিসুখে ডাকলেই আসবেন। তবু, তুমি তো আর বেরোচ্ছ না কোথাও। তা ছাড়া সামনের ঘরে পূজারীজি থাকেন—ওঁকে বলে আমি একটা ভেতরদিকের ঘরই ব্যবস্থা করেছি। তবে অন্ধকার নয়, বড় মাঝারি ঘর, বড় জানলাও আছে একটা। ভাড়া লাগবে না এক পয়সাও। চৌকিদারই বলো আর পূজারীই বলো—ভাল মানুষ লোক, অতি ভাল মানুষ—পূজো ধ্যান জপ নিয়ে থাকেন। তাঁর আশ্রয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে।'

শুধু ঘরই নয়। গেরস্থালী পেতে দেওয়া যাকে বলে তাই ক'রে ফেলল রামরতিয়া।

ভারী একটা তক্তাপোশ ঘরে ছিলই, সেটা সরিয়ে নিলেন না পূজারীজি— রাখবেনই বা কোথায়? সরাবে কে?—বরং একটা তোশক দিতে চাইছিলেন, যমুনা কিছুতেই রাজী হ'ল না। রামরতিয়ার দু হাত ধরে মিনতি ক'রেই বলল, 'দিদি, তোমাকে দিদিই বলছি, আর জন্মে আমার আপন দিদি ছিলে—কি মা—নিজের দিদিও এতটা করে না—আমাকে কষ্ট করতে দাও। কষ্ট করতেই এসেছি, প্রায়শ্চিত্ত করতে। আরামে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। জীবনটা নিজে নষ্ট করব না, তবে তপস্যাই করব—যাতে সব পাপ ধুয়ে মুছে গিয়ে সামনের জন্মে ওঁকে আবার পাই।'

রামরতিয়া ওর মনের ভাব বুঝল, তারও দু চোখ জলে ভরে এসেছে। সে আর পীড়াপীড়ি করল না।

জীবনধারণের অন্য ব্যবস্থাগুলোয় মন দিল। কষ্ট যতই করতে চাক না কেন, শুধু প্রাণধারণের জন্যে, দেহটা রাখার জন্যেই অনেক জিনিস দরকার। যমুনার সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। ওকেই সব ভাবতে হবে।

এখানে মাড়োয়ারীরা পরকালের হিসেবটা ঠিক রাখার জন্যে 'নাম' কেনেন পয়সা দিয়ে। দুটো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হয়েছে। সকালে ছ'টা থেকে ন'টা, বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা—নামগান করতে হবে। গান বলতে গান নয়—যাকে তারকব্রহ্ম নাম বলে তাই—'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' যারাই আসুক, বিধবা বা অনাথ মেয়েদের জন্যেই এটা করা, তারা সকালে একটা ক'রে সিধা পাবে—আটা, চাল, ডাল, নুন এই সব আর বিকেলে ছটা ক'রে পয়সা। একটা পেট ভাল ভাবেই চলে যায়। যাঁরা নিয়মিত এই আসরে নাম করেন তাঁদের বছরে একপ্রস্থ জামা-কাপড়ও দেওয়া হয়।

তবে যমুনার পক্ষে এ ভাবে দুবেলা নাম গাইতে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ যাকে বলে 'ডান হাতের ব্যাপার' সেটা আগে ঠিক করা দরকার। এই দুইয়ের একটা প্রতিষ্ঠানের কামদারকে ধরে সে ব্যবস্থাও করেছে এর ভেতরেই (তাঁর ভাদ্রবৌয়ের সঙ্গে একটা গোলমাল হয়ে পড়েছিল, রামরতিয়াই নিঃশব্দে সে কাজ সেরে দিয়েছে—মায় সদ্যোজাত শিশুকে বিক্রী করার কাজটাও)। মাসে মাসে পাঁচ সের আটা, এক সের চাল, আর কিছু ডাল নুন তেল পৌঁছে যাবে এখানে। এক শেঠানী এক জোড়া শাড়ি ও দুটো সেমিজ দিয়েছেন, এক জোড়া গামছা। ছ মাস অন্তর এও আসবে, নিয়মিত। রামরতিয়া কিছু বর্তনও এনেছিল চেয়ে-চিন্তে। যমুনা তা থেকে একটা তাওয়া বা চাটু, আটা মাখার জন্য কানা-উঁচু পিতলের থালা, একটা চিমটে আর দুটো ঘটি ছাড়া কিছু নেয় নি। সে শুকনো রুটি নুন দিয়ে খাবে, তার কিছু দরকার নেই। রামরতিয়া বকাঝকা ক'রে ঝগড়া ক'রে একটা ছোট কড়া রেখে গেল।

'অব্যেস নেই, পেটের অসুখে মরবে যে! এটা রইল ডাল সেদ্ধ ক'রে নিতে পারবে কিম্বা ভাত আলুসেদ্ধ। তাতে তোমার সন্ন্যেস নষ্ট হবে না।'*

আর যা দরকার, বালতি একটা পূজারীজি দিয়েছেন ঘর থেকে, রামরতিয়া দুটো জলের কলসী কিনে দিয়েছে। জ্বালানী কাঠ আর ঘসি বা ঘুঁটে ওর নিজের বাড়ি যথেষ্ট আছে—মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা পৌঁছে দিয়ে যাবে।

মোটামুটি জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে গেল। যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে চায়, তপস্যা করতে চায়—তার কাছে এও বিলাস একরকম।

তবে এও যেন মনে হয় গোপীবল্লভেরই কৃপা। সত্যি সত্যিই পথে বেরিয়ে আধখানা কি সিকিখানা ক'রে রুটি ভিক্ষে করতে হ'ল না—লজ্জার চেয়ে ভয় বেশী—চেনা লোক কেউ দেখে ফেললে তার শ্বশুরকুলেরই—স্বামী-শাশুড়ির অপমানের চূড়ান্ত হবে—এই অপরাধ থেকে তিনি বাঁচিয়ে দিলেন।

কিন্তু তপস্যাই হোক আর প্রায়শ্চিত্তই হোক—এটা একটা ধারণা, এও এক রকমের আত্মপ্রবঞ্চনা।

আসলে কামনা। প্রচলিত পুরাতন বোধের চেয়ে মানুষের কাম বা কামনা—দেহজ আকর্ষণের শক্তি অনেক বেশী। এটা এমন অনস্বীকার্য সত্য যে শাস্ত্র-গ্রন্থকাররাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। নইলে রামায়ণ মহাভারত পুরাণে মুনি-ঋষিদের তপস্যাভ্রষ্ট হওয়ার, পদস্খলনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকত না। এ সব কাহিনী এক রকমের শিক্ষাই, এর পরও পরাশর বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাব নষ্ট হয় নি, তাঁদের ঋষিত্ব যায় নি। শুকদেব ও নারদের মহিমা এত ক'রে কীর্তন করা হয়েছে এই সত্যের ব্যতিক্রম বলেই।

আর এই শক্তি স্বীকার ক'রে নিয়েই পরবর্তীকালে (তখনকার দিনে যা আধুনিক হাওয়া তাকে ঠেকাতে) স্মৃতিশাস্ত্রের এত সব কড়া অনুশাসন মহিলাদের জন্যে, কামনায় বাঁধ দেবার জন্যে নির্জলা একাদশী প্রভৃতির কঠোর ব্যবস্থা।

যমুনাও এ স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে নয়। বস্তুত সেই উন্মত্ত অধীর কামনাই—

* সময়টা এখনকার কাল নয়। আন্দাজ ১৯২১/২২ সালের কথা। তখন বৃন্দাবনে টাকায় ষোল সের গম পাওয়া যেত, তের ছটাক ঘি, আট সের ভাল জাল দেওয়া দুধ, গ্রাম থেকে যে ঘাঁটা, অর্থাৎ মোষ গরুর দুধ ও জল মেশানো—দুধ, বিক্রী করতে আসতো ষোল সের টাকায়। চার আনা সের রাবড়ি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ দাম ছিল।

প্রেম বলা যায় কি ? সে অবসর মিলল কোথায় ?—সকল বাস্তব বুদ্ধি লোপ ক'রে এমন পাগলের মতো টেনে এনেছে তাকে, অকূলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করেছে—এক রকম—সে কামনা কি এই জীবনযাত্রার কঠোরতা বা কৃচ্ছ্রসাধনেই সংযত করা যায় ! সামান্য দৈহিক নিগ্রহে এ শ্রেণীর উন্মত্ত আবেগকে বাঁধ দেওয়া যায় না।

বহু বিনিদ্র রজনী কাটার পর একদিন রামরতিয়ার দুটো হাত চেপে ধরে, 'দিদি একবার—একবার তাঁকে দেখাতে পারো না—দূর থেকে ?'

এই বাঁধ ভাঙা অস্থিরতার আরো কারণ ঘটেছে এখানে এসে, ও-বাড়ির খবর পেয়ে।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল—কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে অবশ্য, জিভে যেন জড়িয়ে যায় শব্দগুলো, না জানি কী প্রচণ্ড আঘাত অপেক্ষা করছে এর উত্তরের মধ্যে—'ওখানের নতুন বড় বৌরাণী—মানে, ইয়ে, ওঁর নতুন স্ত্রী কেমন দেখতে হয়েছে ?'

'হায় কপাল !' সত্যিই কপালে চাপড় মেরে বলেছিল রামরতিয়া, 'বড় গোসাঁই দাদা কি তেমনি লোক ! হায় হায় ! তুমি মানুষ চিনলে না। অবিশ্যি চেনবার অবসরই বা মিলল কদিন।...আরে, বিয়ে করলে তো নতুন বৌরাণী, আসলে যে মানুষটাই এলো না—সে কেমন দেখতে বলব কি ক'রে !'

বুকের মধ্যে এ কি প্রচণ্ড উত্তাল আলোড়ন !

এ কি আনন্দের ? এ কি দুঃখের ? অধিকতর দুঃখের ? মনে হচ্ছে বুকটা বুঝি ভেঙে পিষে যাবে।—নিজেকেই এর জন্যে দায়ী মনে করে।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠে স্বর খুঁজে পায় যমুনা।

'উনি—উনি এখনও বিয়ে করেন নি আর ? সে কি ! মা কিছু বললেন না ?'

'বলেন নি আবার ! ভেবেছিলেন কিছু বলতেও হবে না। ওঁর ওপর ওখানে কেউ কোন কথা বলবে না। বলে নি তো কখনও। মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে—এখানকারই এক বাঙালী ঘরের মেয়ে—কিন্তু উনি কিছু বলার আগে বড়দা নিজে থেকেই বললেন। মার ঘরে গিয়ে ডেকে বললেন, "এ চেষ্টা করো না মা। আর বিয়ে আমি করব না। কপালে সুখ কি ঘর-সংসার লেখা থাকলে এমন ঘটনা ঘটবেই বা কেন। ঠাকুর আমাকে সংসারী করতে চান না।...তুমি বরং ছোট ভাইয়ের বিয়ে দাও।" বড়মা অনেক চেষ্টা করেছেন, সে না-কে হ্যাঁ করাতে পারেন নি। এই প্রথম হার মানলেন বড়মা।'

একটু থেমে রামরতিয়া আবার বলে, 'তবে বড়মাও তেমনি। এখনও হাল ছাড়েন নি। ছোটদাদা-গোসাঁইয়ের বিয়েও হয় নি এখনও। তবে সে-ই এখন মন্দিরের সেবার নিয়ম-রীত্, সম্পত্তির হিসেবনিকেশ বুঝে নিতে শুরু করেছে। এবার বিয়ে দিতেই

হবে।…সেই মেয়েই হয়ত আসবে—কি অন্য মেয়ে আনবেন বড়মা—তা জানি না।'

'তা উনি—উনি বাড়িতে থাকেন তো? সন্ন্যাসী হবেন না তো?'

'ও মা, তুমি তো শুনে গেছ এখানে থাকতেই বহুরাণী দিদি, উনি তো সেই দিন থেকেই বাগানবাড়িতে বাস করছেন। ঠাকুর যখন যান হোলির সময় তখন একটু ভীড় হৈ-হল্লা হয়। তারপর তো চুপচাপ, নির্জন। উনি ওঁর সেই ছোট ঘরেই মন্দির-মতো ক'রে নিয়েছেন—রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত জপতপ সাধন-ভজন করেন শুনেছি। দারোয়ান যা বলে। প্রসাদ এখান থেকে যায়।'

'উনি—উনি মন্দিরে আসেন না একেবারে?' প্রায় চাপা কান্নার মতো শোনায় ওর গলাটা।

'তা আসবেন না কেন? প্রতিদিনই আসেন। কোনদিন একেবারে ভোরে ভোরে এসে মঙ্গল আরতি করেন, ঠাকুরের ঘুম ভাঙান—কোনদিন একটু বেলায় এসে পূজোর সময় বসে থাকেন। তাছাড়া ছোট ভাইকে শাস্তর পড়ান যে রোজ। যেদিন ভোগ-আরতি সারেন সেদিন এখান থেকেই খেয়ে যান মার সামনে বসে। রাত্তিরেও আসেন দু'একদিন ছাড়া, একেবারে শয়ন আরতি সেরে যান। বৈশাখ মাসে বৈকালীর সময় উনি এসে ঠাকুরকে তোলেন ঝারা থেকে, বৈকালী দেন। সে সব দিন আর রাতে আসেন না। নইলে শয়ন দেওয়া হয়ে গেলে সামান্য একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে সোজা বাগানে চলে যান। আগে দারোয়ান আলো নিয়ে সঙ্গে যেত—এখন ছাইকেল কিনেছেন, দু'চাকার গাড়ি—তাতেই চলে যান।'

এই কথাগুলো শোনবার পর আরও ছটফট করেছে কদিন। অনুশোচনায়, মানসিক অস্থিরতায়—যা চিন্তাকেও বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়, নিজের একান্ত মন্দভাগ্যের জন্য মর্মান্তিক দুঃখে—হয়ত বা ঈষৎ সুখেও। কি জিনিস হারাল, ওর জন্যে সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল মানুষটার, সংসারটাই যেন ছারখার হয়ে গেল এই দুঃখে, অনুতাপে, ঈশ্বরের প্রতি অদৃষ্ট-বিধাতার প্রতি, অনুযোগে ও তিক্ততায়,—আবার সে মানুষকে আর কোন মেয়ে ছোঁয় নি, সে ছুঁতে দেয় নি এইটুকু সান্ত্বনা। যদিও সে আনন্দের ধারে কাছে পৌঁছবার কোন আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই—তবু এ যে পরম নিশ্চিন্ততা, তা আর কেউ বুঝবে না। কায়াহীন দেহসান্নিধ্য এক রকমের।

তার ফলে এত বিপরীতমুখী মানসিক আবেগের উন্মত্ততা যেন আর সহ্য করতে না পেরেই ঐ অনুরোধ বা আকুতি বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে।

'একবার—একবারটি দেখাতে পারো না?'

কথাটা শোনার পর কিছুক্ষণ রামরতিয়ার—যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলে বাক্য-স্ফূর্তি

হ'ল না।

গালে হাত দিয়ে বসেই রইল হাঁ ক'রে—যমুনার মুখের দিকে চেয়ে।

তারপর বললে, 'তুমি ওখানে যাবে? বড়গোসাঁই দাদাকে দেখতে? তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না ভাবছ? দু'একজন না পারুক, বাকী সবাই চিনবে।'

'যদি খুব বড় ঘোমটা দিয়ে যাই?'

'সেও তো নজরে পড়বে। এতবড় ঘোমটা তো কেউ দেয় না মন্দিরে এসে।'

অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হয় যমুনাকে!

কিন্তু ওর মুখের যে করুণ চেহারা দাঁড়ায় তা সে নিজে না বুঝুক—রামরতিয়া লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। এ যে কী আর কতটা সহ্য করছে মেয়েটা—সে-ই বোঝে। এও কম কষ্ট করছে না। এ যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় তো প্রায়শ্চিত্ত আর কাকে বলে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, 'দেখি, কাল তোমাকে বলব। কাশীরাম ব্রজবাসীর একদল যাত্রী এসেছে—বাঙালদেশ না কি বলে সেইখান থেকে—তাদের সব অমনি ঘোমটা, রাজপুতানীদের চেয়েও বেশী। এদিকে এক ফেরতায় কাপড় পরা, গায়ে জামা নেই—আদ্ধেকটা ন্যাংটা বলতে গেলে—সামনে একগলা ঘোমটা। পিঠটা বেরিয়ে থাকে সে হুঁশ নেই, মুখটা ঢাকা চাই। দলে অনেক মেয়েছেলে। কাশীরামকে জপিয়ে যদি রাজী করাতে পারি—রাত্রে শয়ন-আরতি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গোপীবল্লভের—তাহলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব অন্ধকারে, ওরা যখন ঢুকবে তুমি ঐ দলে ভীড়ে যেও। অবিশ্যি রাতে উনিই আরতি করবেন কিনা সেটা জেনে নেবো। ভোরে এলে আর রাত পর্যন্ত থাকেন না। তবে কিন্তু আরতি শেষ হবার আগে চলে এসো—নইলে জানাজানি হতে পারে। আরতির সময় সবাই সেদিকে চেয়ে থাকে, শেষ হলে চার দিকে চাইবে। তা ছাড়া আমাকে দেখা গেলে তো কথাই নেই।'

কাশীরাম রাজী হয়েছিলেন। নিজে যান নি, ছোট আইবুড়ো বোন ত্রিবেণীকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যাত্রীদের। রামরতিয়াও সবাই হুড়মুড় ক'রে ঢোকবার মুখে যমুনাকে ঠেলে দিয়েছিল।

হ্যাঁ। আজ বড় গোসাঁই আরতি করছেন।

চেনার কোন অসুবিধে নেই, ঐ দীর্ঘ গৌর কান্তি, ঐ হাত নাড়ার ভঙ্গী, তদ্‌গত ভাবে আরতি করা—সবই ওর চেনা। প্রতিটি ভঙ্গী, নিঃশ্বাসের সঙ্গে পিঠটা

ফুলে ফুলে ওঠা, হাত ওপরে ওঠার সময় পাল্কার পেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠা—সব, সবই পরিচিত।

ঝাড়প্রদীপের আরতি শেষ ক'রে ফিরলেন এদিকে, আগন্তুক দেবতাদের উদ্দেশে। সমাগত ভক্তদেব দিকেও দীপ দেখালেন একবার—এ নিয়ম ওঁরই প্রবর্তন, ভক্তরা দেবতাদের কম নন, বড় গোসাঁই বলেন।

সেই মুখ, প্রশান্ত সুন্দর। তেমনিই আছে। কেবল—মনে হ'ল, চকিতে দেখা তো, প্রশস্ত ললাটে সে মসৃণতা আর নেই, অগভীর হলেও দু-তিনটি রেখা দেখা দিয়েছে।

সীমাহীন দুঃখ, লজ্জা ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

কিন্তু পিঠ। এইটেই যেন সবচেয়ে প্রিয় যমুনার। এতখানি চওড়া পিঠ জ্ঞানত ও কারও দেখে নি। চওড়া বুকের মাপেই চওড়া পিঠ—সবটাই প্রায় অনাবৃত। তেমনিই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে মুক্তোর মতো—যা ঐ ক মাস দেখেছে সে মুগ্ধনেত্রে।

বড় লোভ হয়। বড় বিষম লোভ—ঐ পিঠের খাঁজে যদি একটিবার মুখটা গুঁজে দিতে পারত—

পাণিশঙ্খের আরতিও শেষ হ'ল। এবার মুখ মোছানো চলছে। এর পরই চামরের ব্যজন।

যমুনা হয়ত রামরতিয়ার সব সতর্কবাণী, হুঁশিয়ারী ভুলে দাঁড়িয়েই থাকত মুগ্ধ চোখে চেয়ে—হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল সহদর্শনার্থীরা দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করছেন, তার মানে এখনই চলে যাবেন।

তারও সম্বিৎ ফিরল। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল সে।

কিন্তু—কোথায় এল, কে কোথায়, কোন্ দিকে যাবার কথা—তার কোন হুঁশই ছিল না আর, মাতালের মতো পা টলছে, তাতে যেন বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। রামরতিয়া এসে জোরে বাহুমূলটা চেপে না ধরলে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেত বোধ হয়।

নিঃশব্দে···বেহুঁশের মতোই ঘরে ফিরল যমুনা।

রামরতিয়াও মেয়েছেলে, এ মেয়েটাকেও সে ভালবেসে ফেলেছে—সে বুঝল। কোন প্রশ্নই করল না। 'কেমন দেখলে বহুরাণীদিদি' এই ধরনের সাধারণ প্রশ্নও এক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক হবে বুঝে, ওকে ঘরে পৌঁছে নিঃশব্দেই বেরিয়ে চলে এল।

১১
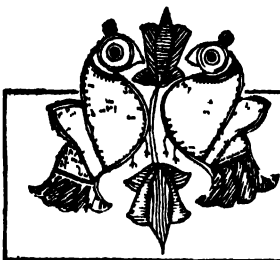
মোহিনীই ঠিক বলেছিল, 'ওলো, সে আরও যন্ত্রণা। কাছাকাছি থাকবি, হয়তো দেখতেও পাবি—তবু তাকে কাছে পাবি না, ছুঁতে পাবি না—তাতে দেখবি জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিস। মিছিমিছি সব জেনেশুনে কেন তুঁষের আগুনে পুড়তে যাওয়া।'

বলেছিল বারবারই, তবে তখন বর্তমান আকাঙ্ক্ষাটাই এত প্রবল যে এসব নিয়ে চিন্তা করার অবস্থা নয় যমুনার। ভবিষ্যৎ তখন অনেক দূরে—বর্তমান জীবনের নরক-কুণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়া, তাঁর কাছাকাছি থাকা—এটুকুও তখন সুদূর এবং সুদুর্লভ বোধ হয়েছিল।

আজ বুঝছে, এখন বুঝছে।

যন্ত্রণা হবে হয়ত, সেটুকু বোঝার মতো—বয়স না হোক—অভিজ্ঞতা হয়ে ছিল। তবু সে যন্ত্রণা যে এমন নিদারুণ, এমন তীব্র, দেহে ও মনে এমন সর্বক্ষণ আগুন জ্বালাতে পারে—শুধু একটা মানুষকে ছোঁবার জন্যে, গায়ে হাত দেবার জন্যে, তার দেহের গন্ধর জন্যে—যে মানুষটা সেদিন মাত্র ক'হাত দূরেই ছিল—তা অনুভব করার মতো অভিজ্ঞতা হয় নি।

এ জ্বালায় নিজে না জ্বললে অনুমান করা যায় না—পরে যতই বুঝিযে বলুক—অনুভব করা যায় না।

তুঁষের আগুন। ঠিকই বলেছিল মোহিনীদি।

আজ মনে হয়—সেও বোধহয় এত যন্ত্রণাদায়ক নয়।...

অতৃপ্ত দৈহিক কামনায় রাত্রে মাঝে মাঝেই উঠে গায়ে জল ঢেলে আসে। মেঝেয় মাথা খোঁড়ে।

এক এক সময় পাথরের মেঝেতে মুখ ঘষে রক্তাক্ত ক'রে ফেলে।

তবু চোখে তন্দ্রার আভাস মাত্র আসে না—রাতের পর রাত।

একেবারে যখন অসহ্য মনে হয়—ভাবে গায়ে তেল ঢেলে পুড়ে মরবে—আসল আগুনের জ্বালায় এ মানসিক দাহের সমাপ্তি ঘটিয়ে—আবার পরক্ষণেই শিউরে ওঠে।

আরও কেলেঙ্কারী, আরও লজ্জায় ফেলবে তাঁকে, তাঁর পরিবারকে।

অমন দেবীর মতো শাশুড়িকে। ছিঃ!…

এক-একবার, অনেকদিন আগে শোনা কীর্তনের একটা লাইন মনে পড়ে।

রামকমল বলে বিখ্যাত এক কীর্তনিয়া শান্তিপুরে গিছলেন, গান গাইতে।

পালাটা ছিল বোধহয় 'মান'।

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা

হরিবৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা—"

অন্ত লাইন অত মনে নেই। শুধু মনে আছে কুসুমশয্যায় শুইয়ে সর্বাঙ্গে চন্দন লেপেও সখীরা সে দাহ নেভাতে পারেন নি।

আজ সে বুঝছে শ্রীমতীর সে দহনের তীব্রতা।

অবশেষে, আবারও তাকে রক্ষা করে রামরতিয়াই।

সে পাকা অভিজ্ঞ লোক। পাথরে মুখ ঘষার, কপাল ঠোকার চিহ্ন দেখে বুঝতে বাকী থাকে না তার কারণটা।

সে এসব ব্যাপারে অনাবশ্যক প্রশ্নও করে না। তবে তার কষ্টও হয়।

একদিন আর থাকতে না পেরে বলে, 'বহুদিদি (রাণী শব্দটা যোগ করতে বারণ করেছে যমুনা, লোকে নানারকম সন্দেহ করবে, কৌতূহল প্রকাশ করবে। তবু এক এক সময় পুরনো অভ্যেসে বেরিয়েও যায়), একটা কথা বলব? ছোট মুখে বড় কথা—আমরা ছোট কাজ করি, তোমাদের মতো লিখাপড়া জানা মেয়ে নই—এসব বলা আস্পর্দার কথা, তোমার রকমসকম দেখে না বলেও থাকতে পারছি না। তোমার তো দীক্ষা হয়েছে, বৈষ্ণব মন্ত্র, আমরাও, এ ব্রজধামে সবাই বৈষ্ণব—আমাদের তো ইষ্ট উনি—গোবিন্দই বলো আর গোপীবল্লভই বলো—যে নামেই ডাকো কৃষ্ণ ভগবান বৈ তো নয়। আমরা মরদই হই আর মেয়েছেলেই হই—তাঁকে আমাদের খশম, মরদ—মালিক বলে মনে করি, তাঁর দুটি চরণ ভাবতে পারলেই আমাদের মনে শান্তি। তা তুমি কেন—কাকে নিয়ে মন্তর তা জানি না—যেই হোন—তাঁর সঙ্গে বড় গোসাঁইদাদাকে এক ক'রে ভাখো না। গোসাঁইদাদাকে ধ্যান করো, তাঁর দুটি চরণ ভাবো, তাঁকেই ভেবে পুজো করো—পেলে ফুলতুলসী দিয়েই—মনে অনেক শান্তি পাবে। এক এক সময় মনে হবে তিনি তোমার কাছেই আছেন, তাঁকে ছুঁতে পারছ। তাতে কোন দোষ নেই, গুরু গোবিন্দ এক। আর মন্তর পড়া মরদ—তার চেয়ে গুরু কে আছে?'

চমকে ওঠে যমুনা।

কে জানে কেন—হঠাৎই মনে হ'ল, এই অশিক্ষিত মেয়েছেলেটার মুখ দিয়ে আর কেউ বলাল কথাগুলো।

মনে হ'ল এ সাক্ষাৎ গোপীবল্লভেরই কথা। তাঁরই নির্দেশ, তাঁরই সান্ত্বনা।

সে সবেগে সবলে—প্রায় পাগলের মতো রামরতিয়াব দুটো হাত চেপে ধরে। বলে, 'আমার মা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ছোটবেলার কথা হলেও অনেকবার শুনেছি বলেই মনে আছে। বলতেন, 'গুরু দু রকম—দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু। এই যেমন কাটোয়ায় কাঁসারিদের দেখেছি—একজন শুধু ঘটি তৈরি ক'রে দিচ্ছে, আর একজন তাতে নক্সা কেটে পালিশ ক'রে তাকে দামী ক'রে তুলছে।...তুমি আমার প্রকৃত দিদি, আমার শিক্ষাগুরুর কাজ করলে। আমি আজ সত্যিই পথ দেখতে পেলাম।'

সত্যিই পথ দেখতে পায় একটু একটু ক'রে।

মনকে ধ্যানে একাগ্র করা কঠিন, মন কেবলই ছড়িয়ে পড়ে, ইষ্টচিন্তার সূত্র ধরেই শাখা-পথে চলে যায়। কিন্তু যেখানে ইষ্ট দেহধারী মানুষ, আর পরিচিত, উগ্র কামনার ধন—সেখানে অল্প সময়েই কয়েক দিনের চেষ্টায় সহজে একাগ্র হযে উঠতে পারে। উঠলও তাই। দু'চার দিনের মধ্যেই মন সেই বিশেষ ইষ্টে সমাহিত হয়। তাঁর দেহের ও স্নেহের স্পর্শ পায় যেন সে সময়টায়।

আগে, ওর অল্প ক'দিনের স্বামীসঙ্গের দিনে যেমন পাযে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করত—এখন ধ্যানে তাই করে। দীর্ঘ, দীর্ঘ কাল ধরে সেই পা দুটিতে মাথা আটকে থাকে। আসল জীবনে যা ক'রে নি, ইচ্ছে থাকলেও করতে লজ্জা হয়েছে—তাই করে, চুম্বন করে বার বার।

মন সেই দেহের প্রতিটি অঙ্গ অনায়াসে ছুঁয়ে ছুঁযে চলে।

মনে মনে ফুল দিয়ে পূজোও করে, পরিক্রমা করে—আর চোখের জলে বুক ভাসে।...

তার পর—আর একটু এগিয়ে যায়। এখানের পূজারীজী ভেতরের সামান্য একটুখানি উঠোনে দু'চারটি ফুলের গাছ আর তুলসীর গাছ করেছেন। ওঁর মহাবীরের পূজার ফুল তুলসী আহরণ শেষ হয়ে গেলে যমুনাও দু'চারটে এনে রাখে। অনেক কষ্টে উঠোন থেকে খুঁজে বয়ে-আনা একটা প্রায় চারকোণা পাথরকে ঘরে এনে এক পাশে একটা বেদীর মতো ক'রে নিয়েছিল। যমুনার জল এনে দিতেন পূজারীজী মধ্যে মধ্যে, তাই দিয়ে ধুয়ে মুছে রাখত। ধ্যান জপ শেষ হলে ফুল দিয়ে পূজো করে, স্বরূপকে পূজো করছে মনে হয়।

শাশুড়িকেও স্মরণ ক'রে পূজো করে সেই সঙ্গে।

এত স্নেহে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, এত যত্নে রেখেছিলেন, অত বড় আঘাত আর ক্ষতির পরও কোনদিন কটু কথা বলেন নি বা কাউকে বলতে দেন নি। যা করেছেন তা আর কেউই করত না। এ শাশুড়ি যদি দেবী না হয় তো আর দেবী কে? নিজের মা তো অবর্ণনীয় লাঞ্ছনাই করেছেন। একবারও ওর দিকটা ভাববার চেষ্টাও করেন নি। কাছে ডেকে নিভৃতে প্রশ্নও করেন নি। শাশুড়িই ওর আসল মা।

মাঝে মাঝে এ ভয়ও জাগে—জীবিত লোককে পূজো ক'রে তাঁর অকল্যাণ করছে না তো? এ ভাবে কি পূজো করতে আছে?

আবার মনে জোর আনে, গুরুজনরা তো শিখিয়েই দিয়েছিলেন বিয়ের সময়—স্বামী আর শাশুড়িকে নিত্য প্রণাম করতে। তাঁরা সর্বাগ্রে প্রণম্য। তা যদি হয় তো তাঁকে—তাঁদের—দেবতার আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজো করা যাবে না কেন?

একদিন রামরতিয়াকে এর মধ্যে বলেছিল ওঁর একটা ছবির কথা। সে এতখানি জিভ কেটে বলেছিল, 'সে আমি পারব না বহুদিদি। ও কথা আর তুমিও মনে রেখো না। ··এতদিন পরে হঠাৎ বড়গোসাঁইদাদার ছবি চাইলেই নানান কথা উঠবে। বড়মার যা বুদ্ধি—তখনই হয়ত ধরে ফেলবেন অন্য কারও জন্যে চাইছি, আর জেরা শুরু করবেন। তা ছাড়া—তেমন ছবি কোথাও আছে কি না তাই বা কে জানে!'

অগত্যা সে আশা ছেড়ে দেয়। গুরু গোবিন্দকে ঠিক নয়, ইষ্ট আর স্বামীকে এক ধ্যানে আনবার, মিলিয়ে দেখার দুরূহ চেষ্টা করে। কিন্তু মনের মধ্যে স্বামীই একক হয়ে ওঠেন বেশির ভাগ সময়ই।

তবু, চেষ্টার অসাধ্য নাকি কিছু নেই। মা বলতেন প্রায়ই ছেলেবেলায়—'মন কিছুতে বসাবার নিত্য অভ্যাস করলে একাগ্র হতে বেশী দেরি হয় না।'

১২
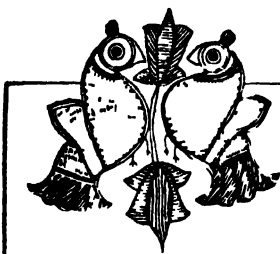
ভাল ফুল ফুটলে তার সৌরভে শুধু মধুপ নয় মানুষও টের পায়।

কবির ভাষায় "গন্ধ তার লুকাবে কেমনে?"

বহু দূব পর্যন্ত সে বার্তা পৌছয়।

অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে অকারণে আত্মগোপন ক'রে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন করছে; কেবল নাকি নুন দিয়ে পোড়া রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে—এ সংবাদে মহিলাদের মনে নিদারুণ কৌতূহলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

বিশেষ বাঙালী মহিলাদের মনে। কারণ কৌতূহল ও আলোচনার পাত্রীটিও এ ক্ষেত্রে বাঙালী।

কেউ কেউ উপযাচক হয়ে এসে দেখা করেন, বিনা আমন্ত্রণেই সেই-কোনপ্রকার-আসনহীন অনাবরিত চৌকীতে চেপে বসেন। অবশ্যই হাতে জপের মালা থাকে—কিন্তু নানা ভঙ্গীতে, নানা ধরনের ভাষায়—কেউ ঘুরিয়ে কথার জাল বিস্তৃত ক'রে জানতে চান ব্যাপারটা, কেউ বা সোজাসুজিই প্রশ্ন করেন।

'কেন এমন ভাবে আছ মা (বা ভাই—বয়স হিসেবে), তোমার কি কেউ কোথাও নেই? তা আজকাল তো লেখাপড়া শিখে মেয়েরাও নানা ধরনের কাজ ক'রে রোজগার করছে। তুমি কেন এত কষ্ট করছ?'

কেউ বা অন্য পথে যান, 'তোমার কোন্ পন্থের দীক্ষা মা? তুমি কি কোন তান্ত্রিক সাধনা করো? গুরু কোথাকার? তা তাতেও তো এ ধরনের কষ্ট করতে দেখি নি কাউকে।' কেউ জানতে চান এ কোন্ ধারার সাধনা? কিন্তু "তোমা-পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি"—সকলেরই মূল প্রশ্ন এক, 'এত কষ্ট করছ কেন অকারণ?' অকারণ শব্দটার ওপর জোর দিয়ে।

এই হ'ল মূল বক্তব্য।

কিন্তু মেয়েটা নাকি বড় ঢ্যাঁটা। কারও ভাষায় দেমাকে, ওর বড় 'চিটাই' বা 'মিজাল'*—কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। পাথরের মেঝেতে বসে থাকে মাথা হেঁট

* চিটাই হ'ল Obstinacy, শিরঢেড়া, মিজাল হ'ল স্পর্ধা।

ক'রে, একটাও কথা বলে না। বসে থেকে থেকে নিজেদেরই নিঃশ্বাস নষ্ট হয় শুধু। অগত্যা এক সময় উঠে চলে যেতে হয়।

যারা একেবারে নাছোড়বান্দা, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন বসে বসে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—তাঁদের উত্তর দেয়, 'আমার কথা কাউকে বলার মতো নয় মা (বা মাসিমা কি দিদি, বয়স অনুসারে), এর বেশী কিছু বলতে পারব না।'

একদিন আর এক মূর্তি অন্য রূপ ধরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন।

রণাঙ্গনেও বলা যায়।

বয়স হয়েছে, তবু এককালে যে রূপসী ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়, সব চিহ্ন লুপ্ত হয় নি।

শুভ্র থান ধুতি, যত্ন ক'রে কুঁচনো; লেস বসানো শৌখীন সাদা চাদর গায়ে জড়ানো; সুডৌল নাসিকায় সযত্ন অঙ্কিত তিলক, হাতে 'কেটে' কাপড়ের কুঁড়োজালি—উগ্র অথচ সুমিষ্ট আতরের গন্ধ ছড়িয়ে এক স্ত্রীলোক অনাহূত এসে হাজির হলেন।

অন্যদের মতো তিনিও অনভ্যর্থিত ভাবেই তক্তপোশে জেঁকে বসলেন। কিন্তু তখনই কোন কথা বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে জপ করার পর কুঁড়োজালি মাথায় ঠেকিয়ে—বোধহয় একবারের মতো একশো আট নাম জপ শেষ হ'ল—মুখে একটা সস্নেহ মমতা মাখানো শব্দ ক'রে—যা ঠিক চু-চু বা অন্য কোন শব্দ দিয়ে বোঝানো যাবে না, যা সত্যকার মা কি ঠাকুমা দিদিমারা করতে পারেন, জিভ আর টাকরার যোগাযোগে—বললেন, 'আহা-হা, মরে যাই মরে যাই! বাছা রে! তোমার এমন দশা কে করলে মা! কোন্ সে বজ্জাত হাড়-হারামজাদা লোক!… দুধের মেয়ে, কিছু জানে না—ভুলিয়ে বের ক'রে এনে এইভাবে ছেড়ে চলে গেছে! যাবে বলেই এনেছিল সে তো বুঝতেই পারছি, বে করার জন্যে আনে নি, মিছিমিছি কোথাও থেকে সিঁদুর পরানো! তবু তোমার ভাগ্যি ভাল যে বাজারে বেচে দিয়ে পালায় নি। কোন পাকা বেশ্যের হাতে পড়লে চির-জীবনটা নরককুণ্ডে কাটত!… এ তবু ভগবানের স্থানে এসে পড়েছ—কী ভাবে এসে পড়লে জানি না—যাই হোক, তোমার মা-বাবার যথাথ পুণ্যের শরীল, সেই জন্যেই আসতে পেরেছ!…গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধারাণী তুমিই ভরসা মা!'

তারপর আবার কিছুক্ষণ চলল নিঃশব্দ জপ (এর মধ্যে যমুনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণের বিরাম নেই), কিছুক্ষণ পরে আবার তেমনি স্নেহ-ঝরে-পড়া কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কথা শুনে পজ্জন্ত আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে ক'দিন। তারপর বলি, না,

এমন ভাবে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না, যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বাঙালীর মেয়ে, শেষে আরও কী দঁকে গিয়ে পড়বে!'

আবার একটু জপ। কিন্তু এবার মনে হ'ল একশ' আটের আগেই মুখ খুললেন, 'তা সে যাই হোক, রাধারাণীর আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ—তিনি দেখবেন বৈকি! কিন্তু এমন ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না মা। থাকা-খাওয়ার কষ্ট তো দেখতেই পাচ্ছি—ঘরের আসবাব আর রান্নার ব্যবস্থা দেখে। এখন কাঁচা বয়েস—সব সইছে, কিছুদিন এমন চললে শরীল যে জবাব দেবে। তখন?...দুঃখু পেয়েছ, ঘা খেয়েছ ঠিকই—কিন্তু বয়েস তো আর ফুরিয়ে যায় নি। প্রেথমেই বজ্জাত লোকের হাতে পড়েছেলে সে তোমার অদেষ্ট। আছে, ভাল লোকও আছে। তুমি—তোমাকে আমি ভাল কাপড় জামা এনে দোব—তোমাকে সঙ্গে নে ক'দিন বড় বড় মন্দিরে ঘুরব—সন্ধ্যেকালে যেতে হবে, তখন সব ওখানকার গোসাঁইরা ভিড়ের ভেতরে ভেতরে ঘোরেন—কিম্বা পেছনের কোন এক জায়গা থেকে নজর রাখেন। পয়সার তো অভাব নেই—টাকার কুমির একো একো জন, চোখে ধরলেই হ'ল—আর ধরবেও—ব্যাস! তোমার হিল্লে হয়ে গেল। ভাল আশ্রয় পাবে। বাড়ি দেবে, আলাদা চাকরাণী-চাকর রেখে—যাতে রাজরাণীর মতো থাকতে পারো সে ব্যবস্থা করবে। নিজের বে-করা পরিবারের মতোই রাখবে। যদি চাও ভেখ নিয়ে কণ্ঠিবদল করাও আশ্চয্যি নয়, তেমন যদি চোখে ধরে!'

আবার কিছুক্ষণ জপ।

'তবে বোকামি করা চলবে না। আগাম পাঁচ সাত হাজার নিয়ে কোন মহাজনের গদীতে রেখে দেবে, চাই কি আজকাল কি ব্যাঙ্ক হয়েছে, সেখেনেও রাখতে পারো—তা বাদে ছোট বাড়ি একটা লিখিয়ে নেবে, তার সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশ ভরি সোনা। যাতে আখেরে না আবার মানুষ খুঁজে বেড়াতে হয়! জয় রাধে! জয় রাধে!'

এতকাল পরে নতুন ক'রে চোখে জল এসে যায় যমুনার।

সে আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে মহাবীরের সেই ছোট্ট মন্দিরটির দরজার সামনে বসে পড়ে। তখন পূজারীজী মন্দিরে ছিলেন না, তবে কাছেই ছিলেন—দেখা যাচ্ছে।

মহিলার চোখে বা মুখে কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না।

আরও কিছুক্ষণ তেমনি নিঃশব্দে জপ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, বেশ শ্রুতিগম্য ভাবেই বললেন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! জয় রাধে! প্রাণের গৌরহরি আমার! আজ আমি যাই মা। অবিশ্যি হ্যাঁ, ঠিকই তো, একদিনে কি আর মন থির করতে পারো, আমি বললুম আর তুমি নেচে উঠলে! বলি বাজারের রাড় তো আর নও।

এই প্রেথম, বড় একটা ঘা খেলে এত কচি বয়েসে। তা আসব, পরে আবার আসব। আমার কিছু না, তবে কথাটা শুনে পজ্জন্ত ছটফট্ করছি যে। পিতিজ্ঞে করিচি, তোমার একটা ভালরকম হিল্লে না ক'রে ছাড়ব না। গোবিন্দ হে, তুমিই ভরসা!'

চার ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মাছ এসে টোপে টান দেবে—এমন আশা করতে নেই—'মহিলা' ঘাগী লোক, এ তথ্য তিনি জানেন। এরপর চার পাঁচ দিন আর এলেন না। যমুনা একেবারেই অনভিজ্ঞ এ সব ব্যাপারে, তার মা বাপের বাড়ি, 'কুটনি' শব্দটাও বোধহয় কখনও শোনে নি, এ ধরনের বইও পড়ার সুযোগ ঘটে নি—দুদিন দেখেই, আর আসবেন না মনে ক'রে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কিন্তু তিনি আবারও এলেন।

তেমনি প্রায় অপরাহ্ন বেলায়, তেমনি সুসজ্জিত বেশে।

কেবল তাই নয়, এমনি শুধু হাতে আসেন নি। হাতে একটা মোড়ক।

এসে সেদিনের মতোই জাঁকিয়ে বসলেন, তারপর বিনা ভূমিকায় বা বাক্যব্যয়ে বাঁ হাতে মোড়কের কাগজটা খুলে দিলেন। ডান হাতে জপ চলছে তখন। অবশ্যই হরিনাম।

মোড়কের মধ্যে শাড়ি, সাধারণ সাদা তাঁতের শাড়ি নয়। বেশ অসাধারণ গোছের রুপোলী জরির কাজ করা আশমানী রঙের মূল্যবান বেনারসী শাড়ি, সঙ্গে ঐ কাপড়েরই জামা।

আক্রমণটা অতর্কিত, সবে যমুনা রুটি খেয়ে বাইরে থেকে আঁচিয়ে ঘরে ঢুকেছে। আজকাল তার এমনিই দেরি হয় খেতে—পূজো-ধ্যান করতে করতে যেন ডুবে যায়—এক এক সময় মনে হয় সত্যিই সে স্বামীসঙ্গ পাচ্ছে। তাই আর উঠতে ইচ্ছে করে না আসন ছেড়ে। ফলে এই সময়টা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

হয়তো সে ঘোরটা এখনো কাটে নি সম্পূর্ণ। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল অনেক। কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইল।

ওর শুভার্থিনীও তা বুঝলেন, জপের মালা মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'তুমি সরল মেয়ে, রাধারাণীর আশ্রয়ে এসে পড়েছ—তিনি হিল্লে একটা করবেনই, যা সেদিন বললুম তোমাকে। তাই বলে এত শিগ্‌গির এমন আশ্রয় পেয়ে যাবে তা ভাবি নি। মস্ত বড় মন্দিরের গোসাঁই মা, টাকা কোথায় রাখবে ভেবে পায় না—বয়েস বেশী নয়, চল্লিশের কোঠায়। দেখতে সুপুরুষ, কোন নেশা ভাঙ করে না, সবে বৌ মরেছে—এমনিই সে কাউকে খুঁজছেল যে বৌয়ের মতোই থাকবে—ভদ্দর গেরস্ত ঘরের মেয়ে। ছেলে মেয়ে রয়েছে তো, সৎমা ঘরে এনে বসালে তাদের দুগ্‌গতির

শেষ থাকবে না। সে তোমার বিত্তান্ত শুনেই লাফিয়ে উঠল একেবারে। তার আর তর সইছে না। আগাম বাড়ি লিখে দেবে একখানা, দশ হাজার জমা ক'রে দেবে এক মহাজনের গদীতে, দু সেট সোনার গয়না।···বল্ মা, এ তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু নয়।'

এতদিন চুপ ক'রে সহ্য ক'রে গেছে সব—আজ কে জানে কেন, যমুনা আর সহ্য করতে পারল না। দুঃসহ ক্রোধে তার দুই রগের শিরাগুলো ফুলে উঠল, মাথায় যেন মনে হ'ল আগুন জ্বলছে—সেই সঙ্গে অপমানে চোখে জল আসতে চাইছে তার মধ্যেই,—সে বোমার মতো ফেটে পড়ল একেবারে, 'কেন আপনি এসব কথা রোজ শোনাতে আসেন বলুন তো! কে বলেছে আমাকে ভুলিয়ে বের ক'রে এনেছে! কে বলেছে আপনাকে আমার হিল্লে করতে! আমি সধবা বামুনের মেয়ে, মাথায় সিঁদুর হাতে লোহা শাঁখা—তা দেখেও কি বুঝতে পারেন নি! আপনি চলে যান, আর কখনও আসবেন না। নবদ্বীপের দিদির মুখে শুনেছিলুম এমনি সব আপনার মতো মেয়েমানুষ এইসব কাজের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকে, দু'টাকা রোজ-গারের জন্যে পরের উপকার করতে চায়।···আজ দেখলুম আপনাকে। ছিঃ ছিঃ, আপনারও তো বয়েস হয়েছে। এখনও এত লোভ টাকার! আমাকে তার কাছে বেচে দু'পাঁচ হাজার ঘরে তুলবেন, সেই জন্যে এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা! বেরিয়ে যান বলছি! নইলে আরও কটু কথা শুনতে হবে।'

তার তখনও রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে, মুখ চোখ আগুনের মতো লাল—একে-বারেই উগ্রচণ্ডা মূর্তি।

মহিলা কিন্তু এত অপমানেও ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং হাসলেন একটু।

'ওমা, অমন অনেক দেখেছি। কত এমন সতীপনা দেখলুম, তারপর আবার আমার কাছে এসেই হেঁইগো মশাই হেঁইগো মশাই করতে হয়েছে। যাক্ দু'দিন। তবে আমি যখন মন ঠিক করেছি তোমার এ দুগ্‌গতি ঘোচাবই—তখন এত সহজে হাল ছাড়ব না। রাধে রাধে! তুমিই জান মা, কি করবে আর কি করাবে!'

কাপড়ের পুলিন্দাটা আবার কাগজে জড়িয়ে নিয়ে বেশ ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময়, বাইরে বেরিয়ে দোরের কাছ থেকে বলে গেলেন, 'একটু শুয়ে পড় বরং। নইলে হয়তো ফিট হবে এখুনি। দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে গড়িয়ে নাও একটু।'

১৩
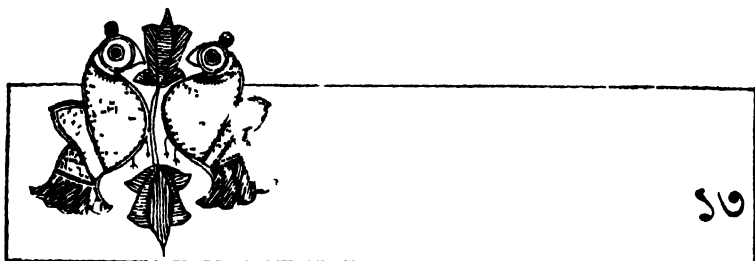
আক্রমণ শুধু এক ধরনের নয়, কেবল মহিলাদেরই নয়।

আরও হ'তে পারে, অন্যরকম, অন্যরূপ—তা ক্রমশ বুঝল যমুনা।

কৃষ্ণচন্দ্রের এক পূজারী লীলাধর—তরুণ, বছর সাতাশ-আটাশ বয়স হবে। আগ্রায় বাড়ি, সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ছেলে—এ বাড়ির পূজারীজীর কাছে মাঝে মাঝেই আসে, অবসর সময়—বেশির ভাগই বিকেলের দিকে।

পূজারীজী দরিদ্র—প্রায় নিঃস্ব হলেও তাঁর পড়াশুনো আছে, সেদিকে আগ্রহও আছে। এখনও এদিক ওদিক থেকে—বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে ভাল ভাল সদ্‌গ্রন্থ জমে আছে দীর্ঘকাল ধরে—চেয়ে-চিন্তে কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ আনেন। পড়ে আবার ফেরৎ দেন বলে সে মন্দিরের কর্তারাও এখন নিশ্চিন্ত হয়ে এক এক সময় মূল্যবান পুঁথিও দেন।

পূজারীজী এক একদিন যমুনার কাছেই আক্ষেপ করেন, পুরনো শহরে কোন এক মন্দিরে স্তূপাকার করা দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আছে, দেখাশুনোর অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তবে প্রচারে তত আগ্রহী নন। বোধ হয় অত বুদ্ধিও নেই, কি ক'রে প্রচার করতে হয় তাও জানেন না। শাস্ত্রজ্ঞ বলে খ্যাতি রটে গেলে এদেশে—বিশেষ তীর্থস্থানে—অর্থাগমের পথ খুলে যায়, সে সম্বন্ধেও অবহিত নন।

এই ছেলেটি—লীলাধর, নির্বোধ নয়। সে জানত এই সত্যটা, মানে এই বয়সেই সংসার ও সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বুঝে নিয়েছিল। পূজারীর পদে বেতন সামান্যই। ত্রিশ টাকায় পূজাও করতে হয়, রান্নাও। তবে ধনীর মন্দির বলেই এই বেতন। পূজারীও তিনজন, কারণ ভোগের পর্বটা এখানে বেশী। পূজা ও ভোগ রান্না এদেরই করতে হয়, পালা ক'রে। নইলে এত মাইনে রাজামহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেও পাওয়া যায় না। শুধু যারা পূজা করে, ভোগের লোক আলাদা কিম্বা মালিক ব্রাহ্মণ নিজেরাই রাঁধেন—তাঁদের অন্তত দুই কুঞ্জে কাজ করতে হয়, নাহলে নিজের খরচ চালিয়ে দেশে কিছু পাঠানো যায় না। অবশ্য একটা ক'রে পারস এদের প্রাপ্য। একটা নিজে খায়—আর একটা মাসিক

দু টাকা বা তিন টাকায় বিক্রী করে। কৃষ্ণচন্দ্রের পারসও কেউ কেউ বিক্রী করে—সেক্ষেত্রে চার টাকা পাওয়া যায় মাসে।

লীলাধর বুঝেছে শাস্ত্র পাঠ, তার আগে কিছু শিক্ষাও প্রয়োজন, এই বয়সে হয়ে উঠবে না। নতুন ক'রে পাঠ নিতে গেলে জীবনের আরও প্রায় পাঁচ-ছ বছর কেটে যাবে। অত ধৈর্য নেই। বিয়ে করেছে দেশে, বাবা মা আছে, টাকার প্রয়োজন অনেক—আর টাকা রোজগারের পথ তার সামনে এই একটিই আছে—কথকতা করা, আর তাতে কিছু প্রতিষ্ঠা বা সুনাম অর্জন করতে পারলে প্রৌঢ় বয়সে গুরুগিরি করা। আর সে কাজ যদি করতেই হয়, কথক হিসেবে জনপ্রিয়তা কি প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রয়োজন। আর তা পেতে হলে (একটা মূলধন আছে, ভাল চেহারা, তবে তাতে কুলোবে না) একটু-আধটু শাস্ত্রজ্ঞান, রামায়ণ মহাভারত তো আছেই—অন্য পুরাণের গল্পও জানা দরকার, আর সেই সঙ্গে ব্যঞ্জনে ফোড়নের মতো লাগসই দু'চারটে সংস্কৃত শ্লোকও।

সেই জন্যেই তার এই দীনহীন সদা-কুণ্ঠিত পূজারীজীর কাছে আসা। কোন কোন দিন হয়ত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে শুনিয়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতেন আবার কোন দিন তেমন মনে হ'লে স্মৃতি থেকে বিভিন্ন পুরাণের গল্প শোনাতেন। কোন দিন বা মনুপরাশর থেকে কিছু কিছু তাঁদের বিশেষ বিশেষ অনুজ্ঞা শোনাতেন। সব বুঝুক বা না বুঝুক—তাদের অর্থ বা মূল্য—লীলাধর একটা খাতা নিয়ে আসত, এই শ্লোকগুলো সেই খাতায় লিখে নিত, মানে সুদ্ধ। এই জন্যেই সে বালির কাগজের একটা মোটা খাতা ক'রে থেরোয় বাঁধিয়ে নিয়েছিল। পূজারীজী অবশ্য ওর এত মতলব জানতেন না, তিনি ওকে জ্ঞানপিপাসুই ভাবতেন এবং এতকাল পরে ভক্তিমান শ্রোতা পেয়েই খুশী ছিলেন।

এর পরিবর্তে পয়সাকড়ি বা মহাবীরের প্রণামী দেবার মতো অবস্থা তার নয়। তবে মাঝে মধ্যে একটা ক'রে 'পারস' বা এমনিই কিছু মিষ্ট প্রসাদ এনে দিত। কৃষ্ণ-চন্দ্রের সারাদিনের সেবায় একুশ রকমের ভোজ্য আবশ্যিক ছিল। বেশী হতেও আপত্তি নেই। জগন্নাথদেবকে ছাপ্পান্ন রকমের খাদ্য দেওয়া হয় ছ'বারে ভোগের উপাদান মিলিয়ে। এঁর মধ্যাহ্ন ভোগেই একুশ রকম।

এই সব দিনগুলোয় পূজারীর খুশির সীমা থাকত না। তাঁর মহাবীরের ভাগ্যে রুটি ও আলুর ভর্তা ছাড়া বিশেষ কিছু জুটত না, মিষ্টান্ন হিসেবে সঙ্গে একটু গুড়। এইসব হঠাৎ-চলকে-পড়া সৌভাগ্যের দিনগুলিতে—যমুনা আসার পর কিছু কিছু ভাল মিষ্টান্ন বা ব্যঞ্জন যমুনাকে দিয়ে যেতেন, জোর ক'রেই।

'ইয়ে পরসাদ হ্যায় মাতাজী, ইয়ে ওয়াপস দেনে সে পাপ হোগা, সাক্ষাৎ

ভগবানজী কো অপমান হোতা হ্যায় উসমে—'

মেয়েটা কি খায় তা পূজারীজী জানতেন, এক এক দিনে চোখে জল এসে যেত তাঁর। এমনি একটি মেয়ে তাঁরও ছিল, বিয়েও হয়েছিল, তেরো চোদ্দ বছরে বিধবা হয়েছে। নিজের মেয়ের কথা মনে পড়েই আরও ব্যথা বোধ করেন এই প্রায়-বিধবার জন্যে।

এই প্রসাদের ভাগ দিয়ে আসা লক্ষ্য ক'রেই লীলাধর সচেতন হয়ে ওঠে, এখানের দ্বিতীয় বাসিন্দা সম্বন্ধে।

আর সচেতন হলে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেরি হবে কেন?

চোখে পড়ে, একদিন ভাল ক'রেই দেখতে পায়। পুরো চেহারাটাই।

সাধারণত লীলাধর আসে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, দেড়টা দুটো নাগাদ, কদাচিৎ আড়াইটেও হয়ে যায়, চারটের মধ্যে চলে যেতে হয় তাকে। এর মধ্যে ঘর থেকে বাইরে আসার কোন প্রয়োজন ঘটে না।

কিন্তু দৈবাৎ এক এক দিন প্রাকৃতিক প্রয়োজনও তো হয়ে পড়ে। অবশ্য সে সময়গুলোয় মাথাতে অনেকখানি ঘোমটা টেনে সাবধানে সর্বাঙ্গ ঢেকেই বেরোত সে, তাই বলে কোনদিন একটু অসাবধান কি অসম্বৃত হয়ে পড়বে না তাও সম্ভব নয়।

'আহা হা!' লীলাধর সেদিন কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চোখ বুজে বসে থেকে পুনশ্চ বলে উঠল, 'আহা হা,—কী দেখলাম গুরুজী, এ কী দেখালেন কৃষ্ণচন্দ্র! এ তো সাক্ষাৎ রাধারাণী! তাঁরই অংশে জন্ম। এ ওঁর মুখের জ্যোতিতেই তো বোঝা যায়। শুধু মুখেই বা কেন—দেখলেন না, চারিদিকে যেন একটা জ্যোতির ছটা ঘিরে রেখেছে!'

পূজারীজী কোন প্যাঁচের ধার ধারেন না, সরল মানুষ, বললেন, 'তা এক রকম তাই, বলতে পারো। তাঁর মতোই এই বয়সে কেঁদে কেঁদে দিন কাটে মেয়েটার!'

'কাঁদবেন বৈকি! কাঁদতেই তো আসা ওঁর। এ প্রেমের আনন্দের স্বাদ কি তিনি দেহ ত্যাগ করলেই ভুলতে পারেন? সে লীলা বার বারই আস্বাদ করতে ইচ্ছে করে যে! ভগবান গোবিন্দই গৌরের দেহ ধারণ ক'রে কাঁদতে এসেছিলেন, রাধার প্রেম আস্বাদ করতে, সেদিন গোপীনাথ মন্দিরে এক প্রভুপাদ, বড় নামকরা গোস্বামী এসেছিলেন, কথকতা করছিলেন, তাঁর মুখেই এ কথা শুনেছি। তার পাল্টা জবাব দিতে রাধারাণীকে আসতে হবে না?...তিনি কখন কার ঘরে কি ভাবে আসেন তা কি কেউ বলতে পারে?'

পূজারীজী বিহ্বল ভাবে শোনেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দেয়।

এর পর প্রসাদের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বেড়ে যায়।

প্রায়ই আসে একটা পুরো পায়স। তাও, ঐ একটা পায়সেই কোন কোন দিন দু'খুরি ক্ষীর, দু'খুরি ক্ষীরসা থাকে।

এই প্রাচুর্য দেখে সরল মানুষ পূজারীজীও হাত খুলে বেশী ক'রে দেন যমুনাকে। নিজে বয়ে এনে ওর ঘরে পৌঁছে দেন।

এর গূঢ়ার্থ বুঝতে বাকী থাকে না যমুনার। এতদিন একেবারেই সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। এখানে আসার পর যা যা ঘটল তাতে অনেক কিছু শিখেছে সে, নবদ্বীপে অতদিন থেকেও এত শেখে নি। কারণ ওখানে মোহিনী ছিল ওকে অনেকটা আড়াল ক'রে।

দু'একদিন দেখে সে হাত জোড় করে। বলে, 'এত আমি খেতে পারি না। কখনই খাই নি। এখন তো আরও পারি না—মরা পেট। সহ্য হবে না।'

'আমারই বা এত কি হবে মা। কে খাবে! এ তো আমি দুবেলা খেয়েও শেষ করতে পারব না।'

'তাহলে বরং মাধুকরীতে দিন। অন্য কোন গরীব লোক ডেকে তাকে পেটভরে খাইয়ে দিন। আর আপনার ছাত্রকেও নিষেধ ক'রে দিন এত দিতে। বলে দিন যে এসব প্রসাদ নষ্ট হয়, মিছিমিছি এত দেন কেন?'

বলে একটু থেমে আবারও বলে, 'এত উনি পানই বা কোথা থেকে? কিছুদিন ধরেই দেখছি হঠাৎ বড় বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। উনি তো—আপনি যা বলেন, তিন নম্বর পূজারী, ছোট পূজারী—ওঁর তো এত পাওয়ার কথা নয়। উনি নিজে পয়সা খরচ ক'রে অন্যের পায়স কিনে দেন না তো! আপনি একটু কড়া হোন এবার—এমন ভাবে প্রশ্রয় দেবেন না।'

শেষের দিকে ওর গলাও একটু কড়া শোনায়। বলবার ভঙ্গীও।

পূজারীজী এত বোঝেন না—তিনি অপ্রতিভের মতো মাথা চুলকোন।

ঘা খেতে খেতেই মরীয়া হয়েছে যমুনা, কঠিন হতে শিখেছে। প্রত্যাঘাতও করতে হবে প্রয়োজন হলে। সর্বদা কুণ্ঠিত বিনম্র হয়ে থাকলে সংসারে চলে না।

নবদ্বীপে এমন নগ্ন লালসা বা নির্লজ্জতার মুখোমুখি হতে হয় নি—তার কারণ মোহিনী তাকে যতদূর সাধ্য এসব থেকে আড়াল ক'রে ছিল। এমন বোধ হয় হ'তও না। একটু শিস দেওয়া কি জানলার সামনে ঘোরাঘুরি করা—তাতেই সে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরে তাদের শাসন করেছে, শেষের দিকে বিশেষ কেউ আর বিরক্তও করত না। হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এক হরেকৃষ্ণ, ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াত, তবু—মোহিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণতর বাক্যাঘাতের ভয়ে বেশীদূর এগোতে ভরসা পেত না।

ওটা গা-সওয়া হয়ে গিছল।

এটা সেও বুঝেছিল।

হরেকেষ্ট যে বেশীদূর এগোতে সাহস করবে না, একেবারে অনভিজ্ঞ আর প্রচণ্ড অকল্পিত আঘাতে বিমূঢ় অবস্থা হলেও কেমন ক'রে বুঝতে পেরেছিল আপনা-আপনিই।

বৃন্দাবনে এসেও প্রথম ক'মাস নিশ্চিন্ত ছিল, কোন উপদ্রব হয় নি, হতে পারে তাও ভাবে নি।

নিরালায় তপস্যা করছিল—নিজের মনে, নিজের মতো ক'রে।

তারপরই এইসব উপদ্রব শুরু হ'ল। তার 'উপকার' করার তিক্ত প্রচেষ্টা।

আর চলতেই লাগল সে প্রচেষ্টা। থেকে থেকেই।

কখন কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবের আক্রমণ হবে তা ঠিক না থাকায় আরও ভয়ে ভয়ে, আরও অস্বস্তিতে থাকে।

তাতেই ক্রমে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে এই জ্ঞানোন্মেষ হ'ল। বুঝতে, চিনতে শিখল পৃথিবীকে, সংসারকে। মানুষ যে এমন হয়—এত লালসার্ত, লোভী, এত স্বার্থপর, এত মিথ্যাচারী, এত মতলববাজ—তা তো এতকাল ধারণার অতীতই ছিল।

তার ফলেই লীলাধরের এই আকস্মিক মুক্তহস্ত গুরুদক্ষিণার পিছনে কি আছে, সে সম্বন্ধে একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। আর তার ফলেই এই কণ্ঠস্বরের কাঠিন্য।

পূজারীজী অবশ্যই এমন ভাবে বলতে পারেন নি।

এ স্বভাবই তাঁর নয়। তিনি যেন নিজেকে সর্বদাই অপরাধী ভাবেন, সর্বদাই সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত ভাব তাঁর।

তবু মাথা-টাথা চুলকে তাঁর নাম ক'রেই বলতে হয় কথাটা।

লীলাধর অতি সহজেই বোঝে—এ উষ্মতার মর্মার্থ।

ও পক্ষও যে আর অত সরল নেই—সেটা বুঝে সতর্ক হয়। বাড়াবাড়ি বন্ধ করে, তবে হাল ছাড়ে না।

ভাল জিনিস পেতে হলে তাড়াহুড়ো করতে নেই। বাধা তো আসবেই, ধৈর্য ধরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

হাত কমায়, অর্থাৎ প্রসাদের পরিমাণ কমে। প্রতিদিনও আর দেয় না। তবে যা দেয়—তা থেকে যাতে বেশ খানিকটা ও-ঘরে পৌঁছতে পারে, সে হিসেব ঠিক থাকে।

যমুনাও সেদিন পূজারীজীকে কথাগুলো বলে—প্রায় ধমকই বলা যায়—লজ্জিত হয়েছিল। সরল, ভালমানুষ, শুভার্থী। স্নেহপরায়ণ। ওঁকে আঘাত দেওয়া

অপরাধতুল্য।

সে আর এ নিয়ে বেশী তেতো করে না। তবে মিঠাই পেঁড়া জাতীয় প্রসাদ তুলে রাখে—রামরতিয়াকে দিয়ে দেয়। সে তো দু'দিন একদিন অন্তরই আসে।

লীলাধরও 'সাক্ষাৎ রাধারাণী'র ধ্রুবপদটা ছাড়ে না। মাঝে মাঝেই গলাটা অতি সামান্য চড়িয়ে সরল প্রশ্ন করে, 'রাধারাণীজী কেমন আছেন গুরু মহারাজ? তেমনি প্রচণ্ড তপস্যা চলছে ওঁর? আহা, সাক্ষাৎ শক্তি যে, মহামায়ার অংশ, কী বিপুল শক্তি। নিজেদের স্বরূপ তো প্রকাশ করেন না—তা হ'লে সে তেজেই আমরা যে ইতর-সাধারণ ভস্ম হয়ে যেতাম!'

কোন কোন দিন বলে, 'আপনিই তো শাস্ত্রবাক্য পড়ে শুনিয়েছেন গুরুজী, সবই সেই এক আদ্যাশক্তি, মহামায়া। তিনিই বহু রূপে বহু নামে আবির্ভূতা হন। রাধারাণীও তো শক্তিরই এক রূপ। আহা হা!'

কোন দিন বা বলে, 'গুরুজী, ওঁকে বলুন এতটা গিয়ান ওঁর, ভক্তি আর তপস্যা যে কতদূর নিয়ে যাওয়া যায়, কত উঁচুতে ওঠে—সেটা একটু সাধারণ মানুষকে, আমাদের মতো আনপঢ় অগিয়ান লোকদের মধ্যে দান করা উচিত ওঁর। উনি আদেশ করলে আমি—মানে আমরা পাঁচজনকে জানালেই সে খরচ উঠে যাবে—এখনই আশ্রম বানিয়ে দিতে পারি। উনি যদি উপদেশ দেন, শিক্ষা দেন—বহু ভক্ত শিষ্য আসবে—ওঁকে কিছুই করতে হবে না—সব কিছু আপনিই হয়ে যাবে।'

'আমি ওঁর সেবক হয়ে থাকব, ওঁকে আশ্রমের দিকে তাকাতে হবে না'—এ কথাটা যোগ করতে গিয়েই সামলে নেয়। ও পক্ষ যে তাকে কিছুটা চিনেছে সেই তথ্যটা মনে পড়ে যায়।

এমন ঈষৎ-উচ্চ কণ্ঠে বলে, যা ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টাকৃত মনে হয় না, অথচ ও ঘরের শ্রুতিগম্য হয়।

পূজারীজীকেও সে চিনে নিয়েছে। তাঁর যে ও কথা বলতে সাহস হবে না, তা জেনেই, এইটুকু গলা উঁচু করে।

এই ধরনের কথাই চলছিল মধ্যে মধ্যে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। প্রতিষ্ঠা যশ সম্মানের লোভ দেখিয়ে। তাতে যখন কোন সাড়াই মিলল না, একদিন অন্য পথ ধরল।

কতকটা হতাশ হয়েই হয়ত। কিম্বা ধৈর্যের বাঁধ আর রাখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎই একদিন যমুনার ঘরে ঢুকে পড়ে—এর আগে কোনদিনই সাহস হয় নি—গায়ের পিরানটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একেবারে নগ্নগাত্রে হাঁটু গেড়ে বসে ভক্তি গদগদ

কণ্ঠে অর্ধনিমীলিত নেত্রে চেয়ে আদ্যাশক্তির স্তব শুরু করে দেয়।

তুমিই সেই মহাশক্তি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণা তুমিই সেই মহাদেবী—জগৎ উদ্ধার করতে আবির্ভূতা হয়েছ—ইত্যাদি।

সুগৌর সুগঠিত পেশীবহুল দেহ ; দেখার মতোই—তাতে সন্দেহ নেই। কোথাও অতিরিক্ত মেদ নেই, কোথাও অভাবও নেই। আদর্শ পুরুষ দেহের জন্যে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই আছে।

ভাদ্র মাস। এমনিতেই গুমোট—তাতে আবেগ, কামনা এবং কিছু আশঙ্কাও—পাশার এই শেষ দানও যদি ব্যর্থ হয়—দেখতে দেখতে বুক পিঠ কপাল ঘেমে ওঠে, সে ঘাম দরদর ধারে গড়িয়ে পড়তে থাকে—কিন্তু লীলাধরের থামলে চলবে না। সে স্তব করেই যায়, কোন্ স্তবের সঙ্গে কোন্ স্তব যুক্ত হচ্ছে তাও হিসেব করে না।

এত কি এই নওজওয়ান ছোকরী বুঝবে ?

ওর তপস্যা তো দিল্এ। পড়াশুনো আর কতটুকু ?

যমুনা এখন অনেকটাই অভিজ্ঞতা—তা থেকে মানবচরিত্রের জ্ঞান লাভ করেছে। এ যে চরম লোভ দেখানো তাও বুঝতে পারে। ইদানীং বুঝতে শিখেছে। নিজেকে দিয়েই বুঝছে খানিকটা।

প্রথমটা তেমনিই অপরিসীম ক্রোধ জেগেছিল কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল।

কঠিন থেকে কঠিন হয়ে উঠল শুধু মুখখানা। দৃষ্টিও।

কিন্তু বাধা দিল না, প্রতিবাদ করল না। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ারও চেষ্টা করল না। স্থির হয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময় তো থামতেই হবে। ক্লান্ত হয়েই থামতে হবে।

থামলও। দু হাত জোড় ক'রেই চাইল ওর মুখের দিকে—ভিক্ষার্থীর মতো।

যমুনাকে এই মুহূর্তের বুদ্ধি কে যোগাল কে জানে, পরে মনে হয়েছে, এ ওর ইষ্টেরই করুণা, তিনিই ওকে আত্মরক্ষার শক্তি যুগিয়েছেন।

মুখে ভাষা ও মাথায় বুদ্ধি।

এক পা কাছে এগিয়ে গিয়ে, বেশ শান্ত ভাবেই বলল ; হিন্দীতেই বলল, 'বাবা, তুমি তো আমাকে আদ্যাশক্তি বললে, মহামায়া, জগজ্জননী। তাই যদি হয়, যদি সত্যিই তা বিশ্বাস করো এ যদি মিথ্যে ছল না হয়—আমি তোমারও মা। তুমি আমার সন্তান। পুরুষের কাছে—মা আর কন্যা, দুই রূপই এক নয় কি ? বাবা, আমি কন্যারূপেই তোমার শরণ নিচ্ছি, তুমি এই সব প্রলোভন থেকে, এই সব যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো। আমি তোমার মা, তোমার মেয়ে—

তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।'

কিছুক্ষণ মূর্ছাহতের মতো চোখ বুজে বসে রইল লীলাধর, একেবারে পাথরের মতো। মনে হ'ল কোন জ্ঞান নেই, জীবিত কি মৃত—সন্দেহ হয়।

শ্রান্তিতে ভেঙে পড়েছে তো বটেই, পরস্পরবিরোধী আবেগেও।

প্রচণ্ড আঘাতে বুঝিবা বুকের স্পন্দনও থেমে গেছে।…

তার পর—মূর্ছা থেকে জাগবার মতোই একসময় চোখ খোলে। পাথরের ওপরই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রণাম করে যমুনাকে, তবে পায়ে হাত দেয় না, স্পর্শ করার চেষ্টা করে না। ঘামেতে ধুলো মিশে কাদা হয়ে যায় সর্বাঙ্গে—সে হুঁশও নেই ওর।

অনেকক্ষণ এই ভাবে পড়ে থাকার পর উঠে পড়ে বলে, 'তাই হবে মা, তুমি আমাকে সন্তান বলেছ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাই দিয়েছ। আমিও বলছি, কেউ আর যাতে তোমাকে বিরক্ত না করতে পারে, তোমার তপস্যায় বিঘ্ন না ঘটায়—এবার থেকে আমিই তা দেখব। জান দিয়েও। আমি আর তোমার সামনে আসব না—কিন্তু যখনই দরকার কি বিপদ বুঝবে—এই সন্তানকে স্মরণ ক'রো—ছুটে আসব।'

সে আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায়, কোনমতে পিরানে গা ঢেকে, পূজারীজীর দিকেও তাকায় না।

যমুনাও এবার চৌকিতেই বসে পড়ে—অবসন্ন দেহে ও মনে।
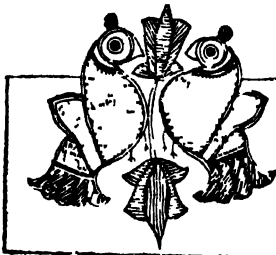
ইংরাজী ১৯২৪ সালে পূজোর আগে, দুর্গাপঞ্চমীর রাত্রি থেকেই সর্বনাশা বন্যা দেখা দিল গঙ্গা ও যমুনায়।

এ এক অভিনব ঘটনা।

অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক।

গঙ্গার জল বাড়ে, কাশী পাটনা ঐসব অঞ্চলে বেশির ভাগ বছরই বিপদ সীমা লঙ্ঘন করে, শহরে নৌকা চলে—কাশীতে এক উচ্চতার সীমা আছে, তাকেই বিপদ সীমা বলতে পারেন, তার ওপর জল উঠলেই বলা হয় 'ইন্দ্রদমন'—কিন্তু সে এসময় নয়, আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই হয় অধিকাংশ সময়। হয়ত ভাদ্রেও বাড়ে অকস্মাৎ। তা ছাড়া বেশি বাড়ে নিচের দিকেই, উপনদীর উপরন্তু জল যোগ হয়ে। হরিদ্বার অঞ্চলে জল বাড়লেও ঘর বাড়ি ডুবিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তা এর আগে শোনা যায় নি।

যমুনাতে তো জলই থাকে না। যা একটু জল পাওয়া যায় তা এই বর্ষায়, তার পরই আবার শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হ'তে থাকে—আমি বলছি বিশেষ ক'রে বৃন্দাবনের কথা—সামান্য একটু পার্বত্য ঝর্ণা বা বড় নালার মতো জল। বাঁধানো ঘাট থেকে বহুদূরে, কচ্ছপে বোঝাই—বড় বড় ধাড়ি কচ্ছপ, বোধহয় শতাব্দীর ওপর বয়েস তাদের—ব্রজবাসীরা এসে জলে দাঁড়িয়ে পায়ে ক'রে ঠেলে বা হাতের বড় লাঠিটা দিয়ে সরিয়ে দিলে যাত্রীরা কোনমতে দুটো ডুব দিয়ে নেন। সেজন্যে এ শহরে কোন নৌকো নেই। মথুরাতে ঘাটের ধারে জল, তাও মাঝে মাঝে বড় চড়া বলে নৌকো সেখানেও বেশী নেই। বৃন্দাবনে রঙ্গজীর বাগানবাড়িতে যখন তাঁর প্রতিনিধিরূপে স্বর্ণমূর্তি দুবেলা বেড়াতে যান দোলের সময় পাঁচ-ছ'দিন কি বৈশাখে কোন কোন বিশেষ তিথিতে, তখন নৌকোয় চড়েন তিনি জলবিহারের উদ্দেশ্যে। সে জন্যে একটা পুকুর কাটানো আছে, সেই পুকুরের সঙ্গে মানানসই একটি ছোট নৌকো। সে নদীতে—বিশেষ প্রবলা নদীতে—চালাবার মতো নয়।

অর্থাৎ এই রকম ভয়াবহ সর্বনাশা আকস্মিক বন্যা সামলাবার কোন ব্যবস্থাই

ছিল না তখন।

এটা এত অতর্কিতে নেমেছে, এতই আকস্মিক—মনে হয় ওপরের দিকে পাহাড়ে কোথাও কোন "ক্লাউডবার্স্ট" মতো হয়েছিল। যেমন সাম্প্রতিক কালে বছর কতক আগে কাশ্মীর পহলগাঁওতে এক ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় ইমারৎ হোটেল-বাজার সব ভাসিয়ে ভেঙে শহরটা প্রায় বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল।

অবশ্য পাহাড়ে এত বড় রকমের কিছু না হলেও এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি—ঋষিকেশ থেকে লছমনঝুলা যাওয়ার পথে চন্দ্রভাগা বলে এক নদী পড়ে। (উড়িষ্যাতেও চন্দ্রভাগা নদী আছে, কোণারকের কাছে, সে এত শীর্ণ নয়।) বেশির ভাগ দিনই নদী শুকনো থাকে, তখন বর্ষার প্রবল স্রোতে ভেসে আসা বড় বড় পাথরের নুড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হ'ত। বর্ষায় জল বাড়ে, তবে সেও বড় জোর বুক-সমান জল, পার হওয়া যায়। এখন বাঁধানো পুল হয়েছে। গাড়ি বাস লরী সব চলে যায়। কেউ লক্ষ্যও করে না।

১৯১৯ সালের এপ্রিলে আমরা প্রথম ঋষিকেশ যাই। যে দিন গিয়ে পৌঁছলুম শুনলুম তার আগের দিন একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঋষিকেশে কালিকমলী বাবার নামাঙ্কিত সুবৃহৎ এক ধর্মশালার সঙ্গে একটি সত্র বা ছত্রও আছে সাধুদের জন্যে। বেলা এগারোটা নাগাদ সাধুরা এসে ভাত ডাল রুটি নিয়ে যান। বড় বড় ছ'খানা ক'রে রুটি, বিরাট এক হাতা ক'রে ভাত আর খানিকটা ক'রে ডাল। কোন কোন দিন আলুর ভর্তা কি অন্য কোন সবজির 'শাক' মেলে। এই 'ভিক্ষা' নিতে দূর-দূরান্তর থেকে সাধুরা আসতেন। তখন এত ছত্র ছিল না। এখন বহু ছত্র হয়েছে। তেমনি খাতায় নাম লিখে গোনাগাঁথা সাধুকে দেন। কালিকমলীর বিরাট ব্যবস্থা।

চন্দ্রভাগার ওপার থেকে অনেক সাধু আসেন প্রতিদিন। এক এক জন পাঁচ ছয় সাত জনের খাদ্যও নিয়ে যান। এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন হয়, ক' মুরৎ? অর্থাৎ কটি মূর্তি বা ক'জন? কেউ বলে পাঁচ কেউ বলে ছয়, সেই মতো দেওয়া হয়।

সে'দিনও তেমনি আসছিলেন, ঐটুকু তো নদী, শীর্ণকায়াই বলতে হবে—তিন চার দল বিভিন্ন দিক থেকে আসছেন, মাঝামাঝি পৌঁচেছেন, হঠাৎ পর্বতসমান জলধারা নেমে তাঁদের কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তা কেউ জানে না। দু-তিন দিন বাদে হরিদ্বারে গঙ্গার পাড়ে, জলের মধ্যেও কটা দেহ পাওয়া গেল। জলের মধ্যেও বড় পাথরের খাঁজে আটকে যায় কখনও কখনও।

এ সবই ক্ষণিকের ব্যাপার। আমরা পরদিন ভোরবেলা যখন গিয়েছি তখন এক

জায়গায় পায়ের চেটো ডোবা জল ছাড়া আর কোন চিহ্নও নেই সে সাংঘাতিক স্রোতের।

কিন্তু পাহাড় থেকে এত দূরে, বৃন্দাবনে এমন সাংঘাতিক বন্যা নামবে—এদের ভাষায় 'বাঢ়'—তা কে জানত!

কনখলে পঞ্চমীর রাত্রিতেই নেমেছে জল, উন্মত্ত—যেন ষাঁড়ের মতো গুঁতোগুঁতি করতে করতে—নদীর ধারে যাঁরা থাকতেন, নিচু ঘরে কি ঝোপড়ায়—তাঁদের চিহ্নও থাকে নি। গভীর রাতের ঘটনা। তখন সবাই ঘুমে অচেতন, জল নামার গম্ভীর গর্জনও অত কানে পৌছয় নি। পৌছলেও এ গর্জন কিসের বুঝে সে তন্দ্রাবিহ্বল অবস্থায় নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

বহু সাধু মারা গেছেন, যে সব ছোট ছোট কুটিয়া ছিল তার চিহ্নও নেই। তাই বা কেন—বৃন্দাবনের কেশবানন্দ স্বামীর একটা পাকা আশ্রমও ছিল কনখলে নীল-ধারার পাড়ে—তারও চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি—জল নামার পর।

এখানে ষষ্ঠীর দিন সকালে সেই বন্যার প্রাথমিক চেহারাটা প্রকাশ পেল। ক্রমে দিন যত বাড়তে লাগল সর্বনাশের আসন্ন চেহারাটাও অনুমান করা গেল। রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল ছিল নদীর তীরে পানিঘাটে—আগের রাত্রেই বিপদ বুঝে কোন-মতে তাঁরা রোগীদের নিয়ে কালাবাবুর কুঞ্জে তুললেন (শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসুদের ঠাকুরবাড়ি), মোটামুটি দরকারী জিনিসও সরানো হ'ল। তবু কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী, কাগজ খাতাপত্র অনেক নষ্ট হ'ল।

বিকেলের দিকে করাল চেহারাটা ফুটে উঠল। দিকে দিকে হাহাকার শুরু হ'ল। কত ঘরের চাল, বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে, তাতে লোকও আশ্রয় নিয়েছে যে পেয়েছে—তারা কাতর কণ্ঠে চিৎকার করছে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে। কে কাকে বাঁচাবে? একটি ছোট নৌকো তাতে দু'চারজন লোক উদ্ধার করা যায়। কিন্তু নৌকো যদি দরিয়ার মাঝখানে পড়ে কেউ সামলাতে পারবে না। যা দু-একজন ধারে কাছে পড়ছে তাদের টেনে তোলা গেল—সে বোধহয় বিপন্ন মৃত্যুপথযাত্রীর দু' শতাংশও নয়। এক পাঞ্জাবী সাধু, বলিষ্ঠ শরীর, ওরই মধ্যে সাঁতার দিয়ে ঐ পানিঘাট অঞ্চলটায় দু'একটা ভেসে যাওয়া গরু মোষ ঘোড়াকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আস-ছিলেন—সন্ধ্যার দিকে তিনিও হার মানলেন। তখন মথুরা রোডের বড় রাস্তাতেই বুক-সমান জল এসে গেছে।

সারা রাত ধরে চলল সে হাহাকার, আর্তনাদ এবং মধ্যে মধ্যে বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ। জলাভাবের দেশ, বর্ষা বিরল। মাটিও খুব শক্ত, তাই অধিকাংশ পাকা

বাড়িও গাঁথা হ'ত মাটি দিয়ে। বন্যার জল যত ভেতরে এগোচ্ছে, উঠছে ওপরের দিকেও, তত মাটি ভিজে গলে ভারী পাকা বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে। বরং যাদের মাটির দেওয়াল—এসব দেওয়াল পুরুই হয়—খাপরার চাল, তাদের সব মাটি গলে যেতেও সময় লাগছে। আর তাদের ওজনও তো এত বেশী নয়।

পাথরের বাড়ি বা মন্দির বা যাদের বাড়ি ভেতরে ইটের দেওয়াল হলেও বাইরে পাথর দেওয়া—তাদের বিপদ কম। এত ভারী ইমারত কেউ মাটিতে গাঁথত না। চুন সুরকি দিয়েই গাঁথা হ'ত। মেঝেও চুন পেটা—বিলিতি মাটির মেঝে সবে শুরু হতে আরম্ভ হয়েছে তখন—দু-চারখানা বাড়িতে মাত্র হয়েছে। বড় বড় অনেক বাড়ির মেঝেও পাথরের ছিল।

কেশবানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাধাবাগের কাত্যায়নী বস্তুত দুর্গা মূর্তিই। সেই মতোই দেবীর পূজা হয়—সন্ধিপূজা প্রভৃতি সমস্ত ঠিক ঠিক, আয়োজনও বিশাল। বহু লোক নিমন্ত্রিত, সে সব স্তূপীকৃত বস্তু নষ্ট হ'ল। একতলার ঘর থেকে সামনের দোতলায় বা তার ছাদে মানুষ মাল যতটা সম্ভব সরানো হ'ল। কিছু কিছু মিষ্টান্ন তৈরী হয়েছিল, তাও উঠল, তাই খেয়েই জীবনধারণ করতে হবে অন্তত।

স্বামীজী একাই মন্দিরে রইলেন। মন্দির বেশ উঁচু। ছ'সাত ধাপ ভেঙে উঠতে হয়, তারও মধ্যে মায়ের মূর্তি আরও উঁচু বেদীতে বসানো। সেখান পর্যন্ত জল উঠল। স্বামীজী একটা চৌকি ভাসিয়ে নৌকোর মতো ক'রে তাতেই বসে রইলেন। জল দিয়েই মার পূজা সারলেন। কিছু লাড্ডু দিয়ে ভোগ। এটা উনি বিপদ বুঝে কুলুঙ্গীতে নিয়ে রেখেছিলেন বোধহয়।

রেঠিয়া বাজারের দুর্গামূর্তি পূজা করা হ'ল তিনচার থাক-উঁচু করা পর পর বেশ কটা চৌকির ওপর বসিয়ে, পূজারীরাও পূজা করলেন সামনের স্বতন্ত্র মঞ্চে বসে। জলেই পূজা, তবে এঁদের কিছু বিল্বপত্র জুটেছিল। আর হালওয়াইদের দেওয়া মিঠাই দিয়ে ভোগ। ভক্তরা প্রায় আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে দর্শন আর প্রণাম করতে লাগলেন।

সপ্তমীর দিন পর্যন্ত জল বাড়তেই থাকল। তার পর রাত্রিতে মন্দীভূত, অষ্টমীর দিন থেকে কমতে শুরু হ'ল। কিন্তু সে গতি মন্থর। শহরের ভেতরের জল বেরিয়ে যেতে আরও বিস্তর দেরি। বরং উঁচু জায়গার জল কিছু কিছু নিচু জায়গায় নেমে সেখানের জল দু-চার ইঞ্চি বাড়িয়ে দিল।

বাড়ি বা মন্দিরের মধ্যেকার জল আটকেই রইল। বাগানগুলোতে জল বাড়া বন্ধ হ'ল যদি বা, পাঁচিলের জন্যে আর ফুলগাছের জন্যে আগেকার ঝরা পাতা

নর্দমার মুখে জমে সরানো মুশকিল হ'ল। কেই বা সরাবে—এই প্রায়-ডুব-জলে নেমে? ফলে নিচু ফুলের গাছগুলো পচে দুর্গন্ধ উঠল, তার ফলে মশা—আর মশার জন্যে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া ক্রমে মহামারী ধারণ করল কিছু দিনের মধ্যেই।

শুধু ম্যালেরিয়াই বা কেন, পানীয় জলের অনেক কুয়োতেও বন্যার জল ঢুকে গিয়েছিল। সে জল অগত্যাই পান করতে হয়েছে—মিষ্টি জলের কুয়ার সংখ্যা সীমিত—তার ফলেও নানা আন্ত্রিক রোগ, টাইফয়েড। জল ঘাঁটা ও ভেজার ফলে নিউমোনিয়াও বাদ গেল না। রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বামী বেদানন্দ বা প্রভাস মহারাজ—শরৎচন্দ্রের ভাই—তার একজন বলি হয়েছিলেন।

পূজারীজীর বাড়ি দেহাতে—কিন্তু কাছেই, নদীর নিকটবর্তী গ্রামে। তিনি ষষ্ঠীর সন্ধ্যাতেই বন্যার ভয়াল চেহারা দেখে রাতেই বাড়ি রওনা হয়ে গেলেন।

যমুনাকে বলে গেলেন, 'আমার উপায় নেই মা, ওখানে মাটির ঘর, তাও মেরামত হয় নি যে কত বছর—তা মনেও পড়ে না। ওরা যে কি করছে, বাঁচল কিনা জানি না। এ পাথরের বাড়ি, ভেতবের গাঁথুনি কিছু মাটির কিছু সুরকির, —এ আমার শোনা কথা, কোন্‌খানটায় কি তা বলতে পারব না মা। তেমন দেখলে সিঁড়ি তো আছে, ছাদে চলে যেও। কিম্বা সামনের ঐ বাঙালী বুড়ীমার কুঞ্জর সামনের অংশ পাকা, ওঁর কাছে যেও, উনি আশ্রয় দেবেন। সে যা হয় করো। আমার মাথার ঠিক নেই, আমি চললুম।'

তবু যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তবে সামনের ঘরগুলোরও চাবি রেখে যাচ্ছি। জল আসবে পিছন দিক দিয়ে। তুমি আজ রাত্রেই বরং সামনের ঘরটায় চলে যাও। তবু একটু উঁচু। তোমার লাম্‌টেনে কতটা তেল আছে জানি না। প্রদীপের তেল মন্দিরের কুলুঙ্গীতে রইল। ইচ্ছামতো ঢেলে নিও, কোন সঙ্কোচ করো না। আর—আর আমি বরং লীলাধরকেও একটু বলে যাই, একটু খবর নিতে' কোন ভয় পেও না মা, ও এখন তোমাকে খুব ভক্তির চোখে দেখে, বলে উনি যেচে আমার বেটি হয়েছেন। এ আমার ভাগ্য। দেখেছ তো, আর তোমার সামনে আসে না, বা তোমাকে তোষামোদ করার চেষ্টা করে না। ওর দ্বারা আর কোন ভয় নেই।'

বলতে বলতে তিনি প্রায় এক রকম দৌড়েই চলে গেলেন সেই অন্ধকারে জল ভেঙে।

লীলাধরের কথাটা সত্যি, তা যমুনাও মানতে বাধ্য। লোকটা যেন বদলে গেছে

একেবারে। কোনদিন দৈবাৎ সামনাসামনি পড়লে হেঁট হয়ে নমস্কার করে, কথা বলার চেষ্টাও করে না। বেশী বেশী প্রসাদ দেবার চেষ্টাও করে না। আগে যেমন মধ্যে মধ্যে আনত, তেমনিই আনে।

হ্যাঁ, লীলাধর ওর বিপদ শুনলে নিশ্চয় আসবে খবর নিতে।

কিন্তু যমুনা জানল না, পূজারীজী লীলাধরকে কিছু বলে যেতে পারেন নি। তখন কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের মধ্যে জল ঢুকে গেছে। ওরা সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সেই একবুক জল ভেঙে দরকারী জিনিস কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার। চেঁচা-মেচি, অসহায় চিৎকার কিছু—হয়ত নিজেদের বুকেই সাহস সঞ্চারের জন্যে। তা ছাড়া পূজারীজী যেতেও পারলেন না। সামনেই অনেক জল তখন।

লীলাধরের হয়ত ওর কথা মনে হয়েছিল কিন্তু তখন এই বিপুল দায়িত্ব ফেলে যাওয়ার সময় নেই, সে উপায়ও নেই।

কিছুই করা হ'ল না যমুনার।

এতবড় বাড়িতে একা প্রায় অন্ধকারে বসে।

চারিদিকে এই আর্ত চিৎকার—আর্তনাদ, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। এক এক জন চেঁচিয়ে অপরের খবর নিচ্ছে। সবটা জড়িয়ে এক আতঙ্কের আবহাওয়া। এরই মধ্যে চৌকির ওপর পা তুলে হাঁটুতে দাড়ি রেখে চুপ ক'রে বসে রইল। এ অবসরে কোন বদ লোক ঢুকতে পারে, ঘরের কপাটটা অন্তত বন্ধ করা দরকার, এটুকুও মনে পড়ল না।

সপ্তমীর দিন ভোরে জল ঢুকল ওর ঘরে।

ক্রমশ চৌকি পর্যন্ত পৌঁছল।

না হ'ল আটার কলসী বা চালের হাঁড়ি সরানো, না হ'ল খাবার জলের কলসীটা নিরাপদে রাখা। অন্তত তক্তপোশের ওপর তোলা যেত, সে কথা মনেই রইল না ওর।

ক্রমশ জল উঠতে উঠতে চৌকির সমান হয়ে গেল।

আরও ওপরে উঠল।

তবু যমুনা নড়ল না। কিছুই করতে পারল না। কোথায় যাবে, কার আশ্রয়ে—তাও ভেবে পেল না।

সামনে কোণাচে-ভাবে কিশোরীমোহনের কুঞ্জ, এঁর যাঁরা সেবাইত বা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরাও বাঙালী। তাই ইতিমধ্যেই বহু বাঙালী সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। সামনের রাস্তায় তখনও সামান্য জল। এইটুকু পথ বেশ উঁচু।

ঘরের মধ্যে ঢুকতে তখনও ঢের দেরি। একমাত্র এই অংশটাই পাকা গাঁথুনি। কিন্তু একতলায় একটিমাত্র ঘর, সামনে দরদালান। লোকও ইতিমধ্যে অনেক এসে গেছে। ওপরে ওঁরা থাকেন। সেখানে মালও যথেষ্ট, বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়ার মতো জায়গা নেই।

তাছাড়া কোনদিন যমুনা ও মন্দিরে যায় নি, ওঁরাও আসেন নি। দুপক্ষের কেউ কাউকে চেনে না। এক্ষেত্রে কার কাছে আশ্রয় চাইবে? কোথায় তাঁরা আশ্রয় দেবেনই বা?…

জল যখন চৌকির ওপরও চার পাঁচ আঙুল উঠল, তখন হাল ছেড়েই দিল।

এই তো ভাল। জলে যদি ডুবিয়ে মারেন গোপীবল্লভ তাই মারুন।

তার আর বাঁচার সাধও নেই। এ মৃত্যুকে কেউ আত্মহত্যা বলতে পারবে না।

পায়ের চেটো ডুবল। আরও একটু।

একবার সে চোখ বুজে স্বরূপকে মনে করবার চেষ্টা করল, মনে মনে সেই বাঞ্ছিত পা দুটিতে চুমো খেল।

তারপর—যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে এ জীবনের এইখানেই সমাপ্তি ঘটবে এই আশায় ও আশ্বাসে—সেই জলের ওপরেই এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

হ্যারিক্যানটাই তোলা ছিল তক্তপোশের ওপরে, কিন্তু তাতেও বোধহয় জল ঢুকেছে, সেও দপদপ করছে। এখনই নিভে যাবে। যাক গে।

১৫
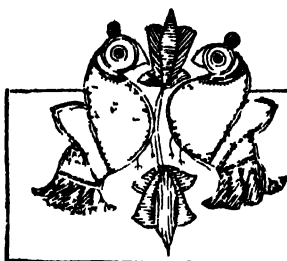
যমুনার কথাটা পূজারীজী না বলে গেলেও লীলাধরের মনে ছিল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের পরিস্থিতিও এমন যে তার কিছু করার উপায় ছিল না।

বন্যার জল মূল মন্দিরে ঢুকেছে, প্রধান বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব মূর্তিই বিপন্ন। কালানুক্রমে নানা কুঁচো কুঁচো মূর্তি এসে জড়ো হ'ন, তারা বেদীর অপেক্ষাকৃত নীচের ধাপে আশ্রয় লাভ করেন। এখন এঁদের কোথায় তোলা হবে সে এক বৃহৎ সমস্যা। কুলুঙ্গী তাক এসব আছে, তেমনি সেখানেও নানা খুচরো জিনিস থাকে, তাদেরও প্রয়োজন আছে। এঁদের সেখানে তুলতে গেলে সেগুলোর জন্যে অন্য স্থান ঠিক করতে হয়—কিন্তু কোথায়? কারও মাথাতেই তা তখন ঢোকে না। সকলেরই বিহ্বল অবস্থা প্রায়।

জল ক্রমে ক্রমে উঠছে, এদের সমস্যাও সেই সঙ্গে তাল ফেলে বাড়ছে। কোথাও থেকে চেয়ার কি বেঞ্চি এনে বিগ্রহ বা পটগুলো কি রাখা সমীচীন হবে—বহু ব্যক্তির ব্যবহৃত এই সব আসনে? তার মধ্যে কত ইতর ব্যক্তিও হয়ত বসে গেছে। চরম বিপদেও কেউ কেউ এ ধরনের প্রশ্ন তোলেন।

তারপর—বড় প্রশ্ন, ভোগ রান্না হবে কোথায়? অত 'প্রকার' যদি নাও হয়, অন্ন, রুটি, একটা ব্যঞ্জন, পায়স—এ তো দিতেই হবে। পূজারী বা সেবকদেরও তো খাওয়া প্রয়োজন। সেটুকু পাকের ব্যবস্থা করা ছাড়া তো উপায় নেই। কিন্তু সেই বা কোথায় হবে, কী ভাবে হবে? তা ছাড়া নিত্য সেবার প্রশ্ন। পূজারীরা একবুক জলে দাঁড়িয়ে করতে পারেন—কিন্তু উপাদান বা উপকরণ?

'দিন গেল সেই ভাবনা ভেবে'—এই অবস্থায় দিশাহারা কামদার থেকে পূজারী সেবক সকলেই। জল আরও বাড়ত এদিকে, মন্দির মূর্তি সবই ডুবিয়ে দিত হয়ত—বাঁচিয়ে দিল মজে-যাওয়া শুকনো ব্রহ্মকুণ্ডই। রঙ্গজীর মন্দিরও নীচু জমিতে, যমুনার ধারে—সেখানে জলের সীমা এত উঠছে মুহুর্মুহু, যে তাঁরাও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্যেই, ব্রহ্মকুণ্ডের দিকের বড় ফটকটা খুলে দিতে বাধ্য হলেন। বিরাট ফটক, হাতীর ওপর চেপে মূর্তি (প্রতিনিধি) বার হন্—সেই মাপের। ঐ ততখানি কিউ-

বিক মাপের জল বিপুল গর্জনে পড়তে পড়তে চওড়া বাঁধানো রাস্তা ভেঙে গেল—তবু, প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে অবিরাম জল পড়াতেও ব্রহ্মকুণ্ড ভরল না। তাতেই এদিকের অনেক বাড়ি রক্ষা পেল। সেই সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ও আরও কিছু কিছু মন্দিরও চরম দুর্দশা থেকে বাঁচল।

অষ্টমীতে স্থিতি; নবমীতে জল নামতে শুরু হ'ল তবে সে শম্বুক গতিতে।

দশমীর দিন একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ মিলল।

সেই প্রথম—বাইরে যাওয়ার মতো একটু অবকাশ মিলতেই লীলাধর বেরিয়ে পড়েছিল।

মনে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল যমুনার খবরের জন্যেই। এ যে কী আকর্ষণ, কোন্ শ্রেণীর তা লীলাধর বোঝে না। অত শিক্ষাদীক্ষা নেই। নবলব্ধ কন্যা সম্বন্ধে স্নেহ, তার চরিত্রবলের জন্যে শ্রদ্ধা—তার সঙ্গে পূর্বের সে রূপজ মোহ, দৈহিক লালসা—তাও কি কিছু মিশিয়ে নেই?

মনকে সে শাসন করে, বোঝায় যে এটা ওর স্নেহ ও শ্রদ্ধা। সেটাই বিশ্বাস করতে চায়।

বাড়ির বাইরে পৌঁছে 'পণ্ডিতজী' 'পণ্ডিতজী' বলে বারকতক হাঁক দেয়। পরে, শূন্য বাড়ি হা-হা করছে দেখে কিছু ইতস্তত ক'রে ঢুকেই পড়ে।

একেবারেই কি শূন্য?

তাই তো মনে হয়।

জল যে কতটা উঠেছিল তার চিহ্ন তো স্পষ্ট। নিশ্চয় পূজারীজী নিজে কোন নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আর সঙ্গে কি যমুনাকে নিয়ে যান নি?

ফিরেই আসছিল, তবু কি মনে হ'ল, শেষ মুহূর্তে যমুনার ঘরে একবার উঁকি মারল—এবং শিউরে উঠল।

হে প্রভু, হে কৃষ্ণচন্দ্র—এ কি দেখালে!

জল নেমেছে, বেশ খানিকটা—এখন ভিতরে সামান্য চেটো-ডোবা জল মাত্র আছে।

তবে যমুনা কোথাও যায় নি, কোথাও যাবার বোধ হয় চেষ্টাও করে নি। পণ্ডিতজীও কোন ব্যবস্থা ক'রে যান নি নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ও যা শুনেছে—বাড়ি তাঁর নিকটবর্তী দেহাতে, নদীর কাছেই। এবং সেখানের বাড়িও মাটির। পরিবারের সর্বনাশের কথা ভেবেই দ্রুত চলে গেছেন—এ মেয়েটার কথা ভাবার অবকাশ পান নি।

রান্নার সাময়িক চুলাটার ইঁট মাটি গলে একাকার, আটার কলসীতে জল ঢুকে

সেটা ভেলা পাকিয়ে গিয়ে পচা গন্ধ ছেড়েছে ; খাবার জলের খালি কলসীটা এক-দিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ; তার নিচের খাঁজটুকুতে ময়লা জল খানিকটা পড়ে আছে ; চাকি-বেলুন বোধ হয় ভাসতে ভাসতে এসে চৌকাঠের কাছে আটকে গেছে ; ছোট্ট হালকা কড়াইটারও সেই হাল।

তারই মধ্যে চৌকির ওপর যমুনা পড়ে আছে। জল যে ওপরে উঠেছিল তার চিহ্ন প্রত্যক্ষ। কাপড় সেমিজ তখনও গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে—সম্ভবত ভিজে। তার মানে জলেই ডুবে ছিল।

প্রথমে আঁৎকেই উঠেছিল লীলাধর। একটা অস্ফুট শব্দ আর্তনাদের মতো বেরিয়ে গিছল গলা দিয়ে। মরে গেছে। নিশ্চয়ই তাই। জলের মধ্যে ডুবে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে দম আটকে মরেছে—

মনে হয় বাঁচবার চেষ্টাও করে নি। নইলে দেওয়ালে যে দাগ দেখা যাচ্ছে—তাতে বসে থাকলে অন্তত দম বন্ধ হ'ত না। তেমন হলে দাঁড়িয়েও থাকতে পারত। যদি বেরিয়েও আসত। সামনের এই রাস্তাটায় অতি সামান্য জল উঠেছিল।

আসলে কোথায় যাবে, কার কাছে আশ্রয় নেবে, সে আশ্রয় নতুন বিপদের কারণ হবে কিনা—বুঝতে পারে নি। আহা বেচারী! দুই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল লীলাধরের।

কিন্তু তারপরই হেঁট হয়ে খানিকটা চেয়ে থেকে মনে হ'ল যেন তখনও নিঃশ্বাস পড়ছে, গলার কাছটাও ধুক ধুক করছে।

খুব ক্ষীণ সে প্রাণ-লক্ষণ, তবু একেবারে মৃত নয়।

গায়ে হাত দিয়ে দেখতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল লীলাধর।

না, অন্য কোন সঙ্কোচে নয়। এ দ্বিধা-সঙ্কোচ উচিত-অনুচিত চিন্তার সময় নয়।

ওর মধ্যেই চকিতে মনে খেলে গেল বাস্তব তথ্যগুলো।

তার অবসর কম, কতক্ষণ বা কতদিন সে ছুটি নিতে পারে। তা ছাড়া অর্থের প্রশ্নও আছে। অনাহারে দুর্বল শরীর, জলে পড়ে থেকে থেকে হয়ত শক্ত কোন অসুখই করেছে—সে কী বা কতটুকু করতে পারবে? এর কাছে থাকবেই বা কে!

ভাবতে ভাবতে রামরতিয়ার কথাই মনে পড়ে গেল। সে-ই নাকি মেয়েটাকে আগলে রেখেছে চিরদিন, তার জীবনধারণের উপায় বা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখনও নিয়মিত দেখাশুনো করে। এ কথা পূজারীজীই তাকে বলেছেন বহুবার। তাকেই আগে খবর দেওয়া দরকার।

কিন্তু ঠিকানা?

অনেক ভেবে মনে পড়ল কে যেন একবার বলেছিল—পুরনো শহর মণিপাড়ার

তার বাড়ি।

কেউ কি আর দেখিয়ে দিতে পারবে না? বিশেষ যখন দাইয়ের কাজ করে?

জিজ্ঞাসা করতে করতে খোঁজ মিলবেই। কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবে।

আর ইতস্ততঃ করল না।

দরজার কপাটটা টেনে দিয়ে প্রায় দৌড়তেই শুরু করল।

নেহাৎ চারিদিকে জল তাই, নইলে এতক্ষণে শিয়াল কুকুরে ওকে শেষ ক'রে দিত!...

মনের আবেগের সঙ্গে পা পাল্লা দিতে পারে না। বিশেষ জল ঠেলে যাওয়া। তখনও বেশ জল আছে রাস্তায়। শুকনো রাস্তায় যত জোরে চলা যায়, জল ভেঙে যেতে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। পা ভেরে ওঠে খানিক পরেই। রাস্তাও জোরে চলবার মতো নয়। বেশির ভাগই বড় বড় গোল গোল পাথরে বাঁধানো। পা পিছলে যায়। গেলও দু-তিনবার। জলের মধ্যে কাঁচ টিন কত কি থাকতে পারে। তবু তাগড়া জোয়ান লীলাধর—কবিদের ভাষায় বলতে গেলে প্রায় তীরবেগেই ছুটল।

পথের লোক এইভাবে পাগলের মতো দৌড়তে দেখে খুব বিস্মিতও হ'ল না। প্রশ্ন ক'রে সময় নষ্টও করল না। এই সর্বনাশের সময় এরকম উদ্বেগের অসংখ্য ঘটনাই তো ঘটছে।...

অবশেষে একসময় মণিপাড়াতেই পৌছল। এবং দু-চারজনকে জিজ্ঞাসা করতেই রামরত্তিয়াদের বাড়ি দেখিয়েও দিল একজন।

রামরত্তিয়াকে কে না জানে। এই ভাবেই তো তাকে ডাকতে আসে লোকে। আঁতুড়ের ঝি ছিল, এখন নিজেই প্রসব করায়।

পুরনো শহরে জল পৌছলেও খুব একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে নি তার উচ্চতা।

তবু রামরত্তিয়াদের মাটির বাড়ি। চারিদিকে কত ঘর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, সে হাহাকার ও আর্তনাদের মধ্যে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। ওদের দুটো ঘর, তাতে জিনিস ও মানুষ ঠাসা। ওপরে একটা চালি আছে বটে, তাতে রেজাই কাঁথা থাকে। এধারে গরু ভঁইস আছে, কিছু কিছু গম-চানা জমানো থাকে, শুকনো গোহুরি বা ঘুঁটের স্তূপ—জ্বালানি তো চলেই, বিক্রিও হয়। এ একটা প্রধান সম্পদ ওদের কাছে, এসব নিরাপদ স্থানে সরানো আশু প্রয়োজন কিন্তু সরাবে কোথায়? বিলাপ আর প্রলাপ—সেই ধরনের প্রস্তাব ছাড়া কিছু করা হয়ে ওঠে না। নিহাৎ

রামরতিয়াদের বাড়ির দেওয়াল অন্যদের চেয়ে বেশী চওড়া তাই এখনও সব গলে যায় নি—নইলে কিছুই রক্ষা করা যেত না, প্রাণরক্ষাই কঠিন হয়ে উঠত।

এর মধ্যে অপরের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। মনে ছিলও না। তাই লীলাধর প্রায় কান্নার মতো মুখ ক'রে এসে দাঁড়াতে খানিকটা বিহ্বল হয়ে চেয়েই রইল, কোথায় দেখেছে একে, কী যোগাযোগ—সেটা মাথায় পৌঁছতেই দেরি হয়।

তবে তারপর, যমুনার দুর্দশা—বুঝি বা চরম অবস্থার কথাই—শুনতে মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠল। জল কিছু কমলেও এখনও যা আছে ঢের কিন্তু সে চিন্তাও আর রইল না—জান ও মাল রক্ষার দায়িত্ব মরদেব ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রায় পাগলের মতোই ছুটল জল ভেঙে। এমন কি লীলাধরও তার সঙ্গে তাল রাখতে পারল না।

লীলাধর যতই বলে যাক, এ অবস্থা দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না রামরতিয়া।

প্রথমটা দেখেই হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। তবে চিরদিনই করিৎকর্মা তৎপর মানুষ সে, হাত পা গুটিয়ে শুধু বিলাপ করতে অভ্যস্ত নয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল নিজেকে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা পুড়ে যাচ্ছে যমুনার। জ্বরে ও অনাহারে এমন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। দু-তিনদিন এইভাবে জলে ভিজে কাপড় জড়িয়ে পড়ে থাকলে জ্বর তো হবেই, বোধহয় বুকে সর্দি বসেছে, 'নুমোনিয়া' না কি যেন বলে ডাক্তাররা—হয়ত তাই হয়েছে।

তা তো হ'ল, এখন সে কি করবে? ওপরে দড়ির আলনায় দ্বিতীয় শাড়ি ও সেমিজ তখনও ভেজে নি। এখন আগেই ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে তা পরিয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু সেদিকে হাত বাড়াতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে তার বহুদর্শী মন উপস্থিত বুদ্ধির ত্বরিৎ গতি ফিরে পেয়েছে, চিন্তা বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এ অবস্থাকে কাজে লাগাতে না পারলে এমন সুযোগ আর আসবে না।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি এখানে কিছুক্ষণ পাহারা দিতে পারবে লীলাধরজী?'

লীলাধর ইতস্তত ক'রে বলল, 'আমারও তো ওখানে অনেক কাজ বাকী। বড় জোর আর ঘণ্টাখানেক এখানে থাকতে পারি।'

'যথেষ্ট, যথেষ্ট। যাবো আর আসবো—এই গোপীবল্লভজীর মন্দিরে যাওয়া, কতটুকুই বা পথ। তুমি বাইরের দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো একটু।'

এর মধ্যেও লীলাধরের উপস্থিতির ফলাফল বা কুফলের সম্ভাবনাও তার মানসদৃষ্টি এড়ায় নি। সদাসতর্ক বহুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ওর।

আবারও প্রায় উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটল সে।

স্বরূপ গোসাঁইকে চাই তার, এই অবস্থাটা তাকে দেখানো দরকার।

কিন্তু ভেতরমহলে ঢুকতেই প্রথম যাঁর চোখে পড়ে গেল—তিনি স্বয়ং কর্ত্রী, বড়মা। অর্থাৎ শ্যামসোহাগিনী।

'কি ব্যাপার রে, অমন ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছিস? তোরও ঘর-দোর পড়ল নাকি? শুনেছি তো খুব মোটা দেওয়াল তোর—?'

'না বড় রাণীমা, অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছে। জল সরে যাচ্ছে, বোধ হয় আর কিছু হবে না।'

'তবে?'

'আমি—আমি বড গোসাঁই দাদাকে খুঁজছিলুম। বড্ড দরকার।'

'সে আজই একটু বেরোবার মতো হতে, পঙ্গতের পরই গেছে ও-বাড়ির অবস্থা দেখতে। ক'দিন তো কোন খবরই পাওয়া যায় নি। যারা সেখানে আছে তাদেরই বা কী দুর্দশা হচ্ছে কে জানে!'

বলতে বলতে শ্যামসোহাগিনীর সূচীতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়েছে।

তিনি বললেন, 'কেন বল্ দিকি? কী হয়েছে? অমন করছিস কেন? ঠিক ক'রে বল্ তো।'

কে জানে কেন, একটা কুটিল অজানা সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে রূপ নিচ্ছে ক্রমশ।

না, অভিনয় বা ইচ্ছাকৃত নয়—ভয়ে বা দুশ্চিন্তায় বা আবেগে—স্বরূপের দেখা না পাওয়ার জন্যে হতাশাতেও—কেঁদে ফেলল রামরতিয়া।

নিজের দু কান নিজেই ধরে বলল, 'আমার অপরাধ নেবেন না বড় রাণীমা—বহুরাণীর অবস্থা খুব খারাপ—সেই কথাই—'

কথা শেষ করতে পারল না, কতকটা ভয়েই—থেমে গেল।

'বহুরাণী! সে কি! তাকে কোথায় পেলি? এখানে আছে? কতদিন?'

এবার সবই খুলে বলল রামরতিয়া।

আছে তিন চার সাল। চরম দুর্দশায় আছে সে। ইচ্ছে ক'রেই সে কষ্ট করছে, তপস্যার মতো ক'রে। ঠিক এতটা কষ্ট না করলেও চলত, এটা যে কতকটা প্রায় প্রায়শ্চিত্তই করা—সে যে স্বামী আর শাশুড়িকে ইষ্টজ্ঞানেই প্রত্যহ 'ধেয়ান-পূজা' করে—সে কথাও। বোধ হয় কোন তথ্যই বাদ গেল না।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল রামরতিয়া, কী কৃচ্ছ্রসাধন যে ঐ কচি মেয়েটা করেছে, তার মধ্যেই কত প্রলোভন, কত আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে—সব

বলল। কেমন ক'রে এসেছে বুড়ো বৈরাগীদের সঙ্গে, এক বস্ত্রে নিঃসম্বল অবস্থায়, খবর পেয়ে রামরতিয়াই এই আশ্রয়টুকু ক'রে দিয়েছে—কাকে কাকে ধরে জীবন-ধারণের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছে—সে সব কথাও। এর থেকে একটু ভাল ব্যবস্থাও হয়ত ক'রে দিতে পারত, বহুরাণীই তা নেন নি। নুন দিয়ে শুকনো রুটি খেয়ে দিন কাটিয়েছে।

এমন কি, সর্বশেষে—গোপনে গিয়ে স্বরূপকে দেখে আসার সে মর্মন্তুদ বিবরণও।

বলা শেষ হলে আবারও কেঁদে ফেলল।

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গিছলেন শ্যামসোহাগিনী। এমন যে হতে পারে এমন যে সম্ভব—তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না, এর মুখ থেকে এমন ভাবে না শুনলে।...

প্রবল বিস্ময়ের এই আকস্মিক আঘাত সামলে নিতে এমন কি তাঁরও দেরি হ'ল। কি ঘটেছে সবটা ভেবে নিতেই তো সময় লাগল বেশ কিছুটা।

তার পর, যখন বাক্শক্তি ফিরে পেলেন, মন বাস্তবে নেমে এল, তখন প্রথমেই মনে জাগল—স্ত্রীলোকের পক্ষে যা স্বাভাবিক—আর একটা কুটিল প্রশ্ন।

'খোকা—মানে তোর গোসাঁইদাদা কিছু জানে এ সবের?'

'না না বড় মা। কী বলছেন! এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। সে-ও এ কথা মুখে উচ্চারণ করে নি। মনেও আসে নি আমাদের—আজ এই বিপদে পড়েই —আমারও তো অবস্থা বুঝতে পারছেন!...এই প্রভুজীর ঘরে দাঁড়িয়ে বলছি, আপনি আমার গুরু—মিছে কথা বলে নরকে ডুবব না, তিনি কিছুই জানেন না। বহুরাণীদিদিও সে কথা মুখে একবার উচ্চারণ করে নি। এ দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মতো তা সে জানে।'

অবিশ্বাসের কারণ নেই, করলেনও না কর্ত্রী। একটা বহুক্ষণ চেপে-থাকা নিঃশ্বাস ফেলে 'দাঁড়া' বলে ভিতরে চলে গেলেন, একটু পরে ফিরে এসে দুখানা দশ টাকার নোট আলগোছা রামরতিয়ার হাতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যা, এখন ডাক্তার পথ্যি ওষুধ—অন্য জিনিস যা লাগে কিনে দে—তবে আমার নাম না করাই ভাল। তার ভালর জন্যেই বলছি!'

কে জানে এ নিঃশ্বাসটা কিসের। এমন মেয়ে তাঁদের কাজে লাগল না, মাঝখান থেকে তাঁর ছেলের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল—এই জন্যেই কি?

মন্দিরের বাইরে এসে আবার জোরে পা চালাতে যাবে, ঠিক সেই সময় সামনে এসে পড়লেন স্বয়ং স্বরূপ গোসাঁই। সাইকেল ক'রে শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের বাগান-

বাড়ির হাল দেখে ফিরে আসছেন।

রামরতিয়ার কান্নায় ভেজা চোখ, হাতে দুখানা নোট দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'কী হয়েছে দাই দিদি, তোমার ঘর-দোর ভাঙল নাকি? না অন্য কোন বিপদ-আপদ?...কই ওদিকে তো বানের জল বেশী দূর ওঠে নি। তোমার ঘরের দেওয়ালও তো খুব চওড়া—!'

'না বড় গোসাঁইদাদা, এমন খুব একটা নুকসান হয় নি, এ অন্য লোকের কথা, অন্য ব্যাপার।'

এতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরে চলে যাবার কথা গোসাঁইজীর, যাচ্ছিলেনও তাই, কিন্তু সেই সময়ই আবারও রামরতিয়ার দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল।

বোধ হয়—যাকে এসব কথা জানাতে চায়, জানানো উচিত বলে মনে করে তাকে জানাতে পারছে না—এই আকুলতায়।

স্বরূপ বুদ্ধিমান, সঙ্গে সঙ্গেই একটা সন্দেহ মনে এল, অন্য লোক অন্য ব্যাপার— তবে এত কান্নাকাটির কি আছে? ওঁকে দেখেই বা চোখে এত জল উপচে পড়ল কেন আবার? মা কি কোন ব্যাপারে খুব তিরস্কার করেছেন? এ অবস্থায় কেনই বা করবেন? তা ছাড়া মা রামরতিয়াকে স্নেহ করেন বিশ্বাসও করেন, পুরনো লোক— একটু-আধটু বকাঝকা গা-সওয়াও হয়ে গেছে এতদিনে।

তিনি বললেন, 'ব্যাপার কি খুলে বল তো দিদি, কী হয়েছে ঠিক। কেউ কিছু বলেছে? এমন কি ঘটল? কোন বিপদ-আপদ—?'

আর থাকতে পারল না রামরতিয়া। এমনিই মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, আর তা না হলেও—একেই তো বলতে চায় সে, একেই তো বলতে এসেছিল!

সে বলেই ফেলল, সমস্ত ইতিহাস, আনুপূর্বিক।

নবদ্বীপ থেকে যমুনার এখানে আসা, অসহায় নিরাশ্রয়, প্রায় একবস্ত্রে, কেবল মাত্র স্বামীকে দেখার জন্যেই এত আকুলতা; রামরতিয়া তার জীবনধারণ ও আশ্রয়ের কোন রকমে একটু ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে; তার প্রায়শ্চিত্ত বা তপস্যার জন্যে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা—পোড়া রুটি আর নুন খেয়ে; একবার দেখার জন্যে ব্যাকুলতা; লুকিয়ে দেখতে যাওয়া; তারপর ফিরে এসে আবেগের যন্ত্রণায় পাথরে মুখ ঘষে রক্তাক্ত ক'রে তোলা; স্বামী ও শাশুড়িকে ইষ্টের আসনে বসিয়ে ধ্যান পূজা; শেষে এই বন্যা। কী অবস্থায় পড়ে আছে—তবু কোথাও যায় নি।

যা ঘটেছে তা তো বললই, কিছু হয়তো বর্ণাঢ্য ক'রেই বলল। বহু বাড়িতেই যাতায়াত, বড় বড় ধনীগৃহেও—তার ফলে কথা সে বলতে শিখেছে, বলতে জানে।

এও বোঝে যে, এ সুযোগ হারালে আর কোন সদ্গতি হবে কিনা ইহজীবনে, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ।

স্থির হয়ে শুনতে শুনতে পাথরের মতোই হয়ে গিছলেন স্বরূপ গোসাঁইও।

মনে প্রচণ্ড ঝড় উঠলেও মুখে তা প্রকাশ পেল না। আরও কিছুক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, উদ্গতোন্মুখ দীর্ঘনিঃশ্বাসটা প্রাণপণে দমন ক'রে শুধু বললেন, 'তুমি এসো, আমি সাইকেলে চলে যাচ্ছি।'

'চিনতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ, ও বাড়ি আমার চেনা।'

১৬
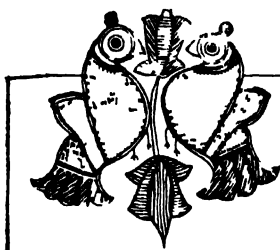
জ্বর কমলেও হুঁশ ফিরে আসতে আরও আট ন দিন সময় লাগল।

তবু, স্বরূপ এখানে পা দেওয়ার পর ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি ঘটে নি। ঘর পরিষ্কার করা, শুক্‌নো কাপড় জামা পরানো, তার আগে গা গরম জলে স্পঞ্জ করানো, একটা চলনসই বিছানা যোগাড় করা—সবই হয়েছে। রামরতিয়াই করেছে—ওঁর নির্দেশে এবং কোথা থেকে কি আসবে—আসতে পারে—তা বলে দেওয়ায়।

সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছে, এটা করেছেন তিনি নিজে।

রামরতিয়া গৌর ডাক্তারকেই ডাকতে চেয়েছিল, স্বরূপ ঘাড় নাড়লেন, 'না, এ শক্ত কেস, গৌরবাবুকে দিয়ে হবে না। আমি দেখছি।'

সোজা চ'লে গেলেন তিনি কালাবাবুর কুঞ্জে, প্রভাস মহারাজকে* বলে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তারকে ধরে আনলেন। জলের মধ্যে কোন ওষুধের দোকান খোলা পাবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ ক'রে মহারাজই বলে দিলেন, 'ওষুধপত্র যা লাগে এখান থেকেই নেবেন। পরে দাম দেবেন বা কিনে দেবেন।'

তাঁর দ্বারাই খোঁজ খবর ক'রে একটি সেবিকাও যোগাড় করা গেল। নার্স বা আয়া নয়—তখন ওখানে এসবের চল হয় নি—এক বয়স্কা ব্রাহ্মণ বিধবা মহিলা মাসিক দশ টাকা বেতনে এ কাজ করতে রাজী হলেন, তাঁর জন্যে কাছের এক কুঞ্জ থেকে একটা পারসের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।...

এ কদিনে চোখ যে একেবারে মেলে নি তা নয়, তবে সে অসুস্থ বিহ্বল দৃষ্টি, তাতে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'ল—শ্রান্ত হলেও পারিপার্শ্বিক দেখা বা বোঝার মতো—কৃষ্ণা ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে।

কিন্তু চেয়ে দেখে যেন আরও বিহ্বল হয়ে পড়ল যমুনা।

এ কোথায় সে, কোন্ পরিবেশে? এ বিছানা, পাশে একটা প্যাকিং বাক্সর মতো কি উপুড় করা—তার ওপর ওষুধের শিশি, ফিডিং কাপ, জলের গ্লাস—এসব কোথা

---

* স্বামী বেদানন্দ, তদানীন্তন সেক্রেটারী। পূর্বাশ্রমে সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের অনুজ ছিলেন।

থেকে এল ? কী সব, কারা আনল ? তার ঘরে তো থাকার কথা নয়।

তাকে কি অন্য কোথাও এনেছে নাকি কেউ ? তবে কি হাসপাতালে এসেছে সে ?

কিংবা—। অবসন্ন মস্তিষ্কেও একটা আশঙ্কা দেখা দিয়ে ভয়ে যেন শিউরে উঠল। কেউ ওকে কোন কু-স্থানে নিয়ে এল না তো ?

কিন্তু ছাদটার দিকে চেয়ে, দেওয়ালগুলো, কাতার দড়ি টাঙানো আলনা—এগুলো দেখে তো আবার মনে হয়—সেই ঘরেই আছে। তবে ?

বেশী ভাবতে পারল না, চোখ বুজল আবার।

বেশ খানিকটা পরে আবার যখন চোখ খুলল, চোখে পড়ল পরিষ্কার থান ধুতি পরা এক বিধবা ভদ্রমহিলা।

এ আবার কে ? কোথা থেকে এল ? কেনই বা ?

মহিলা কাছে এসে সস্নেহে গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'ঘুম ভাঙল মা ? কেমন লাগছে এখন ?'

খুব আস্তে প্রশ্ন করল যমুনা, 'এ আমি কোথায় এসেছি, এ—এসব কি ? আপনি ? আপনাকে কে আনল ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না !'

'তুমি কোথাও আস নি মা, সেই ঘরেই আছ। ঘর দেখে বুঝছ না ? তোমার যা অবস্থা হয়েছিল—যে অসুখ—নড়ানো যায় কি ?·· আমাকে তুমি মাসিমা বলেই ডেকো। আর একটু সুস্থ হ'লে সব পরিচয় পাবে। এখন বেশী কথা ব'লো না। ডাক্তারের নিষেধ আছে।'

কিছুই বুঝতে পারল না। যেন আরও ঘুলিয়ে গেল চিন্তাটা মাথার মধ্যে।

সে আবারও চোখ বুজল।

বেশী কথা বলার শক্তিও নেই তার।···

হয়ত এবার সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ ঘুম ভাঙল খুব পরিচিত এক কণ্ঠস্বরে।

রামরতিয়া।

চুপি চুপি প্রশ্ন করছে, 'কেমন বুঝছেন বাহুমন মা ? হুঁশ আসবে এবার মনে হচ্ছে ?'

মাসিমা খুশির সুরে বললেন, 'হুঁশ এসে গেছে, কথাও বলেছে মেয়ে—তবে এসব কিছু বুঝতে পারছে না তো, তাই আমিই বলেছি পরে সব জানতে চেও, এখন বেশী কথা ব'লো না।'

আবারও চোখ খুলল যমুনা, স্বচ্ছতর দৃষ্টি এবার, ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল, 'রামরতিয়া!'

প্রায় এক লাফে বিছানার পাশে এল।

'হ্যাঁ বহুরাণী দিদি। আমি তোমার সেই নৌকরীন্! বাব্‌বা, যা কাণ্ড বাধিয়েছিলে! ভাবিয়ে পাগল ক'রে তুলেছিলে সবাইকে!'

'এ—এসব কি? এত জিনিস, ওষুধ—এ তোমার কাজ। এত খরচ করতে গেলে কেন? আমাকে মরা বাঁচাতে গেলে কেন মিছিমিছি!'

এ সময় এতখানি সুসংবাদ শোনানো—অপ্রত্যাশিত, সুদূর আশা-কল্পনারও অতীত সুবার্তা—শোনানো উচিত নয়—এ জ্ঞান যে ছিল না তা নয়—তবু থাকতে পারল না রামরতিয়া, বলে উঠল, 'আমি? আমার এত কি সাধ্যি বহুদিদি, খাস মালিক তোমার, বড় গোসাঁইদাদা নিজে, খবর পেয়ে ছুটে এসে এই হাল দেখে ডাক্তার ডাকা, লোক রাখা, ওষুধ পথ্যি,—সব তিনি, সব কিছু তিনিই করেছেন, নিজে হাতে সব করেছেন!'

'কে—কে বললে—?' আর্তনাদের মতোই শোনাল।

'বড় গোসাঁইদাদা গো, তোমার মরদ!'

আর সহ্য হ'ল না, আবারও অজ্ঞান হয়ে গেল যমুনা।

মাসিমা যথেষ্ট তিরস্কার করলেন, রামরতিয়ারও লজ্জার পরিসীমা রইল না।

মহিলা অবশ্য ওকে বকতে বকতেই কাজে লেগে গেলেন। মুখে কপালে জলহাত দিয়ে একটু বাতাস করতে বললেন, তারপর নিজে একটু চিনির জল গরম ক'রে নিয়ে ফিডিং কাপে ক'রে আধ চামচ হিসেবে খাওয়াতে লাগলেন মধ্যে মধ্যে।

তাতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল—এ আঘাত সামলে নিয়ে চেতনা ফিরতে।

চোখ মেলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে, এত দুর্বল।

আকস্মিক এত বড় আঘাত, সোজা বোধ হয় হার্টে গিয়ে লেগেছে। দুর্বলতা বেশী হয়ত সেই কারণেই।

চেয়ে দেখল কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারল না। ওকে চোখ মেলতে দেখেই রামরতিয়া বাইরে চলে গেছে। এরপর তাকেই এসব প্রশ্ন করবে, তার কাছেই সব জানতে চাইবে—আর নয়, খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

আর সে অনুমানটা মিথ্যাও নয়, কারণ কথা বলার মতো অবস্থা হতেই যমুনা ডাকল রামরতিয়াকেই।

'রাম—রামরতিয়া কোথা গেল?'

মাসিমা বললেন, 'সে বাইরে গেছে কী এক ওষুধ লাগবে, তারই খোঁজ করতে। তুমি আর এখনই এসব খবরের জন্যে ব্যস্ত হয়ো না মা, ক্রমশ নিজেই জানতে

পারবে। বলতে গেলে মরণের মুখ থেকে ফিরে আসা—বেশী কথা বলা একেবারে বারণ ডাক্তারের।'

অগত্যা চোখ বুজল আবার যমুনা।

কতকটা বাধ্য হয়েও, কারণ বেশী কথা বলা বা শোনার শক্তি ছিলও না।

কিছু সচেতনতা, কিছু আচ্ছন্নতা—এর মধ্যেই ঘণ্টা তিনেক কাটল।

মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে পৌঁছল।

তার ভেতরই কানে গেল দুবার দুটি পুরুষের গলা। মনে হ'ল খুব দূরাগত সে প্রশ্নের শব্দ—'ক্যায়সা হ্যায় আভি বাহুমন মা, ক্যায়সা সমঝতে হ্যায় আভি?'

একটি সম্ভবত পূজারীজীর—আর একটা কি লীলাধরের?

ঠিক বোঝা গেল না।

মাসিমা নিশ্চয়ই উত্তর দিলেন কিছু, তাও শোনা গেল না। এতই আস্তে বা ইঙ্গিতে দেওয়া হ'ল সে উত্তর।

তবে এ যে সেই বাড়ি সেই ঘর—তাতে আর সন্দেহ রইল না। কেবল পরিবেশটা ভিন্ন।···

সন্ধ্যার দিকে আরও পরিষ্কার হয়ে এল দৃষ্টি, যদিও কণ্ঠস্বর যেন দুর্বলতর শোনাল। মধ্যাহ্নের সেই প্রবল আবেগাঘাতের ফল।

তবু তারই মধ্যে ক্লান্ত দুটি চোখ মধ্যে মধ্যেই দরজার দিকে চাইতে লাগল।

না, আশা নয়—আশা করা বা মনে মনে সে চিন্তা পোষণ করা মূর্খতা।

যদি সত্যিই তিনি এসে থাকেন বা এ ব্যবস্থা তাঁরই হয়—আতুরের প্রতি, মৃত্যু-পথযাত্রীর প্রতি করুণা।

নিতান্তই দয়া—বা মানবতার কর্তব্য। তাঁর মতো মহান মানুষেরই শোভা পায় এক্ষেত্রেও সে কর্তব্যবুদ্ধি স্মরণ রাখা।

বা দয়া। দয়াই।

উনিই পারেন, দয়া করতে গিয়ে লোকের বিদ্রূপকেও উপেক্ষা করতে। তাই বলে কি আবারও আসবেন? কানে কি আর যায় নি যে তার জ্ঞান ফিরেছে।

আর কেন? আবারও কেন!

যে সর্বাধিক ক্ষতি করেছে তাকেও দয়া ক'রে বাঁচিয়েছেন।

সে যে ওঁকে ঈশ্বরের এক রূপ ভেবে পুজো করেছে—কিছু ভুল করে নি। ঠিকই করেছে।

এমনিই সব এলোমেলো চিন্তা।

একটানা কি এক ভাবে নয়। মধ্যে মধ্যে চিন্তারও খেই হারিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ আসছে বিস্মৃতি, শ্রান্তি।

তন্দ্রার মতো আচ্ছন্নতা, আর একটু পরেই চমকে জেগে উঠে তাঁর কথাই ভাবছে। কী পেয়েছিল সে, কী হারাল।

চিরদিনের মতো।

যে হাতে অমৃত দান করতে চেয়েছিলেন, সেই হাতেই বিষ তুলে দিয়েছে সে।

পুড়িয়ে দিয়েছে সে হাত।...

বেচারী জানতেও পারল না—এসেছিলেন তিনি ঠিকই, সংবাদের আকস্মিকতায় ও অভাবনীয়তায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা শুনে ফিরে গেছেন। প্রায়-মুমূর্ষু রোগীকে প্রবল আবেগ আরও বেশী ক'রে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

শুধু আর কোন ওষুধ চাই কিনা প্রশ্ন ক'রে বা অন্য কোন পথ্য, রামরতিয়ার হাতে খুচরো খরচের মতো কিছু টাকা আছে কিনা জেনে সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেছেন।

পরের দিনটাও কাটল আশা-নিরাশায় দোল খেয়ে।

তার পরের দিন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, ডাক্তার অল্প দুধ ভাত খেতে বলেছেন, এবং তা খাওয়ানোও হয়েছে—খবর পেয়ে একেবারে অপরাহ্নের দিকে, চারটে নাগাদ হঠাৎই এসে ঘরে ঢুকলো—যমুনার আশাতীত আশার ধন, তার ইষ্ট, তার পজ্য, তার প্রিয়তম।

তেমনিই প্রবল আঘাত—তেমনিই মনে হ'ল বুকের নিঃশ্বাস থেমে যাবে এখনই—কিন্তু তত টা দুর্বলতা আর নেই বলে, অন্ন পথ্য পেয়ে কিছুটা সহ্য করার শক্তি ফিরে পেয়েছে বলেই আর অজ্ঞান হয়ে পড়ল না। তবু বুকটা চেপে ধরতে হ'ল—আর স্বরূপ গোসাঁইয়ের সেটা চোখ এড়াল না।

রোগীর বিছানারই একপাশে বসে একেবারে গায়ে একটা হাত রেখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'আজ কেমন আছ? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?'

উত্তর দিতে গিয়েও দেওয়া হ'ল না, দেওয়া বুঝি সম্ভবও নয়—ঠোঁট দুটোই কাঁপল দু-একবার—শুধু দুই চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল।

'এই ছাখো', সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বললেন, 'এই ভয়েই তো দুদিন ভেতরে ঢুকি নি, বাইরে থেকে খবর নিয়ে চলে গেছি!...শরীরটা বেশী খারাপ করার ইচ্ছে হয়েছে?'

'দুদিন এসে ফিরে গেছেন' এই সংবাদটিই বলবর্ধক ইঞ্জেকশনের কাজ করল।

স্বরূপও তা বুঝেছিলেন, তাই সর্বাগ্রে এই খবরটা দিয়েছেন।

ক্রমে ক্রমে একটু সামলে নিল যমুনা।...

ঘরে কেউ নেই, স্বরূপকে আসতে দেখেই মাসিমা বাইরে চোখের আড়ালে চলে গেছেন।

যমুনা যে ওঁর স্ত্রী তা গোপন করেন নি স্বরূপ—কেউ প্রশ্ন না করলেও গোপন করার চেষ্টাও করেন নি। অত রাশভারী লোককে এ রহস্যের অর্থ কি তাও প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি কারও।

বয়স্কা মহিলা, মাত্র পাঁচ ছ বছর আগের 'কেচ্ছা' কি আর কানে যায় নি। যতই নিঃশব্দে কাজ সারুন শ্যামসোহাগিনী, একেবারে গোপন করা সম্ভব নয়—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী সে আশাও করেন নি।...

একটু সামলে নেওয়ার পর প্রথম অর্ধস্ফুট কণ্ঠে যে শব্দ উচ্চারণ করল যমুনা—তা হ'ল, 'পা—'

আর পারল না কিছু বলতে, ইঙ্গিতে পায়ের দিকটা দেখিয়ে দিল।

হয়ত এটাও জানতেন স্বরূপ, ওঁর পায়ের প্রতি স্ত্রীর দুর্বার আকর্ষণ, আশ্রয়ের জন্য ঐকান্তিক আকুলতা—

স্বরূপ বৃথা বাদানুবাদ করলেন না। পকেট থেকে রুমালটা বার করে পা একটু ঝেড়ে নিয়ে ঘুরে বসে পা তুলে দিলেন ওর দিকে।

কৃতার্থ যমুনা মাথাটা নামিয়ে কাছে এনে—যতটা ওর পক্ষে এ অবস্থায় সাধ্য—সবলে মুখখানা চেপে ধরল।

আবারও নামল অশ্রুর ধারা। বরং তাকে বর্ষণ বলাই উচিত।

এ সৌভাগ্য যে এ জীবনে আর কোনদিন আসবে—এ আশা ক'দিন আগেও তো ছিল না। এতদিনের এত মর্মান্তিক দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস এই নীরব বর্ষণের মধ্যেই সে যেন নিবেদন করতে চায়।...

তিন চার মিনিট অপেক্ষা করলেন স্বরূপ, তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা সরিয়ে আবার বালিশের দিকে তুলে দিয়ে নিজের পা নামিয়ে নিলেন।

শ্রান্ত যমুনা আঁচলে চোখ মুছে একটু পরে বলল, 'কেন এ কাজ করতে গেলেন। এত দয়া। ছি ছি! আমি যে এর যোগ্য নই। এর পর কি আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবেন?'

'মুখ দেখাবার জন্যে আমি খুব ব্যস্ত একথা কে বললে তোমাকে বিশাখা, আমি তো সমাজ সংসার থেকে সরেই গেছি প্রায়। মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন এসে সকালের সেবাপূজা বা রাত্রের আরতি করতাম। যেদিন তোমার খবর পেয়েছি সেইদিন

থেকে তাও বন্ধ করেছি। সোজা বাগানবাড়িতে চলে যাই, সেখান থেকেই আসি।'

বিশাখা! বহু—বহু দিনের মধু ও বিষের স্মৃতিমাখা নাম!

আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বিশাখা বলে, 'মা খুব আঘাত পাবেন—'

'তা হয়ত পাবেন। পাবেন কেন, পেয়েছেন।'

'তিনি জানেন? শুনেছেন? আপনি এইভাবে দেখাশুনো করছেন—'

চমকে ওঠে বিশাখা।

'জানেন বৈকি। আমি তো তাঁর কাছে কোন কথা গোপন করি না। তা ছাড়া, রামরতিয়া তো আগে তাঁর কাছেই গিছল। মা-ই প্রথম টাকা দিয়েছেন ওর হাতে—তোমার চিকিৎসার জন্যে।'

'মা! মা দিয়েছেন?'

একটু হাসেন স্বরূপ, 'তুমি নাকি বলেছ রামরতিয়াকে, তোমার দেবীর মতো শাশুড়ি, তাই তাঁকে পুজো করো। কথাটা কি তোমার মনের কথা নয়?'

'মনেরই কথা। ও অবস্থায় উনি যা দয়া করেছেন, কেউ তা করে না।...এ, অপর কেউ শুনলেও বিশ্বাস করবে না।'

অতিকষ্টে, থতিয়ে থতিয়ে কথা-কটা বলে। বলতে বলতেই মনে হয়—এ প্রসঙ্গ না তোলাই উচিত ছিল, ক্ষতর জ্বালা বাড়িয়ে তোলা শুধু শুধু।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। হেমন্তর সন্ধ্যা আসতে দেরি হয় না।

তার মধ্যেই খুব আস্তে, প্রায় চুপিচুপি বলে, 'কেন আমাকে এমনভাবে বাঁচাতে গেলেন আপনারা! আমাকে তো আর গ্রহণ করতে পারবেন না! আমাকে মরতে দেওয়াই উচিত ছিল!'

'মা পারবেন না। আমাদের দেবতার সংসার, তাঁরই সম্পত্তি। আমরা সেবাইৎ মাত্র। আমাদের সেখানে হাত-পা বাঁধা। কিন্তু আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি? সে কথা তো কেউ জিজ্ঞাসাও করে নি। আমিও কাউকে কখনও বলি নি। এ প্রশ্নই তো ওঠে নি।'

বলতে বলতেই স্বরূপ উঠে দাঁড়ান।

'আর না। এতটা কথা বলাই অন্যায় হ'ল। আমি যাই। দিন দুই তিন এদিকে আসা হবে না, গোকুলে যেতে হবে। তবে এদের সব বলা আছে। ডাক্তারবাবুকেও বলেছি আমি থাকব না, তিনি রোজ আসবেন।'

আর কোন অনাবশ্যক কথা না বলে, বা কোন বিদায় সম্ভাষণ জানাবার চেষ্টা না ক'রে স্বরূপ একেবারেই ঘরের বাইরে চলে যান।

আবেগের পর আবেগের আঘাত দেওয়াটা এমন ভাবে—উচিত হ'ল না।

১৭
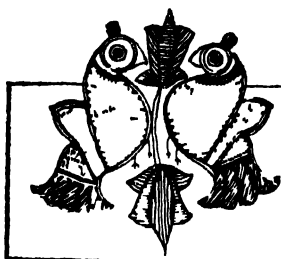
এ কী শুনল সে।

আশা ? আশ্বাস ? স্তোক ?

রোগিনীকে দ্রুত সুস্থ করাব জন্যে নতুন ওষুধের ব্যবস্থা ?

তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে। এ কেমন ক'রে হয়।

সত্যিই কি শুনল কথাগুলো ?…এমনও একবার মনে হয়।

অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য। এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য। কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না।··

সে পাগল হয়ে গেল না তো ? সত্যিই কি স্বরূপ এসেছেলেন ? না না, এসব কথা সত্যিই কেউ বলে নি। এ—এ ওর বিকারের ঘোর। ·

তবু যেন কি হয়—এই নিদারুণ সংশয়ের মধ্যেও—

চারিদিকে যেন কত অদৃশ্য সহস্র যন্ত্রের অজানা অপরূপ সঙ্গীত বেজে উঠতে চায়।

মনে হয় আকাশ বাতাস জুড়ে বহু বাতি জ্বলে উঠেছে। হেমন্তের অপরাহ্ণ-ম্লানিমা কোথাও কিছু নেই।

আলো গান আনন্দ আশা শুধু—চারিদিকে।

তার মানেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

ক্লান্ত অবসন্ন বিশাখা—না, যমুনা কেন আর থাকবে ও, ঐ তো উনি সেই নামে ডাকলেন বিশাখা বলে, কলঙ্ক লাগা নাম শুদ্ধ হয়ে উঠল শুদ্ধসত্ত্ব মানুষটার উচ্চারণে—চোখ বুজল।

কিছু আর ভাববে না সে।

এখন যদি এ অসুখ থেকে না ওঠে তো সবচেয়ে ভাল হয়।

আর, মরতেই তো চেয়েছিল।

আচ্ছা, সত্যিই সে মরে যায় নি তো ? এ যা সত্যি মনে হচ্ছে তা সত্যি নয়।

মরার পরের এক স্বপ্নলোক, মায়ালোক ? মৃত্যুর পারে সবই হতে পারে।

স্বর্গ ? হ্যাঁ, তাও হতে পারে। এই স্বর্গই রচনা করেছে সে মনের ইচ্ছা দিয়ে

কিন্তু—

চোখ খুলে প্রায়ান্ধকার ঘরে একবার চেয়ে দেখল। ঐ তো ছাদ দেখা যাচ্ছে—পাথরের বড বড টালি বসানো, কড়িও নেই বরগাও নেই। এই দরজা সেও তো তেমনি আছে—আলকাতরা দিয়ে রঙ করা। বাক্স উপুড করা টেবিলে এসব ওষুধের শিশি, গ্লাস, ফিডিং কাপ—এও স্বপ্ন ?

তবে অবশ্য এও মায়া বা স্বপ্নেরই অঙ্গ হতে পারে বৈকি।

সত্যি হলে এসব কোথা থেকে এল ?

কে এত খরচা করবে—এ হতভাগীর জন্যে ?

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তার নতুন পাওয়া মাসিমা।

'ওমা, বড গোসাঁই কখন নিঃশব্দে চলে গেছেন তা টেরও পাই নি। তাই আরও ঘরে আসি নি। দুধ বাল্লি জুডিয়ে যাচ্ছে দেখে সাডা দিয়ে ঘরে ঢুকব—দেখি জুতো নেই। তাতেই বুঝলুম বডদা চলে গেছেন।…নাও, এখন এটুকু খেয়ে নাও দিকি!' বলতে বলতে এক হাতে একটু তুলে বসিয়ে দিয়ে বার্লির গ্লাস মুখে ধরলেন।

এও কি মৃত্যু পরপারের ঘটনা ? স্বপ্ন বা মায়ালোকের ?

কথা বলার ইচ্ছা বা শক্তিও যেন নেই। খেতে ইচ্ছে করছে না বললেই অনেক কথা উঠবে—তাই কোন মতে বার্লিটা খেয়ে নিয়েই আবার শুয়ে পডল।

'ও মা, এখনই আবার শুয়ে পডলে কেন মা, একটু নিজে নিজে বসো না।'

'একটু পরে উঠে বসব মাসিমা, এখন থাক।'

চোখ বুজে বুজেই বলে।

'অনেকক্ষণ কথা বলেছ বুঝি! তাই ক্লান্ত লাগছে! তা শোও, আর একটুন শুয়ে থাকো। আমি বরং গা-হাত একটু টেনে দিই—'

গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে—মানে একটু জোর দিয়েই, কতকটা গা-টেপা ধরনেরই—হঠাৎ নিজেই হেসে উঠলেন মহিলা।

চমকে উঠল বিশাখা।

কোথায় যেন কি একটা যোগাযোগ মনে হতে লাগল, এই হাসির সঙ্গে স্বরূপের উপস্থিতির।

আড়ি পেতে শুনছিলেন নাকি ? তা তেমন তো কোন কথা হয় নি!

ঐ, আবারও ঘুরে ফিরে স্বপ্নকে সেই বাস্তবের সঙ্গেই জুড়তে চাইছে সে।

যেন এসব বাজে চিন্তা মুছে ফেলার জন্যেই—হাত দিয়ে যেমন মাছি তাড়াতে চায় লোকে—সেই ভাবে, হঠাৎই প্রশ্ন করল—মনে হ'ল একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই—'অত হাসছেন যে।'

'আর ব'লো না মা। হাসি কি আর সাধে। ঐ রামরতিয়াটা! ও লণ্ঠনটা মুছে তেল ভরে দিচ্ছিল, আমিই বলেছিলুম, ও ই জ্বালবে ভাবছি—তাই একটু বাবা মহাবীরের ঘরে গেছি পেন্নাম করতে—মনে হ'ল বোধ হয় আড়ি পেতে কিছু শুনে থাকবে তোমাদের কথাবার্তার—ওমা বেরিয়ে দেখি সেই অন্ধকারের মধ্যে বুড়ো মাগী দু'হাত তুলে নাচের অঙ্গিভঙ্গী করছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতে বলে, 'তুমি আলোটা জ্বালিয়ে ঘরে নিয়ে যাও বাহ্মন মা, যদি মোড়ের দোকানটা খোলা থাকে আমি এখনই একটু পেঁড়া কিনে এনে মহাবীরজীর ঘরে দিই—তাজা তাজা।'...

আবারও জীবনের ছেঁড়া তারগুলো যেন আপনি আপনি এসে জোড়া লাগে। আবারও সেই হাজার বাজনা বেজে ওঠে, অন্ধকার বাইরের আকাশে অসংখ্য বাতি জ্বলতে চায়—দেওয়ালির মতো।

তাহলে কি যা শুনেছে তা সত্যিই।

নইলে রামরতিয়া সত্য সত্য মহাবীরের পুজো দেবার জন্যে দৌড়ত না। এ জগতে বোধ হয় এই একটিই লোক আছে, রক্তের সম্পর্কের থেকে অনেক অনেক বেশী আপন। একমাত্র নিঃস্বার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী।

ছোট কাজ করতে হয়, বলে সকলে। অথচ এটা তো একান্ত প্রয়োজনীয় কল্যাণ কর্মের অঙ্গীভূত। তবু ছোট জাতের মধ্যে ধরে নিয়েছে, ভেতর বাড়িতে যাবার জো নেই, দূর থেকে আলগোছা টাকা দেয়—ওকেও দু হাত পেতে নিতে হয়, প্রসাদ কি মিষ্টি খাবার দিতে হ'লে পাতায় ক'রে সামনে মেঝেতে নামিয়ে দেয়। অথচ বিশাখার তো মনে হয় এই মানুষ ওর সবচেয়ে বেশী প্রণম্য। মহাপ্রাণ মানুষ। দিদি তো বলেই—মন থেকেই বলে—রামরতিয়া নিজে লজ্জা পাবে তাই, নইলে নিত্য পায়ের ধুলো নিত।...

এতগুলো বিভিন্ন বিচিত্র ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত, আধো মূর্ছিত আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইল। রামরতিয়া পেঁড়া কিনে আনিয়ে বাইরে থেকে পূজারীর সামনে রাখিয়ে দিয়েছিল, পূজারীজী প্রসাদ ক'রে এনে এ ঘরে দিয়ে গেছেন কখন—সে সব কিছুই জানে না বিশাখা।

ডাক্তারও একবার এসেছিলেন, বড় গোসাঁই নাকি খবর নিতে বলে গিছলেন। তিনি দেখে ইশারা ক'রে এদের বাইরে ডেকে বললেন, 'এটা মানসিক ক্লান্তি, রেস্ট-

এ আছে, থাকুক। ঘুম ভাঙলে যা খাবার খাবে, তোমরা ডেকে ঘুম ভাঙিও না।'

ঘণ্টাখানেক পরেই অবশ্য এ ভাবটা কেটে গেছে, সচেতনতা এসেছে।

মনেও পড়েছে সব কথা।

কিন্তু আগেকার বিপরীতমুখ ভাবোচ্ছ্বাসটা নেই আর, একটু প্রশান্তি এসেছে।

সচেতনতা যে এসেছে তা আর এদের জানাল না তখনই। চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে আদ্যন্ত নিজের কথাই ভাবতে লাগল।

ভগবান তাকে নিয়ে কি নিদারুণ নিষ্ঠুর খেলাই খেললেন! হয়ত এখনও খেলছেন!

কেন? কেন? সেইটেই তো ভেবে পায় না।

ওর কি কোন দোষ ছিল? ওর চিন্তা বা কর্মের মধ্যে জ্ঞানত কোন কলুষের ছোঁয়া?

তবে?

তবে কেন সৌভাগ্যের চরম শিখরে তুলে এমন ভাবে লাঞ্ছনার অন্ধ শিলায় আছড়ে ফেলবেন? এমন ভাবে পাপী অস্পৃশ্য ব'লে চিহ্নিত ক'রে দেবেন চির-জীবনের মতো?

আজ অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য বলে যা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে মৃত্যুপারের ঘটনা এসব —এ কি নতুন ক'রে প্রাপ্য তার?

বেশী যেন ভাবতেও পারে না, আবারও উত্তেজনায় জট পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে কথাগুলো—

কিছুক্ষণ পরে সে ভাবটাও স্তিমিত হয়ে আসে। এবার চিন্তা-ভাবনাটা নিজের দিক থেকে স্বামীর দিকে চলে যায়। তাঁর কথা ভাবে, আপনিই মনে আসে কথা-গুলো, চিন্তাটা তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়।

নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছে—এর জন্যে সে মানুষটাকে কী মূল্যই না দিতে হবে সারা জীবনভর। এক রকম অছুতের জীবন কাটাতে হবে না তাঁকে?

এই তো, প্রথমেই তো শুনল, সংবাদ কানে যাওয়া মাত্র মন্দিরের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়েছেন, পূজা আরতি কিছুই করেন না। মার সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান কিনা তাই বা কে জানে! হয়ত—ওকে নিয়ে সে বাগানবাড়িতে থাকা তো চলবেই না, কারণ দোল ঝুলনের সময় বিগ্রহ সেখানে গিয়ে থাকেন দু-চার দিন —এখন নিশ্চয় কেউ দু বেলা প্রসাদ পৌছে দিয়ে আসছে, তাও বন্ধ হবে। দূরে কোথাও হয়ত বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতে হবে, যদি বেশীদূরে হয়, কে-ই বা বারো-মাস তিনশ পঁয়ষট্টি দিন প্রসাদ দিয়ে আসবে?

সে রান্না ক'রে দিতে পারে অবশ্যই। কিন্তু এর আগে শুনেছে সে, ঐ অল্প ক' দিনের দাম্পত্য-জীবনেই—দীক্ষা গ্রহণের পরে স্বপাক অথবা ভগবানের প্রসাদ ছাড়া খান নি কিছু।

যেমন সে অহরহ অপমানিত লাঞ্ছিত বোধ করছে, তেমনি তাঁকেও ভোগ করতে হবে। হয়ত দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। তিনি কি আরও অকারণে এই শাস্তি ভোগ করবেন না।

ওর একটা আপাত কারণ আছে, তাঁর তো সেটুকুও নেই। নিষ্পাপ শুদ্ধসত্ব মূর্তি।

কর্তব্য, না ভালবাসা ?

কর্তব্য কিসের। কর্তব্য বোধ করার তো কোন কারণ নেই। দয়া করারও না। ওঁর জীবনে এসে পড়ে একটা মহৎ জীবন-সম্ভাবনাকে নষ্ট ক'রে দিল।

তবে ভালবাসা ? কিন্তু এতখানি ভালবাসারই বা কি কারণ থাকতে পারে। সে সময় পাওয়া গেল কই।

কেন, কেন সে মরতে পারল না, গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা নবদ্বীপে গঙ্গায় ডুবে।

হতভাগী, নিজেও জ্বলবি—জ্বলছিসই তো—ঐ ঈশ্বরের মতো মানুষটাকেও জ্বালাবি।...

মাসিমা ঘরে ঢুকলেন আচমকাই।

'এই তো ঘুম ভেঙেছে, বেশ পরিষ্কার চোখ চেয়ে আছ। আমাকে ডাকো নি কেন ? খাবার সময় পেরিয়ে গেল। খাবে তো একটু দুধ আর রুটি চটকানো—ক' মিনিট বা লাগে। নাও, এবার নিজে চেষ্টা ক'রে উঠে বসো, আমি দুধটা একটু গরম ক'রে আনি, কাঠের আঙরা রেখে দিয়েছি ঐ জন্যে—।'

ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিল বিশাখা, 'না-ই বা এক রাত খেলুম মাসিমা, এ দেখছেন না যমের অরুচি। অততেও যখন মরি নি, একটু অনিয়মেও মরব না।'

'তা বললে তো হবে না মা, তোমার গোসাঁই যে বার বার বলে গেছে, একটুও অনিয়ম না হয়। নিমুনিয়া হয়েছিল, জলের ওপর শুয়েছেলে দু দিন—ডাক্তারটা খুব ভাল তাই, নইলে এত তাড়াতাড়ি সারতে না।'

গোসাঁই বার বার বলে গেছেন অনিয়ম না হয়, ডাক্তারকে দু বেলা খবর নিতে বলেছেন—এও কি কর্তব্য ? না ভালোবাসা ?

সেই প্রশ্নই ঘুরে ঘুরে আসে—কেন, কেন ?

পরের দিন আসার কথা নয়, তবু সারা বেলা স্বরূপের পথ চেয়েই কাটল।

রাত্রেও ভাল ক'রে ঘুম আসছে না। অনেক পরে—সমগ্র ব্রজপুরীতেই বোধহয় সুষুপ্তির নিস্তব্ধতা নেমেছে—কেউ আর কোথাও জেগে নেই—ওদের বাড়ির সামনের পথে স-সন্তর্পণ অতি মৃদু পায়ের শব্দ উঠল, একজন নয়—একাধিক ব্যক্তির।

মনে হয় দ্বিতীয় প্রহর পূর্ণ হয়েছে, বারোটাও বেজে গেছে। আগে হলে শেঠী-দের ও কৃষ্ণচন্দ্রের ম'ন্দরে অল্প কিছুক্ষণ সানাই বেজে দ্বিপ্রহর পূর্ণ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা ক'রে বাকী রাতের মতো নিস্তব্ধ হ'ত। তারও আগে—বিশাখার বিয়ের আগে নাকি গোবিন্দ মন্দিরেও প্রহরে প্রহরে বাজত—এখন প্রত্যূষে মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যায় একবার ক'রে নিয়ম রক্ষা হয়। তবে এই বন্যার ফলে সব মন্দিরেই এসব বাজা বন্ধ হয়ে গেছে, বাজনদাররা যে যার দেশে গেছে, নিজেদের ঘরদোর আত্ম-জনের খবর নিতে, সামলাতেও।

তা হোক, মোটামুটি সময়ের জ্ঞান আছে বিশাখার। রাত বারোটার কম নয় সময়টা।

অন্য দিন হ'লে ওর কানে এটুকু শব্দ যেত না। আজ ওর ঘুম ভাল হয় নি, সন্ধ্যা থেকে স্বামীর চিন্তাটাই মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে রোগদুর্বল মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত ক'রে তুলেছে, তন্দ্রা পুরোপুরি গাঢ় হতে দেয় নি। কখনও কখনও ক্লান্তিতে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, আবার খানিক পরে কে যেন চাবুক মেরে সচেতন করছে—পূর্ব সূত্রের খেই ধরছে মন।

সে যাক—কে আসছে এরা? এত রাত্রে, এমন প্রায় নিঃশব্দে?

চোর? কিন্তু চোররা এখানে সাধারণত এত সাবধানে আসে না। চোর ঘরের ছাদে ছাদে আলসেয় ঘোরে—অনেকের চোখেও পড়ে, তারা বেপরোয়া—তাদের ভাবটা 'তোমরাও আছ আমরাও আছি, যেদিন যার সুবিধে হয়, সেই জিতবে।'

অন্তত এই রকম শুনেছে সে।

কোন বাদশা, আকবর না কে এখানের নাম দিয়েছিলেন ফকিরাবাদ। ফকিরের দেশ, চোর আর কত পাবে?

শ্বশুরবাড়ি ছিল চারদিকের কড়া পাহারার মধ্যে। এখানে সামলাবার মতো কিছু নেই, সাবধান হবে কেন, চোরই বা কে আসবে ওর এখানে।

এখানে তো বড় দরজার খিল বা ছিটকিনি নেই, কবে ভেঙে গেছে—সারানো হয় নি। কে সারাবে? মালিকেরা আসেন নি অনেক কাল, চিঠি নিয়ে এক আধ দল যা আসে মধ্যে মধ্যে—তাদের এত কি গরজ? দু'দিনের মুসাফির, নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে তালা দেবার ব্যবস্থা থাকলেই হ'ল।

অবশ্য পূজারীজী বাইরে খাটিয়া পেতে শোন, বারো মাসই। নিজের কুটরীর

সামনেই শুতেন—বিশাখা আসার পর থেকে এদিক ঘেঁষে খাটিয়া পাতেন, কচি মেয়েটা না ভয় পায় বা কেউ না উত্ত্যক্ত করে—এই ভেবেই।

আজও তাই শুয়ে আছেন। এ ঘরেই নিচে মাসিমা ঘুমোচ্ছেন।

না, ওর ভয়ের কোন কারণ নেই।

তবু—

শব্দটা এই দরজার সামনেই থামল, মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে, এই ঘরের দিকে।

এবার ভয় পেল সে। উঠে বসল, বুক কাঁপছে তার।

মাসিমাকে ডাকবে, তাও যেন পারছে না।

কিন্তু সে চেষ্টার আগেই ঘরে ঢুকল অতি পরিচিত এক মূর্তি।

রামরতিয়া॥

আস্তে আস্তেই বলল, স্বাভাবিক কলকণ্ঠে নয়, 'বহুরাণী দিদি, তুমি জেগে আছ এখনও। জয় বাঁকেবেহারে ভগবানজী। গ্যাখো কাকে এনেছি, কে এসেছেন।'

মাসিমাও ধড়মড় ক'রে উঠে বসেছিলেন, এখন পিছনের অবগুণ্ঠিত মানুষটিকে দেখেই বিছানাটা এক টান মেরে সরিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

কে এলেন? এত রাত্রে। বিশিষ্ট কেউ, সেটা একবার চেয়েই বোঝা গেছে! সামান্য আলোতেই—সারারাত হ্যারিকেন জ্বলে, কমানো থাকে—সাদা গরদের থান ধুতির ওপর সাদা সিল্কের চাদর জড়ানো—চিক্‌চিক ক'রে উঠল।

ঘরের ভিতরে আর দু'পা এগিয়ে আসতে চেনার কোন অসুবিধেই রইল না। এর মধ্যে রামরতিয়া আলো বাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যামসোহাগিনী। স্বয়ং।

'মা!'

প্রায় কেঁদে ওঠার মতোই একটা ডাক দিয়ে বিশাখা উঠে এসে ওঁর পায়ের ওপর যেন উপুড় হয়ে পড়ল।

পায়ে মুখটা চেপে ধরে।

সত্যিকার চোখের জলই নামল এবার। অবিরল ধারে।

এই সুদীর্ঘ কালের সমস্ত লাঞ্ছনা অপমান কষ্ট এবং কঠিন দুঃসহ তপস্যার বেদনা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল মনের মধ্যে—এখন পুঞ্জীভূত মেঘের মতোই তা অন্তহীন বর্ষণে পরম পূজ্য পা দুটি ধুয়ে দিতে লাগল।

১৮
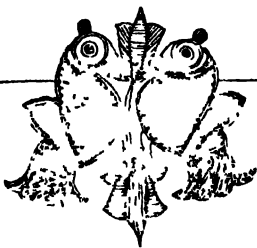
এ ব্যথা-বেদনা-দুঃখের পরিমাণ বুঝতে শ্যামসোহাগিনার কোন অসুবিধা হ'ল না।

তিনি সেই শ্রেণীর তীক্ষ্ণদর্শিনী অভিজ্ঞা মহিলা, যিনি অনায়াসে অপরের মনটা দেখতে পান—শুধু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নয়, সহানুভূতি দিয়েও।

এ তিনি জানতেন। ঠিক এই চিত্রই তাঁর মনে আঁকা হয়ে ছিল আসতে আসতে। তারও পূর্ব থেকে মানসপটে দেখেছেন।

প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

তাই তিনি বাধা দিলেন না, পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না। স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় চার-পাঁচ মিনিট। তারপর স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, 'ওঠো মা, রোগা মানুষ, এভাবে ঠাণ্ডায় পড়ে থাকতে নেই। এবার ওঠো, ওপরে চৌকির ওপর স্থির হয়ে বসো।'

বলে, দু হাত দিয়ে এক রকম কোলে করার মতোই তুলে তক্তপোশে বসিয়ে দিলেন।

ইঙ্গিতে—বা হয়ত পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া ছিল—রামরতিয়াও বাইরে চলে গেছে, মাসিমাকে ডেকে নিয়ে। যাবার সময় মাসিমার দিনের বেলায় বসার বা গা-গড়াবার জন্যে কেনা খেজুরপাতার চ্যাটাইটা নিতে ভুল হয় নি, বাইরে থেকে দরজার কপাট দুটো টেনে দিতেও। এখন মহাবীরের ঘরের সামনে চ্যাটাই বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'বাইঠন মা, এখানেই একটু গড়াও এখন। বড়মা যখন নিজে এসেছেন, জরুরী কোন বাত আছে। দু'এক কথায় হবে না। তবে চাদরটা মুড়ি দিয়ে শোও, বাঢ়ের পর মচ্ছর বহুত বেড়েছে—মালেরিয়া দেখা দিয়েছে খুব, ঘর ঘর বুখার।'

মাসিমাকে চাদর চাপা দিয়ে রেখে নিজে উঠে গেল রামরতিয়া। তবে বাইরে গেল না অবশ্যই। আড়ি পেতে শোনা ওর ব্যাধি একরকম—বিশেষ এ ক্ষেত্রে কি কথা হচ্ছে সেটা না শুনলে ওর চলবেই না। বড়মা ওকে ডেকে পাঠিয়ে একা ওকে নিয়ে এত রাত্রে সবাইকে লুকিয়ে এখানে এসেছেন—কি এমন কথা, বাড়িতে ফিরিয়ে নেবেন কিনা—শুনতে না পেলে পেট ফুলে মরেই যাবে।

আর, এটা তো ওর বিজয়-গৌরবও।

এর পরও মিনিট তিন-চার সময় নিলেন শ্যামসোহাগিনী। বিশাখাকে শান্ত হবার অবকাশ দিতে চুপ ক'রেই বসে রইলেন।

এ যে কতখানি মানসিক আলোড়ন—বিপর্যয় বলাই উচিত—তা তিনি বুঝতে পারছেন। যদি অসুখ বেড়ে যায়, বুকে কিছু হয়, তো তাঁর বড় ছেলে, ডাক্তার, সবাই দায়ী করবে।

কান্নার বেগটা আছে তখনও, তবে সামলে নেবার চেষ্টা করছে বিশাখা।

এখন এ অন্য এক আলোড়ন। উনি হাতে ক'রে তুলেছেন, স্নেহকোমল কণ্ঠে কথা বলেছেন। বৌমা বলেন নি অবশ্যই কিন্তু মা বলেছেন। যে ভেল্কীর খেলা অসুখ থেকে ওঠবার পর সে দেখছে, এও তো আর মধ্যে একটা।

বরং বলা চলে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য।

খানিক পরে শ্যামসোহাগিনী তেমনি আস্তে, তেমনি কোমলকণ্ঠেই বললেন, 'একটু বরং শুয়ে পড়ো না। আমার কথা শুনতে তো কোন অসুবিধে হবে না তাতে। অসুখ আবার বেড়ে না যায়—এই ভাবনা। অথচ আমার হাতেও আর সময় নেই।'

'না মা, আপনি বলুন। বসে থাকতে কষ্ট হবে না, দিনরাত শুয়ে থাকতেই বেশী খারাপ লাগে।'

মাথা হেঁট ক'রেই বসে ছিল, সেই ভাবেই উত্তর দিল সে।

সহজ হতে পেরেছে সে—এটা বোঝাবার জন্যেই আরও যেন এতগুলো কথা বলল।

বলেই আবার ভয় হচ্ছে, একটু বেশী প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পেল না তো? উনি কিছু ভাববেন না তো—!

শ্যামসোহাগিনীর মুখে তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না। পাবে না তাও জানে বিশাখা।

উনি একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন।

সময় বেশী হাতে নেই, সব দিক দিয়েই।

গোপনে বেরিয়ে এসেছেন, আর কেউ না জানুক, রাত্রের চৌকিদার জানে। সে-ই ইঙ্গিতমাত্রে নিঃশব্দে কাটা দরজা খুলে দিয়েছে। সে অবশ্য বহুকালের লোক, কর্ত্রীর শাসন সম্বন্ধে সে অবহিত। তবু—আর কেউ না ওঠে, তাদের চোখে না পড়ে।

বললেন, 'মা, কি হয়েছিল, কে দায়ী—এসব কথা এখন অবান্তর। আমার কি

বিশ্বাস, বা ছেলেদের—সে সব বিবেচনা এখন কাজে লাগবে না। আমাদের শাস্ত্রর শাসন থেকে আমরা বহু দূরে চলে এসেছি। স্মৃতির নির্দেশও আর কাজে আসে না। তা ছাড়িয়ে এখন বড় হয়ে উঠেছে লোকাচার। সে সব নির্দেশ আইন লোকের মুখে মুখে বেড়েই উঠছে। অবশ্য শিথিলও হয়েছে ঢের, সে আমার এই জীবনেই দেখতে পাচ্ছি। তবু এখনও ঢের আইন বিধি-নিষেধ আমাদের মেনে চলতে হয়।'

এতটা বলে একটু চুপ ক'রে রইলেন। শ্রোত্রীর মনের আধার এসব কথার যোগ্য নয়, অল্প বয়সে এসেছে, তেমন লেখাপড়ার সময় পায় নি নিশ্চয়। তবু যদি কিছুও বোঝে।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গেরই খেই ধরলেন। বললেন, 'আমি তোমার চেয়েও অল্প বয়সে এ বাড়ি এসেছি। কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই—গুরুদেবও তিনি—খুব যত্ন ক'রেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সংস্কৃতও কাজ-চলা গোছের জানি, শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বেশীদূরেও যেতে হবে না, মহাভারতেই আছে কানীন আর সহোড় সন্তানের কথা। এদের গর্ভধারিণীর কোন শাস্তির ব্যবস্থা দেন নি তাঁরা, ত্যাজ্য বা অস্পৃশ্য করেন নি, বরং বলেছেন স্বামীকে এসব সন্তানের পিতৃত্ব নিতে, সন্তান বলে স্বীকৃতি দিতে এই সব সন্তানকে। যে জন্যে কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণ আর কুন্তী বার বার লোভ দেখিয়েছেন পাণ্ডবদের সিংহাসন অধিকার করতে, মৃত্যুর পর পাণ্ডবরা জ্যেষ্ঠ অগ্রজের প্রাপ্য পিণ্ডদান করেছেন। তেমনি কন্যা যদি অপরের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে বিবাহ করে, স্বামী সে-সন্তানকেও স্বীকার করবেন এ নির্দেশও দেওয়া আছে।'

আবারও থামলেন একটু।

এসব কথা কখনও শোনে নি বিশাখা, কারও মুখেই শোনে নি। শোনার কথাও না। সে স্তম্ভিত হয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই জন্যেই সময় দিলেন খানিকটা।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু এসব কথা লোকে ভুলে গেছে। কেউ জানেও না। এমন কি পণ্ডিতদেরও এ-কথাটা বলতে গেলে পরবর্তী বহু বিধান দেখিয়ে দেবেন, শাস্ত্র-গ্রন্থের আদেশ শোনাবেন। কাজেই আমাদের হাত-পা বাঁধা মা, এসব জেনেও কোন উপায় নেই তোমাকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার। তোমার স্বামী তা জানেন, কিন্তু তিনি তোমাকে ভালবাসেন এটা বুঝেছি। তিনি তোমাকে ঐ অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে দায়ীও ভাবেন না। আর বিবাহ করবেন না একথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে ছোট ভাইয়ের হাতে সেবাইতের সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, সেই মতো তৈরী করছেন, বলতে গেলে হাতে ধরে শিখিয়েছেন, শেখাচ্ছেন। তুমি কোথায় আছ, বেঁচে আছ কিনা খবর পান নি, মনে হয় কোন আশাও রাখেন নি

বলেই সাধনভজনে ডুবে যেতে চেয়েছেন। আমার মৃত্যু হলে এটুকু সম্পর্কও ত্যাগ করবেন—পুরোপুরি সাধকের জীবন গ্রহণ করবেন এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প।

'তবে বাস্তব বা সাংসারিক জীবনের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা বেশ স্পষ্ট। তোমার জীবিত থাকার আর এখানে থাকার সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি নিত্য-সেবার সমস্ত কাজ ত্যাগ করেছেন, অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করবেন না—গ্রহণই করবেন এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প।'

এবার একটু বেশী সময় চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝো না মা। এতে আমি বাধা সৃষ্টি করতে আসি নি। করতে গেলেও কোন কাজ হবে না এও জানি। আমি ওকে তোমার চেয়ে বেশী চিনি অন্তত, যা করে তা ভেবেচিন্তেই করে, আর একবার মনস্থির করলে আর তা থেকে নড়ে না…অবশ্য কোন অসুবিধেও নেই তার, শ্রীরাধা-গোপীবল্লভের সম্পত্তির এক কড়াও তার স্পর্শ করার দরকার হবে না, যদিও সে আইনত অনেক নিতে পারে। আমরা গুরুগিরি করি তা তো তুমি নিজেই দেখেছ, প্রথম দিনই সে কথা বলে দিয়েছি, তার পৃথক আয় আছে। আমি ও কাজ প্রায় ছেড়ে দিলেও বছরে দেড় হাজার দু' হাজার টাকা প্রণামী আসে—একটা বড় সংসার তাতেই চলে যেতে পারে। আমার শ্বশুরমশাই আর স্বরূপের দাদা-মশাই দু'জনেই অনেক টাকার সম্পত্তি ওকে দিয়ে গেছেন। নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ—বাড়িও, কাশীতে প্রয়াগে আজমেঢ়এ। জমি আছে কানপুরে, এটোয়াতে, রাজপুতনাতেও। তখনকার দিনে গুরুকে ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করা লোকে পুণ্যকর্ম মনে করত। পাছে এখানে থাকলে তোমাকে বহু কথা শুনতে হয়, লোকে বাজে ইঙ্গিত করে, সেই কারণেই সে দূরে কোথাও চলে যেতে চাইছে। আজমেঢ়এ বাড়ি আছে, সেখানেও যেতে পারে—বা অন্য কোথাও বাড়ি তৈরী ক'রে নিতে পারে। এই ওর সঙ্কল্প। কাশী প্রয়াগে যেতে চাইছে না, সেখানে পরিচিত লোক বেশী বলেই সেখানকার কথা ভাবছে না।'

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যায় বিশাখা।

এত মহৎ লোকটা, এত মহাপ্রাণ!

কদিনের বা দেখা ওর সঙ্গে—তাতেই কেউ এত ভালবাসতে পারে!

শ্যামসোহাগিনী এবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

কোথায় যেন বাকী কথাটা বলতে সঙ্কোচে বাধছে।

তারপর কথাটা বললেন যখন, অনেক আস্তে, গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'এবার আসল কথাটা বলছি—তবে আবারও বলছি, ভুল বুঝো না। ওর—স্বরূপের—গোপীবল্লভ-অন্ত প্রাণ। তাঁর পূজা সেবা, পাল-পার্বণ এছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই ওর। পড়তে

গিছল কাশীতে সে যেন নিখুঁত ভাবে সেবা করতে পারে, এই সেবাইত পদের, গুরু হওয়ায় উপযুক্ত হতে পারে—সেবার সমস্ত মর্ম বুঝে, এই জন্যেই। সেই গোপীবল্লভ, সেই ব্রজধাম ছেড়ে গেলে ওর দেহটাই যাবে। মন পড়ে থাকবে এখানে। ওকে আমি চিনি,—একটা বিরাট হতাশা এসে যাবে জীবনে। এখন তোমার জন্যে যা করছে তার অনেকটাই হয়ত ভালবাসা—কিন্তু ঐ অল্প কদিনের সহবাসে ঠিক যথার্থ ভালবাসা আসে না। প্রথম ভালবাসার আবেগ ওটা, আর অনেকখানি কর্তব্য-বোধ। প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে কি একটা শূন্যতা আসবে না?…জানি না, তুমি এসব কথার মর্ম বুঝবে কিনা, হয়ত এসব কথা এই দুর্বল শরীরে বলা ঠিক হ'ল না —কিন্তু আমারও যে আর সময় নেই মা।'

এবার বিশাখা কথা বলল। তেমনি ঘাড় হেঁট ক'রেই, ধীরে ধীরে—প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বুঝতে পারছি ওঁর জীবনটা নষ্ট করতেই আমার এ দুর্মতি হয়েছিল। আপনি আদেশ করুন, আমি কি করব। কি করলে ওঁর মনে শান্তি আসবে, উনি সহজ শান্ত হতে পারবেন। যাতে উনি সুখী হন আমি তাই করব। মরতে আমার একটুও ভয় নেই মা—শুধু, যদি কোন দিনও ওঁর দেখা পাই সেই আশাতেই মরতে পারি নি।'

'না না মা, সে পাত্রও নয়। আমি সে কথা বলতেও আসি নি। মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভুলই বুঝেছ। গোকুলে আমাদের একটা মাটির ছোট্ট বাড়ি আছে। গোকুল এখান থেকে এমন কিছু দূর নয়। ছোট্ট গ্রাম, ব্রজবাসীরাই থাকে। কিছু, কদাচ কখনও, কোন তীর্থযাত্রী রাত্রিবাস করে। যাওয়া মাত্রই বুঝেছিলুম ছেলের মনের গতি কোন্ দিকে যাবে। আমি বুঝেছিলুম, ছেলে বোঝে নি। আমি সেইদিন থেকেই মিস্ত্রি লাগিয়েছি বাড়িটা মেরামত করার জন্যে। কুয়া আছে। মিষ্টি জলের কুয়া যা এদেশে দুর্লভ—কিন্তু বাথরুম নেই। বন-পরিক্রমার পথে অনেক শিষ্য-আত্মীয়রা আসেন—এক-আধদিন থাকেন—তাঁদের এত বাথরুমের দরকার হয় না। আমি তোমার কথা ভেবেই সেই সব ব্যবস্থা করাচ্ছি। স্বরূপ এর মধ্যে দেখেও এসেছে, আজও গেছে। ও যদি গোকুলে থাকে তাহলে এক আধ দিন মন্দিরে আসতে পারবে, রাতে হোক কি ভোরে হোক, এখানের খবর নিয়মিত পাবে। ওখানে পরিচিত লোক কদাচ কখনও যায়, একদিনের বেশী থাকে না, তোমারও বিব্রত হবার কোন কারণ ঘটবে না। তুমি যদি ওকে এই ব্যবস্থায় রাজী করাতে পারো—আমি তোমার কাছে ঋণী থাকব। তোমার মনেও তাতে শান্তি আসবে। এ ব্রজধামের নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা মা, এতদিন এখানে এই পরিবেশে থেকে কানপুর কি রাজস্থানে কোথাও গিয়ে নির্বান্ধব স্বজনহীন দেশে বাস করতে তোমারই

কি ভাল লাগবে ?'...

বলতে বলতেই একেবারে উঠে দাঁড়ান শ্যামসোহাগিনী।

অনেক দেরি ক'রে ফেলেছেন তিনি।

নদীর দিক থেকে শিবারব ভেসে আসে, প্রহর ঘোষণা করছে এরা। মানে তৃতীয় প্রহর গত হ'ল। আর দেরি করা কোনমতেই উচিত নয়। অনেকে এই সময়ই উঠে পড়েন, জপ শুরু ক'রে দেন।

বোধহয় এখনও রামরতিয়া দ্বারলগ্ন ছিল, শ্যামসোহাগিনী উঠে দাঁড়াবার সামান্য শব্দও তার কানে গেছে। কর্ত্রী দরজার কাছে আসার আগেই সে ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে 'রাধে রাধে' বলে কপাট খুলে দিল।

দুজনে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

১৯
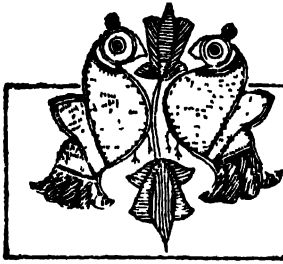
অনেকক্ষণ সময় লাগল বিশাখার কথাগুলো বুঝতে। কী শুনল, কী চান উনি, ওকে ঠিক কি করতে হবে—এতক্ষণের এত কথা থেকে তার মর্মার্থ গ্রহণ করা ওর পক্ষে এমনিই কঠিন—এখন তো এই দুর্বল শরীর, বেশীক্ষণ কিছু চিন্তাই করতে পারে না!

মাসিমা এসে আবার শুয়ে পড়েছেন, খানিক পরেই রামরতিয়া একবার উঁকি মেরে দেখে চলে গেল—সম্ভবত বাড়িই গেল এবার—তাও নিঃশব্দে দেখল শুয়ে শুয়ে। আসলে এগুলো বাইরে থেকে দেখা, যন্ত্রের মতোই দেখেছে, এ দেখার সঙ্গে যেন আজকের এ ঘটনার কোন যোগাযোগ নেই, ওর মনেরও না।

এ ঘটনার অভাবনীয়তা, অবিশ্বাস্যতাই তো তাকে বিহ্বল করেছে সেই প্রথম থেকেই। সুদূর কল্পনার অতীত, কোন দিবাস্বপ্নের মধ্যেও এ আকস্মিক আবির্ভাবের কথা ভাবতে পারে নি সে।

এ জীবনের মতো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে—তাঁর পক্ষে কোন কারণেই ওর মুখ-দর্শন করা সম্ভব নয়। বুঝি উচিতও নয়।

স্বামীর এই করুণা—করুণা ছাড়া আর কি বলবে সে, প্রেম গড়ে ওঠার তো সময়ই হ'ল না। তাও যেটুকু অবসর মিলেছিল তার মনের পাষাণপ্রাচীর, অজ্ঞাত অপরাধবোধ সেটুকু সুযোগও গ্রহণ করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও স্বামী ভালবেসে-ছিলেন, সে ভালবাসা আজও ভুলতে পারেন নি—এমন কথা ভাববে কেন? এমন আশা পাগল ছাড়া করা সম্ভব নয়।

তবু এও যদি বা বিশ্বাস করার চেষ্টা করা যায়, শাশুড়ি সম্বন্ধে সেটুকু অবসরও নেই, নেই কোন কারণের লেশ।

তিনি যে এসেছিলেন, মা বলে ডেকেছিলেন, সস্নেহে গায়ে হাত দিয়েছিলেন—এই তো এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এ সবটাই মায়া, অবাস্তব স্বপ্ন, অথবা স্বামীর করুণার অকারণ আকস্মিক এই প্রচণ্ড আঘাতে আবার বিকারগ্রস্ত হয়েছে, সেই বিহ্বলতাই আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বুদ্ধি, বিচারশক্তি। যা দেখল তাও

বিকার, যে কথাগুলো শুনল বলে মনে হচ্ছে—তাও।

বিহ্বলতা আছে ঠিকই, তবু এক সময়—যেন অনেক চেষ্টায় মনকে সক্রিয় করে তুলল। তাতেও চিন্তাগুলোকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে অনেক সময় লাগল।

প্রত্যুষের প্রহর ঘোষণা করে যে সব পাখীর দল, তাদের কারও কারও কাকলি শোনা যাচ্ছে; একটু পরেই উষা দেখা দেবে—তরুণ আলোর লালিমা ফুটবে প্রভাতের কপোলে ললাটে—অরুণ ও উষার প্রেমের সলজ্জ লালিমা।

তার পর আর সময় থাকবে না অনেকক্ষণ। বহু লোকের কলরবে—তীর্থযাত্রী পুণ্যার্থী বা দর্শনার্থীদের রাধারাণীর সরব জয় ঘোষণায় বা সশব্দ জপে বারেবারেই নিভৃত চিন্তার, মনকে সংহত করার প্রয়াস বাধা পাবে।…

বিহ্বলতা কাটল কিন্তু এই কলরবেই। পূজারীজী স্নান সেরে স্তোত্রপাঠ করছেন নানা দেবতার, মাসিমা উঠে প্রাতঃকৃত্য করতে গেছেন কিন্তু তিনিও জাগরণীর গানই গাইছেন মৃদুকণ্ঠে। রাঢ়ের লোক তিনি—গাইছেন সেই অতি পরিচিত গান —"রাই জাগো রাই জাগো, বলে শুকসারী ডাকে—" এ ওঁদের প্রাত্যহিক জাগরণের গান, রাধারাণী নিকুঞ্জ বন থেকে লীলাবিহার-শেষে বেশবাস সম্বৃত ক'রে নিজ গৃহে যাবেন—সেই কারণেই এই সতর্ক সঙ্গীত।

প্রত্যহের এই আবেষ্টনী, এই নিত্য-স্বাভাবিক পরিবেশেই যেন স্বচ্ছ চিন্তার, ঘটনার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা বা তার মর্মার্থ গ্রহণ করার শক্তি কিছুটা ফিরে এল।

তাকেও উঠতে হ'ল। মুখ হাত ধোওয়া, স্নান—এই সব প্রাত্যহিক কাজগুলো তো আছে। এই ঘরেরই পাশে একটু খাঁজকাটা মতো ছাদঢাকা খালি জায়গা ছিল, পূজারীজীর অনুমতি নিয়ে সেখানেই এখন পর্দা টাঙ্গিয়ে স্নান ইত্যাদি সারে, এখন আর ঘরে এসব কাজ সারতে ইচ্ছা করে না। মাসিমাও বাধা দেন না। রোগী হয়ে তো বেশীকাল থাকা উচিত নয়। সে ভালও লাগবে না বিশাখার।

আরও ভয়—সেটা পূজারীজীর জন্যেই বেশী—অন্নকূট এসে পড়ল, যদি মালিকরা কেউ আসেন, সদলবলেও আসতে পারেন—তেমন অবস্থায় হয়ত অন্যত্রও স্থানান্তরিত করতে হবে, বা হতে পারে। একটু চালু হওয়াই ভাল।

অবসর মিলল মনকে গুছিয়ে নেবার, যখন মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহের স্নান অর্চনা নূতন বেশবাস ইত্যাদির পর লাড্ডুভোগের শঙ্খধ্বনি হয়। এগুলো সামান্য আগু-পিছুতে প্রায় এক সময়ই বাজে।

তারপর অনেকটা শান্ত হয়ে আসে পরিবেশ। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা যাত্রীদল কলরব করতে করতে যাওয়া-আসা করে—যারা গোবিন্দ-মন্দির থেকে বেরিয়ে

সাক্ষীগোপালের শূন্য মন্দির* হয়ে এদিক দিয়ে লালাবাবুর মন্দির আর গোপেশ্বর দর্শনে যান। কিম্বা উল্‌টোটাও।

তা হোক, তাতে অতটা ব্যাঘাত হয় না চিন্তাটা গুছিয়ে নেবার, বিকার না সত্য তা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তির কারণ ঘটবার।

আস্তে আস্তে খানিকটা বিশ্বাস হয় যে শ্যামসোহাগিনী সত্যই ওর কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কী সব বললেন? রোগক্লান্ত মস্তিষ্কে আরও অনেকক্ষণ সময় লাগে সে কথাগুলো, বিশেষ শেষ বক্তব্য বা অনুরোধ স্মরণ করতে, তার উদ্দেশ্য বুঝতে।

এবার বিশ্বাস হয় যে সত্যই শাশুড়ি স্বয়ং এসেছিলেন। তিনি ঋণী থাকবেন বলেছেন—যদি গোকুলে বাস করতে রাজী করাতে পারে তার স্বামীকে।

হাসিও পায় এবার। অদৃষ্টের পরিহাস? তাই বটে।

উনি এসেছেন, গুরুজন শুধু নন, গুরুও—সর্বতো-পূজ্য ব্যক্তি প্রার্থী হয়ে।

তাহলে সত্যিই কি তার স্বামী তাকে ভালবাসেন, তার জন্যে সমাজ সংসার সব ত্যাগ করবেন?

একটু বিজয়গর্ব যে মনে জাগে না তা নয়। পরক্ষণেই প্রচণ্ড লজ্জিত হয়ে পড়ে। এ কী ভাবছে সে! ছিঃ ছিঃ! সে তো কোনমতেই এ ভালবাসার যোগ্য নয়। বাইরের বিচার ছাড়াও নিজেকে বিচার ক'রে দেখলেও মনে হয়—কারণ যা ই হোক, তার দায়িত্ব যত সামান্যই ভাবুক—সে ঘৃণ্য, সে এত বড় বংশকে কলঙ্কিত করেছে, সাত্ত্বিক বংশকে, অপরিমিত লজ্জার কারণ হয়েছে।

এর পরে যে ভালবাসা—সে তিনি দেবতা বলেই সম্ভব হয়েছে, এতটা স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছেন।

এতটা ঊর্ধ্বে বুঝি দেবতারাও উঠতে পারেন না।

রামচন্দ্রও পারেন নি, কোন কারণ নেই জেনেও লোকলজ্জা মেনে নিয়েছিলেন।

তবে তার মধ্যেই—মানুষের মন তো—একটা তুচ্ছ নীচ কথাও মনে উঁকি মারে। এসেছিলেন শাশুড়ি নিজের স্বার্থেই, ছেলেকে হারাবার ভয়ে দিশেহারা হয়ে। ছেলের মতো ছেলে, গর্ব করার মতো ছেলে। মনে হয়—যা সে এ বংশের পূর্ব-পুরুষ প্রসঙ্গে শুনেছে—বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। শাশুড়ি তো ব্যাকুল হবেনই।

তবে সে দু-তিন মুহূর্তের বেশী নয়।

আবারও লজ্জার ধিক্কারের পরিসীমা থাকে না।

---

* বছর কতক আগে লেখক গিয়ে দেখেছেন, সে মন্দির একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

যে যতই সাধনা করুক, মনের দিক থেকে উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করুক—সাধারণ মানুষের যে চিরন্তন মানসিকতা, তাকে একেবারে দমন করতে পারে না।

এ কি শুধু তাঁর স্বার্থেরই কথা!

তিনি যার কল্যাণের কথা ভেবেই এত ব্যস্ত এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন—সে কি ওরই স্বামী নয়? যার ভালবাসায় গর্ববোধ হচ্ছে—যোগ্যাযোগ্য বিচার না ক'রেই—তার সুখের কথা শান্তির কথা, ভবিষ্যতের কথা কি সে ভেবেছে এমন ক'রে—একবারও?

সত্যিই তো,—স্থিরমনে যেটুকু সে তার দেবতাকে, তার ইষ্টই বলতে গেলে—দেখেছে, এই ভাবে ব্রজধাম ছেড়ে রাধা-গোপীবল্লভকে ছেড়ে—এই ইষ্টগোষ্ঠী* চিরদিনের মতো ত্যাগ ক'রে অপরিচিত সব শহরে, যেখানে অর্থ কাম ছাড়া লোকে কিছু জানে না, বোঝে না—যা সংস্কৃতি শিক্ষা সাধনার সঙ্গে বলতে গেলে সম্পর্কহীন মরুভূমিতুল্য—সেইখানে একমাত্র এই স্ত্রীর সঙ্গে দিনের পর দিন, মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটাতে পারবেন?

না, তা তিনি পারবেন না। তাঁর জীবন নষ্টই হয়ে যাবে। শাশুড়ি ঠিকই বলেছেন।

তার অন্তরাত্মা ধীরে ধীরে শুষ্ক প্রাণশূন্য অস্তিত্বে পরিণত হবে—ক্রমশ শুকিয়ে যাবে তাঁর দেহও।

এই ত্যাগ—স্ত্রীকে গ্রহণ করা কর্তব্য বলেই,—হয়ত বিনাদোষে লাঞ্ছিতা বহু দুঃখ-কষ্টের অগ্নিতে শুদ্ধা পরিণীতাকে আশ্রয়দান ধর্মপালন বলেই বোধ করেছেন, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ওঁর মানসিকতার কথা ভেবে দেখলে—সামান্য পরিচয়েও যা বুঝেছে, এ একেবারেই আত্মবলিদান।

তিনি পারবেন না, পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না।

যতই মনকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করুন—এ তার পক্ষে সাধ্যের অতীত দায়িত্ব।

সেও কি সুখী হতে পারবে এতে?

যাকে পাবার জন্যে, যার 'গাত্র-স্পর্শ' মাত্র পাবার জন্যে তার এ লালসা, কামনা, ব্যাকুলতা—একান্ত সাধনা—হ্যাঁ, সাধনা যে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না—সেটুকুর জন্যে গর্ব বলে দোষ দিতেও না—তাকেই কি পাবে? কী পাবে? কতটুকু পাবে? পরিপূর্ণ ভাবে পেয়ে তৃপ্ত পূর্ণ হতে পারবে?

শুষ্ক কর্তব্যবোধে আত্মত্যাগ মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারে—তা তো

---

* সমভাবাপন্ন, সমশিক্ষাদীক্ষা আদর্শ যাঁদের, তাঁরা মধ্যে মধ্যে একত্র হয়ে, পূর্বকালে গুরুগৃহেই গুরুকে সঙ্গে নিয়ে, যে আলোচনা বা রসবিচার আস্বাদন করেন—তাকেই ইষ্টগোষ্ঠী করা বলে।

তিনি হয়েইছেন—কিন্তু সাধারণ পুরুষের স্ত্রী যা আশা করে, যার জন্য আকৈশোর স্বপ্ন দেখে—তা কি দিতে পারবেন ?

সাধারণ মানবীর প্রাপ্য দিতে, তাকে উপভোগ করতে পারবেন ?

ক্রমে ক্রমে মনই শুধু নয়—দেহটাও শুকিয়ে যাবে। আরও পরে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়। যার জন্যে বিশাখার এ আকুতি, এ আকুলতা—তাকে পাবে না, পাবে শুধু অনিচ্ছুক দেহটা, পরে সেটাও হয়ত শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত হবে।

ভাবতে ভাবতে উত্তেজিতই হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা চোখে পড়ে।

কী দিতে পারবেন তিনি ? সাধারণ স্বামী স্ত্রী যেমন পুত্র কন্যা প্রেম কলহ বিবাদ অশান্তি নিয়েও সুখে থাকে—তাদের এই প্রাকৃত আনন্দময় জীবনোপভোগের কণা মাত্র কি দিতে পারবেন ?

সংসারসুখ ? ঐ দাসী রামরতিয়া যা পেয়েছে ?

কলহ-কেজিয়া আছে, মারধোর গালিগালাজ আছে—তেমনি আনন্দও আছে। দেহজ তৃপ্তি, সন্তানসন্ততি নিয়ে সাংসারিক সুখ এও কি সামান্য ! এই যে রামরতিয়া যখন-তখন সংসারের সব দায়িত্ব স্বামীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়—বৃত্তি পালনের সময় ছাড়াও—পরিপূর্ণ অধিকারবোধ আছে বলেই, সে ভালবাসার বন্ধন নির্ভরতা আছে বলেই।

বিশাখা ওঁর সঙ্গে নির্বান্ধব দেশে গিয়ে কি এই নিশ্চিন্ততা, এই নির্ভরতা উপভোগ করতে পারবে ?

অহরহ কি তার মনে একটা আত্মধিক্কার পীড়ন করবে না—নিজের সামান্য দৈহিক সুখের জন্য এমন মানুষটার জীবন মরুভূমি ক'রে দিল ! তাই কি, তার পাওনাটাই কি পেল পরিপূর্ণ ভাবে !

শিউরে ওঠে সে বার বার—ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গিয়ে।

না না, এ কি করতে যাচ্ছে সে ! এ কী অন্তঃসারশূন্য তৃপ্তি বা পূর্ণতা বোধ।

এই তার ভালবাসা ? ছিঃ !

শাশুড়ি তাঁর নিজের স্বার্থ দেখেন নি, বরং ওর স্বার্থই দেখেছেন।

সারাদিনই এই চিন্তায় কাটল তার—যেন একটা আচ্ছন্নতা, ঘোরের মধ্যে।

না, শ্যামসোহাগিনী যা বলছেন, সেটা আপস করা মাত্র, তাতেও ঐ মানুষটার মনে শান্তি বা তৃপ্তি আসবে না।

গোকুলও দূর। ব্রজমণ্ডলের মধ্যে কিন্তু ব্রজধাম নয়।

গোপীবল্লভই প্রধান আকর্ষণ। তাঁর সেবা স্বরূপ গোস্বামীর প্রাণ। তবে তা

ছাড়াও বন্ধন আছে। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন, বঙ্কুবিহারী, রাধারমণ, রাধাবল্লভ—এই সব ঈশ্বরস্বরূপ বিগ্রহের সেবা-পরিচালনার সঙ্গেও ওঁর যোগাযোগ আছে। মধুসূদন গোস্বামী—যাঁকে 'একলাখী মধুসূদন' বলা হয়, অর্থাৎ এক লাখ শিষ্য, তিনি তো ওঁকে আদর ক'রে 'বেটা' বলে ডাকেন। শাস্ত্রমহাবিদ্যালয়ের তিনি কর্মসচিব। এই সব কর্মচক্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—গোকুলে বাস ক'রে কতটুকু সান্ত্বনা পাবেন তিনি! সকলেই জানবে এই স্বেচ্ছানির্বাসনের কারণ—কেউ পরিহাস করবে, টিট্‌কিরি দেবে, সুযোগমতো হুল ফোটাতেও ছাড়বে না। কেউ বা সত্যিই দুঃখিত হবে। উনি কি এইভাবে বাসা বাঁধলে আর এই সব আত্মীয় সুহৃদবর্গের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন?—না সেই সব সেবা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন?

সে আরও বরং শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে।

সেই যে ছোটবেলায় কোন্ এক গ্রীক পুরাণের গল্প পড়েছিল—সেই অবস্থা হবে। কোন এক ব্যক্তিকে—ট্যাণ্টালাস না কি নাম—পাথরের সঙ্গে বেঁধে নাকি অর্ধেকটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল—প্রখর রোদে বা যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুকিয়ে গেছে বেচারীর, জলও রাখা হয়েছে তার সামনেই—সুমিষ্ট সুপেয় জল—ঠিক তার আয়ত্তের বাইরে, একটুখানি মুখটা বাড়াতে পারলেই সে জল পান করা যায়, সেইটুকুই সম্ভব হচ্ছে না। এ নাকি ওদেরই কোন দেবতা ঈর্ষিত হয়ে এই শাস্তি দিয়েছিলেন।

গোকুলে থেকে সব সংবাদ পাবেন, প্রসাদ আসবে মধ্যে মধ্যে—কিন্তু তবু ব্রজধামে যেতে পারবেন না—সে ঐ একই অবস্থা হবে না কি?

না, দুজনের একজনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পূর্ণ ভাবে।

আর এক্ষেত্রে সে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে বিশাখাকেই।

তিনি তো করতে প্রস্তুতই, সেটা যখন ও গ্রহণ করতে পারছে না তখন নিঃশব্দে সরে যেতে হবে ওকেই।

স্বরূপের জীবন মহামূল্যবান। মহাপ্রাণ মানুষটাকে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মারা হবে, সিন্ধবাদ নাবিকের কাঁধে চাপা সেই বৃদ্ধের মতো ঘাড়ে চেপে।

বিশাখার জীবনের কোন মূল্য নেই। সে-ই যাবে, ওঁর জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে—মুছে যাবে। মধ্যের এই কটা দিন মুছে যেতে দেরি হবে না।...

তিনিই কি শুধু ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন? বিশাখা পারে না?

তাহলে কিসের ভালবাসা, এত কাল মনমন্দিরে তাঁকে বসিয়ে কি তপস্যা করল!

যাবে, কিন্তু কোথায়? সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাড়ায় এবার।

প্রথমেই মনে পড়ে তার নাম-স্বরূপা যমুনার কথা।

এখনও যথেষ্ট জল আছে নদীতে, খরস্রোতও। দেহ এলিয়ে দিলেই সব সমস্যার অবসান, পরম চরম শান্তি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে স্বামীর কথা, শাশুড়ির কথা। একবার তাঁদের বংশের, তাঁদের পরিবারের কলঙ্কের কারণ হয়েছে, তাঁদের লজ্জা ও বেদনার শেষ রাখে নি।

ওর মৃতদেহ যদি কোথাও আটকে যায়? যদি সনাক্ত করে কেউ? আবারও তো সেই লজ্জা, সেই অপমান। নানাবিধ রটনা। তিক্ত বিদ্রূপ।

না, ছিঃ! আর ওঁদের কোন ক্ষতি করবে না সে।

তাহলে? আর কোন পথ?

অনেক ভাবে সে, এলোমেলো অবাস্তব নানা উদ্ভট উপায় মাথায় আসে, কোন-টাই সম্ভাব্য বলে মনে হয় না।...

হঠাৎই মনে পড়ে যায় কথাটা।

সন্ন্যাস নিলে কি হয়? ছোট ক'রে চুল ছেঁটে গেরুয়া পরে—যদি কোনমতে হিমালয়ের কোথাও চলে যাওয়া যায়—তাহলেই কি সব দিক রক্ষা হয় না?

পূজারীজীকে প্রায়ই বলতে শুনেছে—হরিদ্বার ঋষিকেশের কথা—সেখানে নাকি অনেক বড় বড় সাধুদের আখড়া বা আশ্রম আছে। মহিলা সাধুদেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে অসংখ্য সত্র, বিনাব্যয়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা। কোন আখড়া বা গোষ্ঠীতে স্থান না পেলেও গেরুয়াধারী লোকের খাওয়া-পরার কোন অভাব হয় না।

কিন্তু সে কোথায়, কি ক'রে সেখানে পৌছবে! তার জগৎ এতদিনেও শান্তিপুর, নবদ্বীপ আর বৃন্দাবন-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছোটবেলায় ভূচিত্রাবলী দেখেছিল, তাতে কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। তাছাড়া মাথা কামানো, গেরুয়া কাপড় যোগাড় করা—সেই বা কি ক'রে হবে, কে এত হ্যাঙ্গাম করবে?

এ ভাবনার কূলকিনারা মেলে না। দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এক এক সময় মনে হয় উপবাস ক'রে থাকলেই তো হয়—একটু একটু ক'রে মৃত্যুকে ডেকে আনা?

নিজেরই হাসি পায় আবার—এঁরা ছাড়বেন কেন, চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। স্বামী মাসিমা রামরতিয়া ডাক্তার—আসল কাজ কিছু হবে না—শুধু এক নাটক করা হবে।

ক্রমশ ক্লান্তি নামে, অবসাদ আসে।

মূর্ছিতের মতো পড়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়েই পড়ে এক সময়।

২০
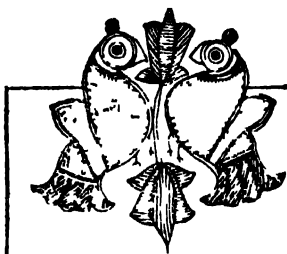
রামরতিয়া যেমন ঝড়ের মতো এসে হাজির হয়—তেমনিই এল সন্ধ্যার ঠিক আগেটায়।

'কিরে, সারাদিন দেখা নেই?' ক্লান্ত কণ্ঠে বলে বিশাখা।

সঙ্গে সঙ্গেই তো টনক নড়ে, আর একটু কাছে এসে বলে, 'ওকি, অমন ভাবে কথা কইছ কেন? আবার শরীর বিগ্‌ড়োল নাকি?'

'না না—অমনি শরীর খারাপ দেখলি। বেলায় ঘুমিয়েছি বলে তাই—। তুই কি করছিলি তাই বল্‌ না।'

'আমার কাজ তো জানই, হঠাৎ এসে হাজির হয়। আজ একটা প্রসব ছিল। দেরি হয়ে গেল মানে—একটু বেয়াড়া ভাব নিচ্ছিল। যাই হোক রাধারাণীর কৃপায় সব ঠিক হয়ে গেছে। এই সবে চান ক'রে উঠে একখানা টেক্‌রা মুখে দিয়েই চলে আসছি।'

'তা বোস্‌ না একটু স্থির হয়ে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আর কোথাও যেতে হবে?'

বিশাখা প্রশ্ন করে। এতদিনে ওর সব ভাবভঙ্গি বুঝে গেছে।

'যেতে হবে না বহুরাণী দিদি, যাবো। মানে নিজের গরজ। এক মস্ত বড় মাতাজী এসেছেন, মানে খুব বড় দরের সন্ন্যাসিন্‌, মহা মহা গোসাঁই মোহান্ত সব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। শুনেছি পাহাড়ের দিকে যে সব সন্ন্যাসীদের আখড়া আছে—তাঁরাও খুব ভক্তির চোখে দেখেন, নাম শুনলেই কপালে হাত ঠেকান।…এসেছেন কদিন আগেই, আমাকে কেউ বলে নি। গোপেশ্বর মন্দিরের কাছে এক সাধুমা থাকেন—তাঁর কাছে এসেই আছেন, কালই নাকি সুবাহু চলে যাবেন। তাই এত তাড়া।…কেন, তোমার কোন কাম আছে?'

'না না। এমনিই বলছিলুম। যা তুই। দেখে আয় তোর মাতাজীকে।'

রামরতিয়া যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়, ফিরে কাছে এসে বললে, 'বড়দাদা গোসাঁই তো কালই আসছেন—কথাটা বলবে তো বুঝিয়ে—বড়মা যা বললেন?

এতে তোমারও ভাল হবে, কোথায় কোন্ দেশে গিয়ে ফেলবে—সে তোমারও ভাল লাগবে না, দাদার তো লাগবেই না। তুমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে বললে বড়দা রাজী তো হবেনই, শান্তিই পাবেন বরঞ্চ।'

বলে আর উত্তরের অপেক্ষা করল না। বলতে গেলে ছুটেই চলে গেল।

মাতাজীর ওখানে এই সন্ধ্যেটায় বড্ড ভীড় হয়। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে দর্শনের জন্যে।...

অথচ আর সময় নেই। একটুও সময় নেই।

যা করতে হবে আজই। আজ রাত্রের মধ্যেই।

একটা যেন পথও দেখতে পায়। সাধুসন্ন্যাসীর কথা ভাবছিল, গোপীবল্লভ বুঝি সেই জন্যেই ঐ মাতাজীকে টেনে এনেছেন।

কাল ভোরেই চলে যাবেন।

তিনি কি একটু আশ্রয় দিতে রাজী হবেন না?

উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেছিল, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তব দিকটা চোখে পড়ে। তাঁর কাছে পৌছনো? কি ক'রে যাবে সকলের সামনে দিয়ে? এখানে যে কড়া প্রহরী চারদিকে।

আবার যেন একটা হিম হতাশা নেমে আসে বুকে।

সাধুমার কথা বিশাখাই তোলে মাসিমার কাছে, 'আপনি তাকে দেখেছেন মাসিমা?'

'কি করে দেখব মা', কতকটা সক্ষোভেই বলেন, 'তোমাকে নিয়েই তো থাকতে হচ্ছে। সে যা ভীড় হচ্ছে শুনছি, একটু-আধটু এক নজরে দেখে আসা যাবে না তো।'

'তা আপনি এখন একটু-আধটু বাইরে যান না কেন, সত্যিই এমন দিনরাত বন্দী হয়ে থাকা কি ভাল লাগে? যান না, তাঁকে দর্শন ক'রে আসুন না। আমি তো এখন উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি—একা থাকতে পারব না? আমার কিছু হবে না মাসিমা, অদৃষ্টে মৃত্যু নেই। নইলে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবেন কেন আপনারা। আপনি ঘুরে আসুন।'

'কিন্তু—যদি ফিরতে দেরি হয়—তোমার খাওয়ার সময়—'

'হাসালেন মাসিমা। আমি কি কচি খুকী? এক আধ ঘণ্টা দেরি হলে ভির্মি যাবো কি ভোচকানি লাগবে?'

আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হ'ল না। মাসিমা চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে বলে গেলেন, 'তেমন দেরি অবশ্য হবে না, সে হুঁশ আমার আছে। সাধু দেখতে

গিয়ে কি রাত কাটিয়ে আসব ?'...

মাসিমা বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই মহাবীরের আরতি আরম্ভ করলেন পূজারীজী। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এলেই তিনি কাজটা সেরে নেন। কীই বা এমন আরতির ঘটা—আর শীতল বলতে তো দুখানা শুকনো প্যাড়া! কদাচিৎ কেউ পূজো দিয়ে গেলে মহাবীরের সামনে তবু ধরা যায়।

এ আরতি কেউ দাঁড়িয়ে দেখেও না—গোবিন্দজী কি রাধারমণের মতো। রাধাবল্লভের আরতি তো শুরু হয় আটটা সাড়ে আটটায়। সেজন্যে লোকে অপেক্ষাও করেন। উনি কেন খামোকা দেরি করবেন ?

আরতির শব্দ পেতেই বিশাখা আস্তে আস্তে উঠে এল, মহাবীরের সংকীর্ণ কুটুরির সামনে যে সংকীর্ণতর ফালিমতো রোয়াক – সেইখানে এসে বসল।

আরতি শেষ হলেই শীতল দেন পূজারীজী, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন—অতিকষ্টে, সেটুকু স্থান রাখেন নি গৃহকর্তারা—বেরিয়ে আসেন। চারিদিকে চাইবার অবকাশ মেলে তখন।

আজ বিশাখাকে দেখে চমকে উঠলেন একেবারে।

'তুমি উঠে এসেছ মা, নতুন হিমের সময়—যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় ?'

'আমার কিছু হবে না পূজারীজী, যম আমার দিকে সহজে হাত বাড়াবেন না।'

'তা কেন বলছ মা', মৃদু অনুযোগের স্বরে বলেন, 'এত লোক তোমার জন্যে উৎকণ্ঠিত, ব্যস্ত। তোমার স্বামী শাশুড়ি তাঁদেরও তো চিন্তার অন্ত নেই।'

প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বিশাখা বলে, 'চাদর মুড়ি দিয়েছি তো, মাথায় ঘোমটাও আছে। আর এ যা চাপা বাড়ি—ঠাণ্ডা লাগবে কোথা দিয়ে ?'

এর পর দুজনেই চুপ ক'রে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বিশাখা দু হাত জোড় ক'রে আস্তে আস্তে বলে, 'পূজারীজী, আমি আপনাকে আমার বাবার মতোই দেখি, তারও বেশী—আমার জন্যে আপনি যা করেছেন কোন আত্মীয় করতে পারত না। সেই ভরসাতেই একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন—'

পূজারীজী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'এসব কথা বলছ কেন মা, ভিক্ষা কি বলছ—তুমি মেয়ে, আবদার করবে। বলো কি করতে হবে ?'

সঙ্কোচ কাটানো কঠিন, একান্ত লজ্জারই কথা কতকটা।

তাই খানিক চুপ ক'রে থাকতে হয়। তারপর মাথা নিচু ক'রে বলে, 'বাবা, লীলাধর পূজারীকে একটু খবর দিতে পারবেন ? যদি আমার সঙ্গে এখনই একবার দেখা ক'রে যায়—মাসিমা আসার আগেই।'

বিস্ময়ের শেষ থাকে না, আশঙ্কারও।

পূজারীজী যেন আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'মা—!'

'জানি বাবা। কিন্তু সে আমাকে মেয়ে বলেছে, আমি তাকে বাবা বলেছি। সে ঘটনার পর থেকে সে আসে এখানে কিন্তু এদিকে কোন দিন তাকায় না—তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমার এই মৃত্যুমুখে পড়ে থাকার খবর সে-ই দিয়েছে রামরতিয়াকে —সে-ই খবর নিতে এসেছিল প্রথম। তার পরও বাইরে থেকে খবর নিয়ে গেছে। সে কৃতিত্ব দাবী করে নি কোনদিন বা সেই ছুতোয় ঘনিষ্ঠতা করতে আসে নি। আমি সেসব কথা ভেবে দেখেই বলেছি বাবা। আমি আজ এতকাল পরে অসৎ পথে পা দেবো—এমন ভয় আপনার মনে এল কি ক'রে?'

'না না, তা নয়', লজ্জিত হয়ে পড়েন পূজারী, 'তবু—। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি কিন্তু ওদের আরতি শুরু হয়েছে। ঘড়ি বাজার আওয়াজ আসছে, এই তো নহবৎও বেজে উঠল। যদি আরতির মধ্যে থাকে তো এখন ডাকা যাবে না। তাহলে আবার খানিক পরে যেতে হবে।'

তিনি তখনই নামাবলীটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

লীলাধর আরতিতে ব্যস্ত ছিল না, আজ তার এবেলা রসুইঘরের পালা। অকস্মাৎ পূজারীজীকে উঁকি মারতে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

কিন্তু বার্তা যা শুনল, তাতে বিস্ময়ের অন্ত রইল না বললে কিছুই বলা হয় না—বিহ্বল বললেও না—সে একেবারে পাথর হয়ে গেল।

অনেক কষ্টে যখন কথা কইতে পারল, তখন শুধু বলল বা বলতে পারল—'আমাকে? জরুরী কথা আছে? কী বলছেন গুরুজী!'

'ঠিকই বলছি। ঐ রকম আমিও তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম যখন কথাটা বল্লেন। কিন্তু কথা বলে বুঝলাম উনি সব দিক ভেবেই বলেছেন। সে আওরৎ নেই, মা একাই আছেন। খুব দরকারী কথা কিছু বলবেন। বাড়ি ফাঁকা, একা আছেন, আমি যাই। তা কী বলব তাঁকে?'

'বলুন আমি এখনই যাচ্ছি, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে। এ তো তাঁর হুকুম, যেতে আমাকে হবেই। তবে রসুইঘরের একটু ব্যবস্থা ক'রে ওদের না বলে যেতে পারব না তো। মোটে তিনজন আছি, আর একজনকে না বসিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'...

লীলাধর এল ঠিক পাঁচ-ছ'মিনিটের মধ্যেই। রান্নাঘরে ছিল এতক্ষণ, চার-চারটে চুলি জ্বলছে, সেখানে খালিগায়েই কাজ করছিল। বাইরে ঠাণ্ডার আভাস থাকলেও ওদের সর্বাঙ্গে ঘাম—কোনমতে একটা উড়ুনি গায়ে জড়িয়ে চলে এসেছে, সে পাতলা কাপড় ভিজে উঠে সমস্ত গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে।

সে মাথা হেঁট ক'রেই ঘরের দরজায় দাঁড়াল, 'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ বাবা, আমার একটা উপকার করতে হবে। সে কিন্তু তুমি ছাড়া কারও দ্বারা হবে না। তবে ঝুঁকি আছে, তাও বলে দিচ্ছি আগেই।'

'বাবা' সম্বোধনে এখনও একটা আঘাতের ভাব আসে বৈকি মনে।

তবে স্থিরভাবেই সেটুকু সামলে নিয়ে বললে, 'হুকুম করুন কি করতে হবে। আমার জন্যে ভাবি না, আপনি কোন লজ্জা কি বিপদের মধ্যে পড়বেন না তো ?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে সোজাসুজি নিজের বক্তব্যে এল বিশাখা।

'গোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে কোন্ এক সন্ন্যাসিনী এসেছেন, তুমি জানো ?'

'খুব জানি। আমি দর্শন ক'রে এসেছি। পার্বতী মাতাজী। খুব উঁচুদরের সন্ন্যাসিনী। বড় বড় মহান্তরাও ওঁর পায়ে পড়েন। তবে উনি তো আজ শেষ রাত্রেই চলে যাবেন। উত্তরকাশী না কি তীরথ আছে, সেখানে। ভোরে যাবেন লোকের ভীড় বাঁচাতে। কোন বড় মণ্ডলেশ্বর গাড়ি পাঠিয়েছেন ওঁর জন্যে। বাস গাড়ি, তাতে ওঁর সঙ্গে যাঁরা থাকেন সবাই যেতে পারবেন।'

'সেই জন্যেই বলছি বাবা, আমি তোমার মেয়ে, আবদারই করছি ধরো, আজ বেশী রাত্রে সবাই যখন শুয়ে পড়বে—আমাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিতে পারবে ? আর কিছু দরকার নেই, তুমি বাইরে থেকে সে আস্তানাটা দেখিয়ে দিয়েই ফিরে এসো, তোমার অন্য কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না।'

চমকে ওঠে লীলাধর। 'সে কি, কি ক'রে যাবেন আপনি, এই শরীরে ? তা হলে তো ডুলির ব্যবস্থা করতে হয়। তবে তাতে তো লোক জানাজানি হবে—'

'না না। আমি হেঁটেই যাবো, যেমন ক'রে হোক যাবো। মেয়েদের জানো না, সব পারি আমরা। তুমি তোমাদের পঙ্গত চুকলে কোন অজুহাতে বেরিয়ে এসে শুধু এখানে দাঁড়িও—কিছু বলতে কি সাড়া দিতে হবে না—আমি বেরিয়ে আসব। ওঁদের না কারও ঘুম ভাঙে এমনি ভাবে যেতে হবে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল লীলাধর, তারপর সোজাসুজি মাতৃসম্বোধন ক'রে বলল, 'লেকিন মা—আমার কোনও বদনামের জন্যে ভাবি না, এখানে চাকরি যায় অন্য কোথাও কাজ যোগাড় করতে পারব, নয়তো দেশে গিয়ে কথকতা করতে পারব গুরুজীর কৃপায়—আপনার নামে যদি কোন দুর্নাম রটে আমাকে জড়িয়ে, তাহলে আমাকে আত্মঘাতী হতে হবে।'

'কিচ্ছু হবে না। আমি সংসার ছাড়তে চাই, সন্ন্যাস নিতে চাই। এ ঘরগিরস্তি আমার সইবে না—সেই জন্যেই ওঁর পায়ে গিয়ে পড়তে চাইছি, তিনি যখন এত উচ্চ-কোটির সাধিকা, আমার বিপদ আমার মনের কথা বুঝে কি পায়ে ঠাঁই দেবেন না ?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি না কেন এমন সোনার সংসার ছেড়ে যেতে চাইছেন। তবে ঠিক সময় আসব, পথঘাট নির্জন হলে। আপনার হুকুম আমার কাছে দেবীর আদেশ।'

সে জেগেই আছে, কেউ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেও দেখার কোন অসুবিধা হয় না। মাসিমার মশারি বাঁচিয়ে, দরজার একটা কপাট খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বিশাখা।

কারও সঙ্গে কারও কথা বলার প্রয়োজন নেই, বাইরে আসা মাত্রই চলতে শুরু করল।

লীলাধরের আরও জোরে চলবার কথা, চলার কোন আওয়াজ না হয় সেজন্যে সেও কোন পাদুকা—চটি বা খড়ম পায়ে দেয় নি। সাধারণ ধুতি পরনে, গায়ে একটি খাটো-হাত কুর্তা—মেরজাইয়ের মতো। সে দ্রুত চলার জন্যেই প্রস্তুত। তবে এটা সে জানত তার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা চলবে না। মুখে যা-ই বলুক বিশাখা, আদৌ হাঁটতে পারবে কিনা তাই সন্দেহ, জোরে যাওয়া তো অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে কাছে কাছেই যেতে হবে।

আর সে আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল দু'চার পা যেতে না যেতেই—বারে বারেই পা টলছে, হয়ত মাথাও ঘুরছে, দুর্বল শরীরে কোনমতে লালাবাবুর মন্দিরের কাছাকাছি এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, লীলাধরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল বলেই—সে কোন দ্বিধা না ক'রে চোখের নিমেষে বাহুমূলটা ধরে ফেলল, নইলে তখনই একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটত।

'আপনি পারবেন না এতটা যেতে দেবীজী, চলুন ফিরে যাই।' অতি অস্ফুট স্বরে বলে লীলাধর।

'না, আমি যাবোই। যদি বসে বসে কি হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় তাও যাবো। তোমার পায়ে পড়ি—এইটুকু পৌছে দাও!'

আর কথা বাড়াল না। নিশীথ রাত্রে অতি সামান্য শব্দও বহুদূর পর্যন্ত পৌছয়, কৌতূহলী কেউ জানলা খুলে দেখা আশ্চর্য নয়।

তবে বিশাখাও আর কোন সঙ্কোচ করল না। সে ই লীলাধরের ওপর হাতটা চেপে ধরল অবলম্বনের মতো, নইলে কতক্ষণ আর মাতালের মতো টলতে টলতে যাবে।

এখনও পুরুষের বক্ষরক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে সে স্পর্শে।

তবে প্রাণপণেই চিত্ত দমন করে। শুধু শপথের কথা স্মরণ ক'রেই নয়—এই

তরুণীর মনের দৃঢ়তা মনে ক'রেও।

কিন্তু সে ভাবেও আর বেশী দূর যাওয়া যায় না। অর্ধেক পথ কোনমতে যাবার পরই অসুস্থ, এতকালের শয্যাবদ্ধ দেহ একেবারেই এলিয়ে পড়ে যাবার মতো হয়, দু হাতে ধরে ফেলেও আর তাকে দাঁড় করানো যায় না, পায়ে মনে হয় আর বিন্দুমাত্র জোর নেই।

সময় নেই ইতস্তত করবার, উপায়ও নেই অন্য কোন।

বাধ্য হয়েই লীলাধর তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে, বলতে গেলে বিশাখার দেহ সম্পূর্ণভাবে ওর দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

বিশাখারও সাধ্য ছিল না বাধা দেবার, একেবারেই দেহে আর কোন শক্তি ছিল না। লীলাধর সেই ভাবেই বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে তার সম্পূর্ণ ভারটাই এক রকম বহন ক'রে নিয়ে চলল। বিশাখার অর্ধমূর্ছিত অবস্থা, এ নিন্দনীয় পরিস্থিতির ফলাফল চিন্তা করাও সম্ভব নয়।

'কেউ যদি দেখে ফেলে' এ প্রশ্ন বিবেচনা করবে কে!

পুরুষটার বুকের রক্ত উত্তাল, বুকে দ্রুত রক্তপ্রবাহের প্রবল শব্দ, সে ধ্বকধ্বকানি বুঝি বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে—তবু প্রাণপণেই নিজের মা-বাবাকে স্মরণ ক'রে কঠিন অনড় হয়ে রইল মনের দিক থেকে।

না না, বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না কামার্ত-আকাঙ্ক্ষাকে।

ঐ বাহুবন্ধনের কোথাও বিশেষ স্থানে চাপ দেওয়া কি ওর দিকে দেহটা বিন্দু-মাত্র ফেরাবার চেষ্টা করবে না—কিছুতেই না।...

এসব বোঝার বা ঐ পুরুষের কি অবস্থা হতে পারে, কিম্বা হচ্ছে—তা কল্পনা করার মতো মানসিক শক্তি নেই তখন বিশাখার, বিহ্বল অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থা, পা কাঁপছে থর থর ক'রে—কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে বোধ হয় সে জ্ঞানও নেই।

তবে কামনা কি প্রবৃত্তি—সে উপভোগের স্মৃতি দেহের থেকে বেশী শক্তিধর। কী হচ্ছে সে সম্বন্ধে অবহিত হবার আগেই একটা বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

অল্পবয়সী বলিষ্ঠ পুরুষদেহের একটা বিশেষ গন্ধ আছে, তার মাদকতা, মোহ—বড়ই প্রবল: সে বলিষ্ঠ দেহের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থার উত্তেজনা অবশ্যই আছে কিন্তু সে এমন-সকল-ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা অনুভূতি নয়। উত্তেজিত কামনায় চঞ্চল হয়ে ওঠার মতো নয়।

একটু একটু ক'রে চেতনা আসতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে আর এক বলিষ্ঠ সুন্দর দেহের সেই মনপ্রাণ-অবশ-করা দেহগন্ধ, স্বেদবিন্দুশোভিত প্রশস্ত বক্ষের

আশ্চর্য আকর্ষণ ; কঠোর বাহুবন্ধনের বিচিত্র মধুর শক্তি ; তাঁর দেহের মধ্যে মুখ গুঁজে দেওয়ার ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা এক আনন্দাস্বাদ।

সেই আকর্ষণ, সেই স্মৃতির জন্যই তো এতকাল পাগল হয়ে ছিল। এত দুঃখ-দুর্দশা, এত অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করেছে—এই সাড়ে তিন বছর কঠিন অস্খলিত তপস্যা করেছে—সে তো ঐ অদ্বিতীয় দেহের সংস্পর্শ-স্মৃতির পাগল করা কামনায়।

তাঁকে ছেড়ে সন্ন্যাস নেবে ? না, তা সম্ভব নয়।

* * *

এই অর্ধউন্মাদ অর্ধমৃত প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায় লীলাধর কোনমতে এনে সেই কুঞ্জের দ্বারপ্রান্তে পৌছে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ঐ আপনার সামনে দাঁড়িয়েই আছেন পার্বতী মাতা—বোধ হয় আপনারই অপেক্ষা করছেন।'

তারপর কোনমতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন সামনের দিকে একটু ঠেলেই দিল লীলাধর। বিশাখাও প্রায় আছড়ে পড়ার মতোই মাতাজীর পায়ের ওপর পড়ল। পাগলের মতো বলে উঠল, 'আমি আপনার কাছে সন্ন্যাস ভিক্ষা করতে এসেছিলাম মা—কিন্তু সে পারব না, পারব না। এখন বুঝছি তাঁকে না পেয়ে ছাড়তে পারব না।'

বলতে বলতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

পার্বতী মাতাজী কৌতুক-প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সত্যিই তিনি যে এর প্রতীক্ষা করছিলেন।

২১
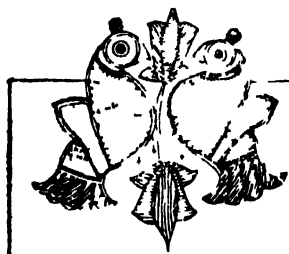
পার্বতী মাতাজী একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে—সেইখানে, কুঞ্জের পথের ওপরই বসে পড়লেন, তারপর বিশাখার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে ডাকলেন, 'মা, এবার একটু সামলে নাও, আমাদের আর একটু পরেই রওনা দিতে হবে যে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হ'ল। কিন্তু সে মুখ তুলল না, বরং সন্ন্যাসিনীর পায়ের খাঁজে মুখ রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

'কি হবে মা আমার। আমি ওঁকে ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে পারব না। ওঁর সম্বন্ধে আমার কামনা যে আজও যায় নি। অথচ—'

পার্বতী বললেন, 'পাগলী, সে কামনা যাবে কি ক'রে, তুই যে কঠোর তপস্যা করেছিস, সে তো স্বরূপকে কেন্দ্র ক'রেই, ইষ্ট গুরু সবই তো ঐ লোকটির সঙ্গে এক হয়ে গিছল। সাধনার নাম ক'রে কামনাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিস্ যে।'

'তাহলে কি হবে মা? আমার জন্যে যে ওঁর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তা হয়ত যাবে। কিন্তু এ তোরও দোষ নয়, স্বরূপেরও দোষ নয়—দুজনেরই ভাগ্যের দোষ। কেন ভাগ্য এভাবে তোকে বঞ্চিত করলেন, বিনা দোষে এত কষ্ট দিলেন তাকেও—তাও বলতে পারব না। জন্ম-লগ্নের লিখন, পূর্বজন্মের কর্মফল—যাই বলুক লোকে তাতে কি ইহজন্মের দুঃখ কিছু কমে?…চল্ ওঠ্, ভেতরে চল্ ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে দিই, একটু সুস্থ হোক দেহ।'

এই বারই কথাটা মনে হ'ল, একটু বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মা, আমার কথা, ওঁর কথা—নাম পর্যন্ত—এসব জানলেন কি ক'রে? তাহ'লে লোকে যা বলে —আপনি সর্বজ্ঞ—তাই ঠিক।'

কতকটা জোর ক'রেই ওকে তুলে ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'পূর্ণিমা আমার বাল্যবন্ধু, আত্মীয়তাও একটু ছিল—বিবাহের সময় ওর শ্বশুরমশাই শ্যামসোহাগিনী নাম দেন। ওর শ্বশুর, গুরুও বটে, বলেছিলেন, আমরা গোপী-বল্লভের সেবক, আমাদের আত্মবৎ সেবা—সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে, বেদান্তবাদী তপস্বীদের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না রাখাই ভাল। আমাদের সেবা বা কর্তব্য দেহধারী লীলাময় ভগবানকে নিয়ে—দণ্ডী শংকর আমাদের আদর্শ নন। সেইজন্যেই পূর্ণিমা দেখা করত না। তবে দুজনেই দুজনের খবর রাখি। স্বরূপও আমার সঙ্গে কাশীতে, পুষ্করে নানা সময়ে দেখা করেছে, সে বেদান্তও ভাল ক'রে পড়েছে—স্বয়ং মধুসূদন সরস্বতীকে এক সময়ে শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করেছিল। তার মতো নীরব তপস্বী খুব কম আছে মা, তার মনে লীলাময় মায়াময় এক হয়ে গেছেন। আমি শুধু তাকে স্নেহ নয়, শ্রদ্ধাও করি।'

বলতে বলতেই ওকে মন্দিরের সামনের দালানে বসিয়ে চরণামৃতর সঙ্গে একটু শীতলের প্রসাদী দুধ মিশিয়ে খাইয়ে বললেন, 'তুমি যে এ কাজ করবে মা, আমার এখানে আসছ সন্ন্যাস নিতে—সে খবর আমি পূর্ণিমাকে দিয়ে পাঠিয়েছি। কাল সকালে এখানে এসে স্বরূপও সে সংবাদ পাবে। এ নিয়ে হয়ত কোন আলোচনা হতে পারে ভেবে আমি সেকথাও রটনা করেছি, আমি দিনকতক ওকে আমার কাছে রাখব বলে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাহ'লে আমি এখন কোথায় যাবো আপনার সঙ্গে মা ?' একটু ব্যাকুল ভাবেই বলে, 'শুনেছি উত্তরকাশীতে যাবেন, সে তো বহুদূর। তপস্বীদেরই জায়গা—আপনি কি আমার মন ঐ দিকে নিয়ে যাবার জন্যে, সন্ন্যাসের মতো ক'রে তৈরী করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন ? ওঁর সঙ্গে—ওঁর সঙ্গে কি আর দেখা হবে না !'

খুব খানিকটা হেসে নিয়ে পার্বতী মা বলেন, 'তোর আগে ঐ ভয়ই হ'ল ! দূর পাগল ! সন্ন্যাসের দিকে মন ফেরানো এত সহজ !...বিশেষ তুই তো ভগবানের কথা ভাবিস নি, পুরুষের কথা, স্বামীর কথাই ভেবেছিস। তোর ও তপস্যার কোন জোর নেই ?'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'শোন, ঈশ্বরমুখী যে সন্ন্যাস এক জন্মে তা হয় না বোধ হয়। কিম্বা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া হয় না। তিনি যার সাধনা নেবেন, যাকে দিয়ে এ কাজ করাবেন, তাকে সেইভাবে তৈরী করেন। আমারও বিয়ে হয়েছিল। আট বছর বয়সে বিয়ে—আট বছরের মধ্যেই বিধবা হওয়া। বিয়ের সময়ে দু-তিনটে দিন ছাড়া আর দেখাও হয় নি। কোন স্মৃতিও ছিল না। বিয়ে হওয়া বা বিধবা হওয়া কিছুই বুঝি নি। আমাদের বাড়িতে স্বপ্নলব্ধ নারায়ণশিলা ছিলেন। মাছ-মাংস বাড়িতে ঢুকতই না, কাজেই সেদিক দিয়ে বোঝারও কোন কারণ ছিল না।

'আমার যখন এগারো বছর বয়স—হরিদ্বারে গিছলুম মা-বাবার সঙ্গে কুম্ভ-মেলায়। গঙ্গার ওপারে তখন বিস্তীর্ণ চড়া ছিল, সেই মাঠে সন্ন্যাসীরা থাকতেন, হয়ত এখনও থাকেন, তবে সে খুব রাজকীয় ভাবে। তখন অনেকেই খোলা জায়গায়

থাকতেন ধুনি জ্বালিয়ে। শুধু সন্ন্যাসীরাই নন, সন্ন্যাসিনীরাও থাকতেন অমনি ভাবে, একেবারে বিবস্ত্রা নির্বিকার সন্ন্যাসিনী দেখে তখন খুব অবাক লেগেছিল।

'মা যেন কার মুখে শুনেছিলেন যে ওখানে এক মাতাজী আছেন, তিনি নাকি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর কত যে বয়স তাও কেউ জানে না। মার কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক, একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে করতে খোঁজও পাওয়া গেল —কিন্তু দেখা পাওয়া তার দুঃসাধ্য। চারিদিকে প্রচণ্ড ভীড়, বিশেষ সন্ন্যাসিনীদের জন্যে ভীড আরও বেশী। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেল যে মাতাজী থাকেন—ঐ মাঝখানটায়, পাতালতা দিয়ে তৈরী করা যে ছোট্ট ঝোপডা—তার মধ্যে, অনুমতি না হলে দর্শন পাবার উপায় নেই। চারিদিকে বহু সন্ন্যাসিনী যেন চেডার মতো ঘিরে আছেন। এদের দেখতেই বোধহয় বেশী ভীড—তাদের ঠেলে অনেক কষ্টে য দ বা চেডীদের কাছে পৌছনো গেল তারা বললেন, নেই হোগা। মা কাবুতি মিনাত করলেন কিছুক্ষণ, তাঁদের সেই এক কথা, হোগা নেই।

'ফিরেই যাবেন মা, অকস্মাৎ সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই মাতাজী তাঁর ঘর থেকে। আমার মুখখানা তুলে ধরে একটুখানি দেখেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এ তুই-ই। এতদিন পরে আসার সময় হ'ল। তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি যে।...তাই তো বলি, অকস্মাৎ সারা গায়ে এমন ক'রে কাঁটা দিয়ে উঠল কেন? বুঝলুম তুই এসেছিস।" তারপর মায়ের দিকে ফিরে বললেন, "বেটি, তোর এ মেয়ের আশা ছাডতে হবে। এর দেহে যা যা লক্ষণ—তুই, তোরা কেউ বুঝিস নি। এর জন্যেই পথ চেয়ে এতকাল বসে আছি, আমাদের যে সাধনার ধারা—তা কাউকে না জানিয়ে তৈরী না ক'রে যেতে পারছিলুম না। এবার ছুটির হুকুম হয়েছে বুঝতে পারলুম।"

'মা খুব একটা প্রতিবাদ ক'রে উঠতে যাচ্ছিলেন, মাতাজী হাসলেন, বললেন, "ব্রাহ্মণের মেয়ে—আট বছরে বিয়ে হবে, আট বছরেই বিধবা—অক্ষতযোনি—কেমন, সব মিলছে তো? আমার যিনি ইষ্ট তিনি এ সব তৈরী ক'রে রেখেছেন যে, আমি যাঁর কাছে মানুষ তিনি এসব জানিয়ে রেখেছেন। আর ছাখ্, বাড়িতে রেখেই বা কি হ'ত? বিয়েও তো দিস নি আর একটা, এই কিশোরী মেয়ে—যখন পূর্ণ যৌবন হবে, সামলাতে পারবি? তোরা মলে এর কি দুর্গতি হবে, তা ভেবেছিস?"

'মা অত বোঝেন নি। তিনি আমাকে নিয়ে বলতে গেলে পালিয়ে এলেন ধর্মশালায়। কিন্তু আমার কি যে হ'ল—মন সেই তাঁর কথাই ভাবতে লাগল, কে যেন দড়ি দিয়ে টানতে লাগল তাঁর দিকে। ভোরবেলা উঠে বাইরে এসেছি, দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুই বললেন না, আমার হাত ধরে নিমেষে সেই ভীড়ের মধ্যেই

কোথায় মিশে গেলেন। তার পর কি হয়েছে জানি না। আমার সেই মাতাজী গুরু—তিনি কুম্ভের স্নানও করলেন না। সেই দিনই চলে গেলেন হিমালয়ের সুদূর এক প্রান্তে।

'তা ঠিক সেদিনই কি মন পুরোপুরি সন্ন্যাসের দিকে ফিরেছিল? অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে মনের সঙ্গে, অনেক বিদ্রোহ করেছি—বিশেষ যখন ভরা যৌবন এল। যুদ্ধ করেছেন সে মাতাজীও মন ফেরাবার জন্যে। শেষ অবধি তাঁরই জয় হয়েছে।'

'তা এখন তাহ'লে আমাকে নিয়ে কি করবেন?'

'ভয় নেই, ভয় নেই। গাড়ি এসেছে, আমি দিন দুই তিন ঋষিকেশে থাকব, বলাই আছে। ওদেরও বলে দিয়েছি ঐখানে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসতে। তা হ'লে রটনাটাও সত্যি হয়। আমার বুদ্ধিমতো একটু পরামর্শও দিয়েছি। মনে হয় সেটা ওদের মনে লাগবেও। তবে একটা কথা বলছি, তোমার যা শক্তি, সন্ন্যাসের পথে গেলেই ভাল হ'ত। শান্তি পেতে, কামনাও শান্ত হ'ত একদিন। ভাগ্যের যে কাঁটা তোমার জন্মপত্রে বিঁধে আছে, তা কি তোমায় সহজে অব্যাহতি দেবে? অবশ্য এও আমার বলা ভুল, সে কাঁটা তোমাকে এ পথে আসতে দেবে কেন!'

ঋষিকেশ এই নতুন দেখল বিশাখা। কী বা দেখেছে সে, বিয়ের দৌলতে যেটুকু দেখা—তা ছাড়া শান্তিপুর নবদ্বীপ। পাহাড় বলতেও এই দেখল, গোবর্ধন হয়ত কোনকালে পাহাড় ছিল, শিলা সংগ্রহ করতে করতে তা প্রায় ভূমিসাৎ হতে বসেছে।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে খরস্রোতা গঙ্গা, ভাল লাগারই কথা।

ত্রিবেণী ঘাটে স্নান ক'রে যখন পাহাড়গুলোর দিকে চায়, গঙ্গার প্রবল স্রোত বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে শুধু শুভ্র ফেনারই সৃষ্টি করছে না, অল্প গর্জনেরও সৃষ্টি করছে। মনটা ঐ দিকেই যেতে চায়—আরও ওপরে না জানি কি আছে, আরও, আরও ওপরে?

তবু সম্প্রতি বন্যায় অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক সাধুদের আশ্রম ভেসে গেছে, বহু সাধুর মৃত্যু ঘটেছে, কতদিনের বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে কোথায় ভেসে গেছে। এমন কি সাধুদের বড় বড় আশ্রম আখড়া—এসবেরও বিপুল ক্ষতি হয়েছে। তবে বিশাখা তো আগে সে সব কিছু দেখে নি, এখন যা দেখছে তাও খুব ভাল লাগছে। গঙ্গার সে প্রলয়ঙ্কর রূপও তো নেই—প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

প্রথমে স্তবপাঠ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে—নদীর ওপারে নিবিড় শ্যামলতা মাখা পাহাড়গুলোর দিকে—মাতাজী কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন

টের পায় নি—আস্তে আস্তে বললেন, 'মনটা এতেই ওপরের দিকে টানছে, আরও ওপরে উঠলে ফিরতে ইচ্ছে করবে না।...তোকে সংসারে ফিরতেই হবে, তবে বড় শাস্তি মা, বিশেষ এই গঙ্গা। শুধু পবিত্র নন, বড় স্নেহময়ী। মানুষের দুঃখ কষ্ট জালা যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্যে মা যেন কোল পেতে আছেন।'

তৃতীয় দিনের সকালেই শ্যামসোহাগিনী এসে গেলেন, স্বরূপও।

স্বরূপ নীরবেই প্রণাম ক'রে বসলেন, মা এবং মায়ের বন্ধু দীর্ঘকাল পরে মিলিত হয়েছেন—সেখানে তিনি কি কথা বলবেন। বিশেষ যে সন্ন্যাসিনী ত্রিকালজ্ঞ সর্বজ্ঞ বলে বিদিত।

পার্বতী মাতাজী এগিয়ে এসে বান্ধবীর হাত ধরলেন, 'কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। ভাগ্যিস বৌমার মাথায় ভূত চেপেছিল—'

'ভূত চেপেছিল না তুই চাপিয়ে দিলি কে জানে। নইলে ঘটনার আগেই সে বার্তা পৌঁছে গেল কি ক'রে? কেন কখন সবই তো জেনে বসে ছিলি। আরও আগেই খবরটা পাঠালি না কেন, তাহলে এই টানাপোড়েনটার দরকার হ'ত না।'

'তাহ'লে দেখাটা হ'ত না যে।'

'তা বটে। তোর চালচলন কথাবার্তায় মনে হয় অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়েছেলে, অথচ এই সব ঘটনার কথা শুনলে যেন গা শিউরে ওঠে—ত্রিকালজ্ঞ বলে যারা, ঠিকই বলে।'

'যাক গে ওসব কথা। স্নান তো করবিই, বাবা স্বরূপ তুমিও যাও। এখানে তোমার পাণ্ডা আছেন, তাঁকে খবর দিয়েছি। তিনি ঘাটে অপেক্ষা করছেন। স্নান ক'রে এসো, যদি তোমার মা সঙ্কল্প ক'রে বিধিমতো স্নান করেন তাই আনিয়েছি। আগে তো বোধ হয় আসে নি। পুজোর ঘর এখানে আছে, সাজানোই আছে—এমন কি রাধাগোবিন্দর পট পর্যন্ত আছে। ধ্যান পূজার কোন অসুবিধা হবে না।'

বিশাখা আগেই এসে প্রণাম করেছিল—দুজনকেই। মাতাজীর দৃষ্টি সর্বত্র। ওদের পথের কাপড়, অথচ এসে দাঁড়ানো মাত্র প্রণাম করা উচিত—এ জন্যে উনি পট্টবস্ত্রের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, শাড়ির ওপর চাদর জড়ানো। শ্যামসোহাগিনী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন মাত্র, স্বরূপকে দূর থেকে প্রণাম করা—সেক্ষেত্রে আশীর্বাদের প্রশ্নই ওঠে না। গুরুজন-স্থানীয়দের সামনে স্বামীকে স্পর্শ ক'রে প্রণাম করা অবিধেয়—তাও মাতাজী বলে দিয়েছিলেন, আগে শাশুড়িও বলেছেন। শাশুড়ি এসে পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নি। ওঁরা রাগ করেছেন নিশ্চয়ই—এই ভেবেই মাথা হেঁট ক'রে বসেছিল। ও তরফ থেকে সম্ভাষণ মাত্র না করায় এই

হেমন্তর শীতলার্ত দিনেও কপাল গলা ঘামে ভিজে উঠল।

একবার মাত্র সে দিকে চেয়েই মাতাজী বললেন, 'বৌমা আমার সঙ্গে গিয়ে স্নান করেছেন, পূজোটা করতে দিই নি, স্বরূপ যখন আছে, দুজনে একসঙ্গে ধ্যান পূজো করবে, সেই তো ভাল।'

এর পর কে কথা বলবে! বলবার আছেই বা কি। সহজ সরল কথা। এঁরা দুজনেই স্নানে চলে গেলেন।

স্নান পূজা শেষ হলে এ মঠের যিনি অধিষ্ঠাতা দেবতা তাঁর বাল্যভোগের প্রসাদ এলো। জলযোগ শেষ ক'রে শ্যামসোহাগিনী বললেন, 'তারপর? তুমি যখন এত কাণ্ডই ঘটালে—এবার বলে দাও ব্যবস্থাটা কি হবে! আমি গোকুলের কথাই বলেছিলাম বৌমাকে, সে জন্যে পুরোনো বাড়ি নতুন ক'রে তৈরী হ'ল বলতে গেলে—সম্ভবত তাতেই তাঁর মনে হয়েছে এতেও আমাদের শ্রীরাধা-গোপীবল্লভ থেকে এটুকু দূরত্ব, তাও স্বরূপের ভাল লাগবে না। সে-ই এত সমস্যার কারণ, স্বামীর শান্তি নষ্টের কারণ হচ্ছে দেখে সন্ন্যাস নিয়ে নিজেই দূরে কোথাও চলে যাবেন ভেবেছিলেন। তার পর যা করবার, যা করা উচিত তুমিই জানো—তুমি ত্রিকালজ্ঞ কিনা জানি না, অলৌকিক জ্ঞান দূরদৃষ্টি কিছু আছে তা জানি, বহুবার সে পরিচয় পেয়েছি—তুমিই পথ দেখাও, কি করবো বলো!'

পার্বতী মা অতি সাধারণ ভাবেই বললেন, 'তা এত সৃষ্টি করতেই বা যাচ্ছ কেন তোমরা? অস্বাভাবিক কিছু করতে গেলে—নতুন কোন ব্যবস্থা—তাতে তো এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। আমি তো জানি স্বরূপ বাবা আমার দীর্ঘকাল ধরে গোপীবল্লভের বাগানবাড়ির মধ্যে অথচ মূল দেবগৃহ থেকে খানিকটা দূরে একাই বাস করেন, ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকেন—'

চমকে উঠলেন মা এবং ছেলে দুজনেই, শিউরে উঠলেন বলতে গেলে—এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর এঁর জানবার কোন কারণই তো নেই।

পার্বতী মা বলেই চললেন, 'সোজাসুজি এখান থেকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে তুললেই তো হয়। কোন রকম আড়ম্বর বা বিশেষ ব্যবস্থা করবার দরকার কি? বন্যার পর নিশ্চয়ই খাট বা চৌকির ব্যবস্থা হয়েছে সে ঘরে—স্বামী স্ত্রী তাতেই শোবে, অথবা যদি সে চৌকি একজনের মতো হয়—দুজনেই ভূমিশয্যা করুক। কোন রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে গেলেই মানুষ সচেতন হয়। যেখানে বৌমা ছিলেন সে পূজারীজীকে কিছু প্রণামী দিও—স্বরূপ নিজ হাতে দিয়ে এলেই ভাল হয়। যে মেয়েটি সেবা করেছে এত দিন তার যোগ্য প্রাপ্য চুকিয়ে বলে দেবে তিনি নিজের বাড়িতে

চলে গেছেন।...আর, কৃষ্ণচন্দ্রের পূজারী যে ছেলেটি বৌমাকে এনে আমার কাছে পৌছে দিয়েছিল, বড ভাল ছেলে, অসাধারণ মনের জোর—যদি তার কোন উপকার করতে পারো তো করো।'

এবার শিউরে ওঠার পালা বিশাখার।

এই তিন চার দিনে ওঁর অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েছে—তবু এত-খানি অন্তদৃষ্টি দেখে—বিশেষ যে এক লহমার বেশী সামনে ছিল না বোধ হয়—চমকে উঠতে হয় বৈকি।...

কিন্তু এসব কথায় শ্যামসোহাগিনীর কান ছিল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে প্রত্যক্ষ সমস্যার কথাই ভাবছিলেন। হয়ত সে সমস্যা স্বরূপের মনেও উঠেছিল, তবে যেখানে মা আছেন, মাতৃস্বরূপা আরও একজন—কথা যা কিছু এঁরাই বলছেন, সেখানে চুপ ক'রে থাকাই উচিত।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গেই বললেন—বিশাখা আছে বলেই এত কুণ্ঠা—'কিন্তু ঝুলনে দোলে, বৈশাখী ফুল-কামরার দিনে, বিগ্রহ এক এক দিন ওখানে যান—তা নিয়ে কোন কথা উঠবে না তো, যদি কোন প্রশ্ন ওঠে—বৌমা অপমানিত বোধ করতে পাবেন।'

'প্রশ্ন তুললেই ওঠে। সহজ স্বাভাবিক ভাবে চললে কেউ এসব প্রশ্ন তুলবে না—মনেই হবে না তাদের। বিগ্রহ যখন আসেন কত কি লোক আসে তার সঙ্গে, চতুর্দোলা বহন ক'রে আনে যারা তারাও সেসব দিনে ঐখানেই থাকে। ঐ বাড়িরই এক অংশে নিশ্চয় দারোয়ানরা থাকে। পটে নিত্য পূজা বজায় রাখতে হয়, সেজন্যে পূজারীও থাকেন। এত লোক ওখানে থাকে, তার জন্যে কার কি মনে হয়? বিশেষ যখন স্বরূপ এতকাল ধরে ওখানেই বাস করছে। সে শুনছি পূজা করাই ছেড়ে দিয়েছে, যদিও আমি এর কোন কারণ বুঝি না। নিত্য-শুদ্ধ নিষ্পাপ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়ে মাইনে করা পূজারীর সেবায় গোপীবল্লভ বেশী তুষ্ট হবেন? না স্বরূপ পূজা করলে কারও মনে কোন প্রশ্ন উঠবে?...যাই হোক, কোন রকম কথা ওঠবার কারণই তো নেই আর!'

'বাঁচালি ভাই, তুই যখন বলছিস আমি নিশ্চিন্ত।'

'চিন্তা মেলা করিস কেন? গোপীবল্লভ তোর সময়ের অনেক আগে থেকে আছেন, পরেও থাকবেন। তাঁর চিন্তা তাঁর ওপর ছেড়ে দিস না কেন?'

তারপরই, বাদানুবাদের আর অবসর না রেখে বললেন, 'বাবা স্বরূপ, আমি এখানে বহু লোককে বলে রেখেছি—তুমি আজ বিকেলে একটু ভাগবত পাঠ আর হিন্দীতে ব্যাখ্যা ক'রে শুনিয়ে দিও।'

স্বরূপ মৃদু হেসে দুই মাকে প্রণাম ক'রে শুধু বললেন, 'কেন বলেছেন তা বুঝেছি। যে জন্যেই হোক আপনার আজ্ঞা যখন, পালন করব নিশ্চয়ই!'

পরের দিনের জন্য মাতাজী ওঁর ভক্তের গাড়িই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। প্রত্যুষে যাত্রা করা হবে, সেইমতো তৈরী হলেন এঁরা। কথা রইল গোকুলের বাড়িতে সেদিন রাত কাটিয়ে শ্যামসোহাগিনী একেবারে ভোরে বাড়িতে চলে যাবেন, এরা দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে বাগানবাড়িতে। এ ব্যবস্থা শ্যামসোহাগিনীর। ওখানে চৌকি ঠিক একজনের মতো—বাড়ির যে বিশ্বস্ত পুরোনো দারোয়ান, তার হাত দিয়ে—নতুন কেনা কিছু নয়—স্বরূপের এ বাড়িরঘরে যে গালিচা তোশক চাদর প্রভৃতি আছে তাই ও বাড়ি চালান করা হবে, চৌকি বার ক'রে মেঝেতেই দুজনের মতো বিছানা পাতা হবে। নতুন কিছু কিনে পাঠালেই লোকের চোখে পড়বে। যার বিছানা সে নিয়ে যাচ্ছে তাতে কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাকা বৌমার যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে সেসব জিনিস রামরতিয়াকে দিয়ে পাঠাবেন সন্ধ্যার পর।

যাত্রার আগে আরও একবার কান্নায় ভেঙে পড়ল বিশাখা। মাতাজীর পা দুটি ধরে বলল, 'মা আপনি সর্বজ্ঞ। দয়া ক'রে বলুন আমার কি এতেই প্রায়শ্চিত্তর শেষ হ'ল, না আরও কোন শাস্তি বাকী রইল? কলঙ্কের ছাপ তো রইলই মা, নিজের বাড়িতে চোরের মতো বাস করতে হবে—এ ছাড়া? স্বামীর সেবা ক'রে শান্তি পাবো তো? তাহলে সব দুঃখ সইবে।'

বিশাখাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তেমনি স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, 'মা, আমি আগেই বলেছি ভাগ্য সর্বাপেক্ষা বলবান, অমোঘ তার ব্যবস্থা। কোন কিছুতেই তার বিধানের অন্যথা ঘটে না। হয়ত তেমন কোন আশ্চর্য শক্তিধর সাধক কিছু নড়চড় করতে পারেন, তবে অত উচ্চে যাঁরা উঠেছেন তাঁদের নাগাল পাওয়াই দুঃসাধ্য, তা ছাড়া এত তুচ্ছ কারণে তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করতে চান না। আমি অন্তত পারি না, সে শক্তি নেই। তাই ভাগ্যে কি আছে নিজেও কখনো জানতে চাই নি। তোমাকেও সেই পরামর্শ দিই, কোন অশুভর সম্ভাবনা আছে, মনে যদি এ সন্দেহ থাকে—তাকে আগ বাড়িয়ে জানতে গিয়ে লাভ কি? ঈশ্বর আছেন মাথার ওপর—তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে।—সেই পরম ও চরম ব্যবস্থাকে মাথা পেতে নেওয়াই কি ভাল না?'

২২
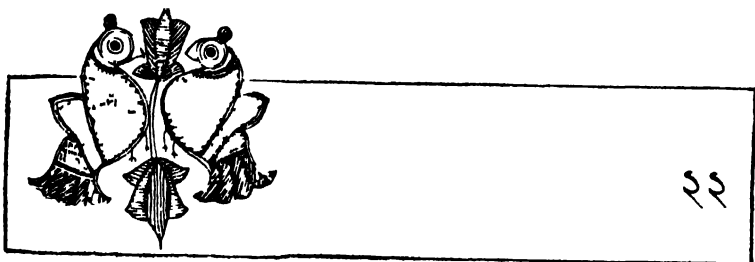
বহুদিন পরে পতি পত্নীর মিলন।

এক বিছানায় শোওয়া, একটি ছোট ঘরে কাছাকাছি থাকা।

এত ঘনিষ্ঠতা, এমন একান্ত সান্নিধ্য, বিয়ের পরে যে তিন চার মাস শ্বশুরবাড়ি ছিল, তখনও ঘটে নি।

বড ঘর, বড খাট আলমারি, বিরাট বিলিতি আয়না ধরেও অনেকটা খালি থাকত। যাকে বলে হাত-পা মেলে থাকা—সেই রকম ব্যবস্থা।

তা ছাড়া দিনে দেখাশুনো হ'ত কদাচিৎ। স্বরূপ দুপুরে ঘুমোতেন না—বোধ হয় এখনও সে অভ্যাস আছে—বিশ্রাম করতেন নিচে পডার ঘরে। পডাশুনো করতেন, কিছু কিছু টীকা প্রভৃতিও লিখতেন, ছোট ভাইকে পডানোর চেষ্টা করতেন।

তার পাশের ঘরটা ছিল বৈঠকখানার মতো। কাজেকর্মে কেউ দেখা করতে এলে, কামদারের সঙ্গে কোন বৈষয়িক কথা থাকলে সেই ঘরেই বসতেন। দুপুরের বিশ্রাম বা কাজ বেশির ভাগ ঐ দুটো ঘরেই সারা হ'ত।

সেই ভাবে যার থাকা অভ্যাস, সে কি এইটুকু ঘরে, আর একটা প্রায় অপরিচিত মানুষের সঙ্গে থাকতে পারবে?

এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছিল—পালে পার্বণে পূজারীরা ছাড়া বাইরের কোন লোক, অতিথি ধরনের কেউ যদি এসে পডেন—তাঁদের জন্যে।

সে অবস্থা দেখা দিলে যাতে কোন অসুবিধা না হয়—একটি বড তোরঙ্গে শতরঞ্চি তোশক বালিশ একপ্রস্থ তোলা থাকত দারোয়ানের জিম্মায়। একটা মশারীও।

স্বরূপ যখন বাড়ি ছেড়ে চলে আসেন তখন সেই বিছানাই নামানো হয়েছিল।

একজনের পক্ষে যথেষ্ট।

তারপর যখন চৌকি পেতে কিছু ছবি, বিগ্রহের পট বসিয়ে ধ্যান-পূজার ব্যবস্থা হ'ল, তখনও অসুবিধা হয় নি। বন্যার সময় কদিনের জন্যে যে তক্তপোশ আনা

হয়েছিল—সেও একজনের মাপে—যাকে 'একানে' বলে তাই।

আজ ঘরটা যেন আরও ছোট লাগছে। রাত্রে শীতলের প্রসাদ যখন এসে পৌছল তখন দুজনের মতো আসন পাতারও জায়গা নেই—এমন অবস্থা।

স্বরূপকে খাবার সাজিয়ে দিয়ে বিছানারই এক প্রান্তে বসতে হ'ল বিশাখাকে। স্বরূপ খাওয়া শেষ ক'রে আচমনের পর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ওর জন্যেই এই ভাবে দাঁড়াতে হচ্ছে মনে হলে খেতেও লজ্জা বোধ হয়।

অবশ্য খাওয়াও সামান্য, শরীর এখনও সুস্থ সবল হয়ে ওঠে নি, বেশী খাওয়ার শক্তিও নেই, উচিতও নয়।

যে ব্রাহ্মণ সেবকটি প্রসাদ নিয়ে এসে ছিল, সে ই বাকী খাবার, বাসন নিয়ে চলে গেল। পাশে যে সদ্য খেজুর পাতার চ্যাটাই দিয়ে ঘিরে একটা স্নানঘরের মতো হয়েছে তা আগেই দেখে নিয়েছিল বিশাখা, এসে সেখানেই হাত পা ধুয়েছে, কাপড় কেচেছে। সেখানে একটা তেলের দেওয়াল-আলোও জেলে রাখা হয়েছে সন্ধ্যের আগে থেকে। জলও আছে বড বড় দুটো বালতিতে। সেখানেই মুখ ধুয়ে এসে খাওয়ার জায়গাটা পেড়ে নেবে—এসে দেখল দারোয়ানটি সে কাজও সেরে চলে গেছে।

একটু ক্ষুন্নই হ'ল বিশাখা। এমন ভাবে সকলেই যদি তটস্থ হয়ে সব কাজ ক'রে দেয়—তাহলে সে কি করবে? স্বামীর সেবা করবে কখন?

মনে হ'ল অন্তর্যামীর মতোই মনের কথাটা বুঝে বাইরে থেকে স্বরূপ বললেন, 'মা বলেছেন ঐ স্নানঘরের পাশটাও ঘিরে দেবেন পাকা ক'রে, কিছু বাসনকোসনও রাখবেন– তুমি যদি কখনও কিছু খাবার কি অন্য কোন রান্না করতে চাও—করতে পারবে।'

অতঃপর কি?

উনি শুতে আসবেন না সে যাবে ওঁর কাছে?

বড বেশী স্পর্ধা হয়ে পড়বে না সেটা?

কিছু ঠিক করতে না পেরে সেখানেই কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বোধ হয় সেটা বাইরে থেকে লক্ষ্য ক'রেই স্বরূপ ঘরে এলেন। বললেন, 'তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি রাত্রে শোবার আগে একটু জপধ্যান করি —এখানে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি সেটা সেরে শুতে যাবো।'

বিশাখা বিছানায় গিয়ে বসল। তবে এক্ষেত্রে শোওয়া যায় না।

একা আলাদা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াই কি তার অদৃষ্টে লেখা আছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে গেল।